বশীকরণ

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—চার টাকা—

এই লেখকেরই—

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
বসু প্রেস ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

অমলের

মা

সুখময়ী দেবীকে

অতি অল্প কথা বলার আছে। বশীকরণ গল্প নয়, উপন্যাস ত নয়ই। শুধু কয়েকটি কাহিনী, নির্জলা মনগড়া কাহিনী। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও ব্যাপারে মত জাহির করার বাসনায় কিছুই লেখা হয় নি। বইখানি পড়ার আগে ও পরে এইটুকু মনে রাখলে একান্ত বাধিত হব। ইতি—

দোলপূর্ণিমা
১৩৬২০

অবধূত

নাম তার তোরাব আলি।

জেলে আমার খাবার জোগাত তোরাব। বিশ্বাসী লোক। জেলের বাবুরা, সাহেবরা, আর বড় জমাদার সাহেব—এঁদের সকলেরই আস্থা আছে তোরাবের ওপর। কয়েদী যদি বেগড়ায় তোরাব তাকে বাগে আনতে পারবে; শুধু তাই নয়, সকলেই জানেন যে, তোরাব একটি অপার্থিব শক্তির অধিকারী। এত বড় জেলে এতগুলো বন্দীর মধ্যে যদি একজনেরও মনের কোণে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন জাগে শিকল কাটবার, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোরাব তা জানতে পারে। তারপর সে সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিতে তোরাবের আর কতটুকু সময় লাগে?

সকলেই খাতির করে তোরাব মেটকে, আর সাধ্যমত এড়িয়ে চলে তাকে। তার চেয়ে পুরনো মেট যারা, তারাও সাবধানে থাকে। বলা তো যায় না, কখন ওর দিল্ তড়পে উঠবে! তা হ'লেই কেলেঙ্কারি। মুখে যা আসবে তাই ব'লে বসবে হুজুরদের সামনে। তারপর দিক্দারির শুরু। একজন থেকে আর একজন, তারপর আর একজন ধ'রে টান পড়বে। কার বরাতে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না। মার, ডাণ্ডাবেড়ি, মাড়ভাত, মেট থেকে কালাপাগড়িতে নামানো, কালাপাগড়ি থেকে সাধারণ কয়েদী। তার উপর লে যাও টিকিট—কাটো পনেরো দিন, কাটো এক মাস। লাঞ্ছনার একশেষ।

সকলের চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তোরাব মেট। চুল-দাড়ি কামায়, দিন সাবান দেওয়া সাজপোশাক পরে। রঙ তার ফরসা—বেশ ফরসা, হাঁ, মাথার চুল কটা, চোখের তারা দুটিও কটা। আমার সেলের সামনে ... তোয়ালেখানা পেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে যখন নমাজ পড়ত তোরাব,

তখন আমি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম গরাদের ভেতর থেকে চোখ বুজে ও ঠোঁট নাড়ত।

বেলা তুটো-তিনটের সময় রোজই তোরাব এসে সেলের গরাদে ধ'রে দাঁড়াত। তা এক ঘণ্টা তু ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। সময়টা কাটত হিসেব করতে করতে। হিসেব সোজা নয়। চোদ্দ থেকে আট বাদ গেলে মাত্র ছয় থাকে বাকি, আর ছয় থেকে কত বাদ গেলে কিছুই থাকে না?

হিসেব করত তোরাব—"আজ্ঞে জানমু না ক্যা বাবু মশয়। এই ধরে ছয় সন—আর এডা অইল গ্যা মহরমের মাস, তা অইল গ্যা ছয় সন আর বয়খান মাস। কাবার কইর‍্যা ত্থালাম সাত সন। কি কন?"

তাড়াতাড়ি উত্তর দিই আমি, "বটেই তো। সাত বছরের আর বাকি কোথায় তোমার?"

উত্তর শোনার অপেক্ষা রাখে না তোরাব, হিসেব চালিয়ে যায় আপন মনে—"তার সাথে ধইর‍্যা রাহেন আরও ছয়খান মাস, ওই হাতখান মাসই গোনতি পারেন। ছাড় পাইমু না?"—ব'লে এমনভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে যেন বছরে এক মাস হিসেবে ছাড় পাওয়া না-পাওয়াটা আমার মতামতের ওপরেই নির্ভর করছে।

বিস্ময় প্রকাশ করি, "পাবে না মানে? না পাবার কি হয়েছে?"

চকচকে দাঁতগুলি বার ক'রে তোরাব বলে—"হক কথা কইছেন কর্তা।" তারপর হঠাৎ যেন তার মনে প'ড়ে যায়। আবার শুরু করে—"আরও ধরেন তিনডা মাস। হেবার মাইরডাঙ্গায় বড় সাহেব মাফ ত্থালেন তিনডা মাস, একারে পাকা কইর‍্যা লেইখ্যা থুয়া গ্যাছেন মোর টিকিডখানার 'পর। ত্থ্যাহেন জোরেন হেসাবখান। ত্থাহেন আটডা সন কাবার কইর‍্যা ত্থালা কি না কন?"

তু হাত মেলে আঙুল গুনতে থাকে। "চোদ্দ থেকে আট বাদ গেলে থাকে ছয়। মাত্র ছটি বছরই বাকি আছে তার খালাস পেতে।

যদি আর দু-একবার দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগে জেলে, তবে খোদার দোয়ায় কি আরও অন্তত ছটা মাস মাফ করিয়ে নিতে পারবে না সে? খুব পারবে।

সেবারের সেই হাঙ্গামার কাহিনী কমপক্ষে একশোবার আমার শোনা হয়ে গেছে তোরাবের মুখ থেকে। শুনতে শুনতে এমনই দাঁড়িয়েছিল যেন সেই মারাত্মক পাল্টাটি আগাগোড়া ঘ'টে গেছে আমার চোখের ওপর, চোখ বুজে হুবহু আমি দেখতে পেতাম সে দিনের সেই কাণ্ডকারখানা।

বেলা তখন এগারোটা। হঠাৎ হৈ হৈ উঠল চারদিক থেকে। একসঙ্গে ফুঁসিয়ে উঠল সাড়ে সাতশো লোক। খোন্তা কোদাল যে যা পেলে হাতের কাছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তিনশো ষাট দিন শুধু পুঁইশাকসেদ্ধ খেতে আর কেউ রাজী নয়।

বড় সাহেব, জেলার সাহেব, ছোট হুজুরেরা সকলেই আপিসের মধ্যে। সকলেরই মুখ চুন। পেট-মোটা জমাদার সাহেবরা ছুটে গিয়ে জড়ো হয়েছেন গেটের ওধারে আপিসের সামনে। ওয়ার্ডাররা কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে তার পাত্তা নেই। পাগলা-ঘণ্টি বাজছে তো বেজেই চলেছে। সাড়ে সাতশো লোক মরীয়া হয়ে একটু একটু ক'রে এগুচ্ছে গেটের দিকে।

তোরাবের তখন মাত্র তিন বছর। কয়েদীদের ভেতরের সব খবরাখবর যথাস্থানে সরবরাহ ক'রে সে তখন নতুন কালাপাগড়ি পেয়েছে। দিনে আপিসের মধ্যে কাজকর্ম করে, ঝাড়ে পোঁছে, ফাইফরমাস খাটে। রাত্রে নিজের ওয়ার্ডে তালা চাবির মধ্যে বন্ধ থাকে। প্রকাণ্ড হলটার দু ধারে সারবন্দি ঘুমোচ্ছে কম্বল বিছিয়ে যে কয়জন লোক, তাদের মাঝখান দিয়ে হলটার এ-ধার থেকে ও-ধার হাঁটা আর বিচিত্র সুরে গান গেয়ে গোনা 'এক দো তিন চার—সাতচলিশ উনপঁচাশ পঁচাশ—ঠিক হায় চার নম্বর।' শুনে মনে হয়তো আলাদা ক'রে গুনতে থাকত তখন চোদ্দ থেকে তিন বাদ গেলে হাতে থাকে এগারো আর এগারো থেকে কত বাদ গেলে হাতে কিছুই থাকে না আর।

নসিবের জোরে সেদিন তখন কালাপাগড়ী তোরাবালি আপিসের মধ্যেই আটক পড়েছিল হুজুরদের সঙ্গে।

প্রতি মুহূর্তে অবস্থা ক্রমেই সঙিন হয়ে উঠছে। সরকারী ভাষায় যাকে বলে আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাওয়া, অবস্থাটা প্রায় সেই রকমেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে; সাহেবরা পরামর্শ করছেন—গুলি চালাবার হুকুম এই মুহূর্তেই দেবেন, না, আরও কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেখবেন! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লোক ছুটেছে।

তোরাব গিয়ে দাঁড়াল সেলাম ঠুকে সুপার সাহেবের সামনে, তখন তার কপালের ওপর খাড়া হয়ে উঠেছে নীল শিরগুলো।

তার চোখের দিকে চেয়ে সাহেব তাঁর পিস্তলটা হাতে তুলে নিলেন।

কেয়া মাংতা?

রক্তে তার আগুন ধ'রে গেছে তখন। সাহেব শুনলেন তার আরজি, পিস্তল-সুদ্ধ হাত নামালেন না বা তোরাবের ওপর থেকে নজরও সরালেন না। কয়েকটা কথা-কাটাকাটি করলেন জেলর সাহেবের সঙ্গে। তোরাবের আরজি মঞ্জুর হ'ল। হাত পাঁচেক লম্বা একখানা পাকা লাঠি দেওয়া হ'ল তাকে। পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে স্বয়ং বড় সাহেব চললেন তার পিছু পিছু ফটকের ছাদের ওপর। ভেতরের গেট তখন খুলবে কে? গেট খুললেই যদি লাফিয়ে পড়ে সাড়ে সাতশো লোক গেটের ওপর!

তারপর—

ব্যা ব্যা কইরা একডা চিক্কুর ছাইড়া দ্যালাম লাফ আর নামলাম গ্যা একারে হালাগোর মদ্দি। তহন বুইঝা লন ব্যাপারখান। মুই তোরাবালি, আর ওস্তাদের নাম আসমতালি ছায়েব। গরের মদ্দি হুইয়া ভাশের মানুষ রূপে মোর ওস্তাদের নামে। চক্কু পালডাত্তি না পালডাত্তি দ্যালাম এক খতম কইর‍্যা। ব্যাস, হালার গুষ্টি কাইত্। ফটক খুইল্যা ছুইটা আইয়া প্যাট-মোটা জমাদার ছায়েবরা। হালাগো সামাল দাওয়া গ্যাল, তাল্যা

পড়ল, লোক গোনতি হ'ল। বর সাহেব আপন হাতে আধস্তার লাল পানি ঢাইল্যা ভালেন মোর মগে। আর তিনথান মাস ব্যাহাই প্যালাম।

বলতে বলতে তোরাবের চোখ-মুখের চেহারা যেত বদলে। আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠত ওর মুখের দিকে চেয়ে। তবু রক্ষে যে দু ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদগুলোর এক ধারে সে, আর অন্য ধারে আমি; বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে গলা টিপে ধরবে, সে উপায় নেই।

জেলের মধ্যে জেল, তার মধ্যে সেল। বিচারকর্তা বাইরে থেকে লিখে দিলেন, আমি বি ক্লাস। সি ক্লাস হ'লে সকলের সঙ্গে থাকতে পেতাম। বি ক্লাসের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। আলাদা ক'রে রাখতে হবে তো! কাজেই ফাঁসির আসামীর সেল একটি ছেড়ে দেওয়া হ'ল আমায়। দশ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর, যার একমাত্র প্রবেশ ও নির্গমন-পথে দু ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদের গায়ে শক্ত লোহার জাল। হাওয়া আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবারিতদ্বার। সেই ঘরের মধ্যে সি ক্লাসের মত কম্বল একখানি আর থালা মগ নিয়ে থাকতে পারলেও স্বস্তি পেতাম। তা তো নয়। একরাশ অস্থাবর সম্পত্তি বি ক্লাসের। চার হাত লম্বা দু হাত চওড়া লোহার খাট। তার ওপর ছোবড়ার গদি, ছোবড়ার বালিশ। নারকেলের খোকে ছোবড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সস্ত সস্ত একটা চটের থলের পুরে দেওয়া হয়েছে। ছোবড়াগুলোকে পেটানো বা পেঁজা হয় নি। তারপর মশারি, যার চার দিকের ঝুল চার রকমের। এক দিকের এক হাত, এক দিকের দু হাত, এক দিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। একখানি টেবিল ও একটি চেয়ার। কি মহাপরাধের দরুন ওরা দুজন আমার সঙ্গে সেলে বন্দী হয়ে রইল ন-নটা মাস, তা বলতে পারব না। ওদের অবস্থা দেখে আমি ঘরের এক কোণে অতি সাবধানে একজনকে আর একজনের ওপর চাপিয়ে রেখে দিলাম। একেবারে বিকলাঙ্গ পঙ্গু কিনা বেচারারা।

আর একটি জিনিসও ছিল আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। তান্ত্রিক

সাধকরা পূজায় বসতে হ'লে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল ফেলবার জন্যে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণী-পাত্র। আমার সেই দশ হাত পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে দেওয়া হ'ত একটি ক্ষেপণী-পাত্র। চার সের আন্দাজ জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা-মাখানো ঢাকনা-ওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হ'লে রক্ষে নেই। ঘর ভাসবে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অকথ্য গালাগালি উপরিপাওনা।

প্রথম দিন জিনিসপত্র সমস্ত সমঝে দিয়ে ছোট জেলারবাবু তোরাব আলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—"বড় বিশ্বাসী লোক এ, আর এ জানে কি ক'রে সম্মানী লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।" তারপর থেকে ন মাস আমি রইলাম তোরাব আলির হেপাজতে।

ঠিক সকাল সাতটায় সেলের সামনে এসে দাঁড়াত তোরাব। বলত, "সালাম কর্তা।" জমাদার এসে সেলের তালা খুলে দিয়ে যেত।

সেলের মাপের সমান এক টুকরো উঠান সেলের সামনে। তিন-মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠান থেকে বাইরে বেরুবার দরজাটি সেলের দরজার মুখোমুখি। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে তিন হাত চওড়া গলি। গলিটা সব কটা সেলের সামনে দিয়ে চ'লে গেছে। তারপরই হচ্ছে লাল ইটের ছ-মানুষ উঁচু পাঁচিল। সেই গলি দিয়ে দিবারাত্র ওয়ার্ডাররা রুল হাতে এ-ধার থেকে ও-ধার আর ও-ধার থেকে এ-ধার খট খট মস মস ক'রে টহল দেয়। উঠানের দরজা দিয়ে নজর রাখে, সেলের মধ্যের জীবটি কিছু করছে কি না। করবার অবশ্য কিছুই ছিল না, ওঁদের শ্রীবপু কতবার উঠানের দরজা দিয়ে দেখা যায় তা গণনা করা ছাড়া।

সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবের সঙ্গে উঠানের দরজা পার হ'তাম। সেই তিন হাত চওড়া গলিটার এক প্রান্তে পৌঁছে কলের নীচে মাথা পেতে ব'সে থাকতাম। সকালের ছুটির পুরো আধ-ঘণ্টাই ব'সে থাকতাম কলের

নীচে। বি ক্লাসের ওইটুকুই বিশেষ সুবিধা। নয়তো সারারাত কেপশী-পায়ের সঙ্গে কাটিয়ে কার সাধ্য সকালে এক ঢোঁক জল গেলে!

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে তোরাব নিয়ে আসত চা আর চায়ের সরঞ্জাম। সাড়ে-পনেরো-আনা-কলাই-ওঠা একখানি থালায় ক'রে আসত সে সমস্ত অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী। সি ক্লাস তো নই, কাজেই বিলকুল অসাধারণ হওয়া চাই। থালার ওপর থাকত বড় বড় আরশোলা সেঁকে দিলে যেমন দেখতে হয় ঠিক সেই রকম দেখতে দশ-বারো টুকরো পোড়া পাঁউরুটি। তার পাশে এক ধ্যাবড়া সাদা থকথকে পদার্থ। ওই পদার্থ দিয়ে আরশোলা-সেঁকা খেতে হবে। খেলে বি ক্লাসের ব্রেকফাস্ট করার ফল মিলবে। আর থাকত খানিকটা মাখা তামাক। সেজে খাবার জন্যে নয়। চেটে খাবার জন্যে। জেলের আইনে বি ক্লাসকে গুড় দেবার নিয়ম লেখা আছে কিনা। সামান্য একটু চিনিও থাকত তার পাশে।

একটা কলাই-করা মগের তলদেশে খানিকটা সাদা তরল পদার্থ আর একটা পাঁচ সের ওজনের লোহার কেটলিতে গুচ্ছের-খানিক চা-পাতা ভিজানো এক কেটলি গরম জল। প্রথমেই মগের মধ্যে খানিকটা চায়ের জল ঢেলে আমি তোরাবের হাতে তুলে দিতাম। রুটি মাখন গুড় সমস্ত তোরাবের সেবায় লাগত। তোরাব প্রবল আপত্তি তুলেছিল। তাকে বোঝালাম, আমি জন্ম-পেটরোগা, এ সমস্ত ভালমন্দ জিনিস একদম পেটে সয় না। আমার নিজের এলুমিনিয়ামের গেলাসটির মধ্যে চায়ের জল ঢালতাম আর চিনি মিশিয়ে খেতাম।

চা-পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত।

বিষয়বস্তু সেই একই, তবু আলাপটি তোলবার কায়দার দরুন কোনও দিন একঘেয়ে মনে হ'ত না। প্রতিদিনই বেশ চমক লাগত তোরাবের ক্ষমতা দেখে। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে হঠাৎ তোরাব জিজ্ঞাসা ক'রে বসল তার নিজস্ব ভাষায়, "কর্তা, আপনার পোলাপান কটি?"

হেসে ফেলতাম—"নাও মিঞা সাহেব, যেমন তোমার কথা! আরে, বিয়ে

করবারই তো ফুরসত মিলল না এখনও। পোলাপান কি ছন্নর ফুটো হয়ে পড়বে নাকি?"

ভ্রূক্ষেপ নেই আমার রসিকতায়। ততক্ষণে তোরাব তার মগের মধ্যে একদৃষ্টে কি দেখছে। একটু পরে যেন বহু দূর থেকে সে বলতে থাকত, "সব কটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে এতদিনে। আমার সাকিনার বয়স হ'ল এই বারো, ফুক্কর এই দশ, আর ছোটটার—তা আট তো বটেই। কি খাবে? ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি ক'রে চালাবে? মেয়েটাকে হয়তো কারও ঘরে কাজে দিয়েছে। ওরা দু ভাইও হয়তো কারও গরু বাছুর রাখে। নাঃ, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে না—কি বলেন কর্তা?" আমার মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইত তোরাব। বলতাম—"দূর, না খেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমারও যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মানুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনো করছেই।"

সামান্য একটু সময় কি ভাবত তোরাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই আরশোলা-সেঁকা রুটি এক টুকরো মুখে ফেলে চিবুতে থাকত। আবার বলে উঠত হঠাৎ—"আচ্ছা কর্তা, আপনাদের ঘরে এ রকম হ'লে কি করত?"

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম—"কি আবার করত, কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আশ্রয় নিত।"

তোরাব একেবারে ফেটে পড়ত—"আর ওরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে কি দিতে হয়েছে জানেন? দিতে হয়েছে ইজ্জত। কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকেয় না বসে থাকে। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। আমার সাকিনা, আমার ফুক, আমার বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে বাপজান ব'লে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর একজনের সন্তানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানাপানি পড়বার কোনও আশা নেই।"

আর কথা জোগাত না তোরাবের। তার সেই কটা-চোখের চাহনি তখন বাকিটুকু ব'লে দিত। কোনও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তার চোখে ফুটে ওঠে, সেই মর্মান্তিক অসহায় ভাষা মুখর হয়ে উঠত তোরাব আলির দুই চোখে।

আমার সাকিনা, আমার নুরু—হায় আল্লা, কে জানে আজ তারা কোথায়! আর কি কখনও আমি তাদের ফিরে পাব?

সকালের আলাপটা যেত বন্ধ হয়ে হঠাৎ। আমার মুখেও আর কিছু জোগাত না।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবার সময় পিছন দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু দোক্তাপাতা আমার হাতে গুঁজে দিত তোরাব। দেওয়ালের গা থেকে আঙুলের নখ দিয়ে চুন কুরে নিয়ে ওটুকুর সঙ্গে হাতের তেলোয় পিষে দাঁতের গোড়ায় টিপে রাখতে হবে। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। প্রথম প্রথম বেয়াড়া রকমের মাথা ধরত। সদাসর্বদা এক চিন্তা, কি ক'রে ক'ষে টান দেওয়া যায় একটা বিড়ি বা সিগারেটে। লক্ষ্য করল তোরাব। শেখালে দাঁতের গোড়ায় দোক্তাপাতা টিপে রাখা। স্বস্তি পেলাম। কতবার প্রশ্ন করেছি, কি ক'রে আসে এ সব জিনিস জেলের মধ্যে? তোরাব শুধু দাঁত বের ক'রে হেসেছে। সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার সে ওই জিনিস পরিমাণমত দিয়ে গেছে আমার হাতে। এতটুকু বেশি কাছে রাখার উপায় নেই। কখন যে ঝাড়া নেবে কে জানে! যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে তবে নাজেহাল ক'রে ছাড়বে।

জমাদার সাহেব এসে দরজায় তালা লাগাত। গরাদের পাশে ব'সে চেয়ে থাকতাম উঠানের পাঁচিলের ও-পারে বড় পাঁচিলটার মাথার ওপর এক ফালি আকাশের দিকে। ব'সে ব'সে গুনতাম কতবার পাক খেল দুটো শকুন আমার সেই ছোট্ট আকাশখানির গায়ে। তারা চ'লে গেলে পর আসত এক টুকরো

সাদা মেঘ। এসে চুপ ক'রে চেয়ে থাকত গরাদের ভেতর দিয়ে আমার দিকে। আস্তে আস্তে তার রূপ পালটাত। একটু একটু ক'রে চারটে ঠ্যাং গজাল, গজাল শুঁড়। দেখতে দেখতে বেশ স্পষ্ট একটা হাতি হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বড় পাঁচিলের ও-ধারে কোথায় চ'লে গেল।

বেলা দশটা নাগাদ পাঁচিলের ওপর এসে বসত এক শালিক-দম্পতি। কলহ-কচকচির সীমা নেই ওদের। আর কি ব্যস্ত! একটা কিছু ফয়সালা না ক'রেই আবার দুজনেই ফুড়ুৎ।

বিরক্ত হয়ে নিজের ছোট্ট কুলায় নজর ফিরিয়ে আনতাম। রিক্ততা—চরম নিঃস্বতা যেন দু হাত মেলে আঁকড়ে ধরতে আসত। কিছু নেই, দেওয়াল ছাদ সমস্ত নিখুঁত সাদা—সাদা ধপধপ করছে। চোখ ঝল্‌সে যেত। চোখ বুজতাম। চিত হয়ে শুয়ে পড়তাম আমার সেই রাজ-শয্যায়। কিছুক্ষণ পরে সব পালটে যেত।

বন্ধ চোখের ওপর ভেসে উঠত আঁকাবাঁকা একটি সরু খাল। দু পাশের হোগলা আর নলবন নুয়ে পড়েছে খালের ওপর। খাল দিয়ে চলেছে একখানি শালতি, মাঝখানে ব'সে আছি আমি। একটি লোক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে লগি মেরে শালতিখানাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে মাথা নুইয়ে নিতে হচ্ছে, নয়তো নলপাতায় মুখ মাথা কেটে ফালা ফালা হবে। চলেছি তো চলেছিই। অনেক দূর যেতে হবে যে আমাকে। যাচ্ছি সেই নলবুনিয়া। উমেদালি মোল্লার ব্যাটা তোরাব আলির ঘর নলবুনিয়ায়।

শালতি গিয়ে লাগবে তোরাবের বাড়ির ঘাটে। সেই ঘাটে উঠে আমি পাব [illegible]কিনাকে, দুরুকে আর তোরাবের ছোট ব্যাটাকে—যাকে সে মাত্র এক বছরেরটি ফেলে এসেছে, আর ওদের মাকে। তাদের সকলকে বুঝিয়ে ব'লে আসতে হবে আমায় যে, চোদ্দ থেকে আট বাদ দিলে থাকে মাত্র ছয়। আর ছয় তো কিছুই নয়। দেখতে দেখতে এই ছয়ও পার হয়ে যাবে। তারপর আর কিছুই থাকবে না। তোরাব ফিরে আসবে। আর কিসের ভাবনা।

বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লে আসতে হবে যে, তোরাবের হিসেবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। তারাও যেন হিসেবে ভুল না করে। যেন ভুলে না যায় যে, উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাব আলির রক্ত মাংস হাড় দিয়ে তারা তৈরী। কোনও ভেজাল যেন না মেশে সেই রক্তে, কারণ তাদের খুন হচ্ছে একদম আলাদা জাতের খুন। 'তাদের বাপজান তাদের ভোলে নি। নিমকহারাম নয় সে, তারাও যেন তাদের বাপজানের কথা না ভোলে।

সাকিনার মাকে আমি বুঝিয়ে আসতে চলেছি। আমাকে একটু নরম হয়ে মিনতি ক'রে ব'লে আসতে হবে সাকিনার মাকে—তুমি তো জান, তোরাব তোমায় ভুলতে পারে না। আটটা বছর নিষেধের তরেও তোমার কথা আর তোমার ছেলেমেয়ের কথা সে ভুলতে পারে নি। তুমি কি করে ভুলতে পারো তোরাবকে? কি সে না করেছে তোমার জন্যে! কোন্ আবদারটি সে রাখে নি তোমার? যখন যা চেয়েছ তাই—রুপোর মল বাউটি কোমরের বিছা গলার চিক, ধানগাছ রঙের রেশমী ডুরে। কোনও দিন তোমায় ছোট কাজ করতে দেয় নি তোরাব—মাঠে যাওয়া, ধান ভাঙা বা মাছ ধরা! তোমার ইজ্জত আবরু নিখুঁত বজায় রেখে গেছে সে—সেসব কথা কি তুমি ভুলতে পারো? নিজে কামাত তোরাব। যে ক'রেই কামিয়ে আনুক সে, এনে তোমার দু হাত ভ'রে দিত। আর মাত্র ছ-টা বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন ফিরে এসে তোরাব তোমাদের—

তোরাব ফিরে এসে সন্তর্পণে ডাক দিত, "কর্তা, ঘুমিয়েছেন নাকি? উঠে পড়তাম। হাসি মুখে তোরাব জানাত, ভাত খাবার বেলা হ'ল যে। এবার গিয়ে ভাত নিয়ে আসব।"—ব'লে নিজের জামার তলা থেকে আধখানা কাগজি নেবু বার ক'রে দিত। ব্যবস্থা ক'রে হাসপাতাল থেকে আনিয়েছে আমার জন্যে।

বলতুম, "আবার ওসবের ঝুঁকি কেন নিতে যাও তুমি? একটা ক্যানাস্তারা বাজাতে কতক্ষণ!"

[illegible] করত না তোরাব, মুখ টিপে হাসত। বলত, "একবার হুকুম করেন না

হুজুর, সব হাজির ক'রে দিচ্ছি। বোতল থেকে কালাচাঁদ পর্যন্ত। এখানকার সব মানুষকেই চিনি। কে কি করে না-করে চোখ বুজে টের পাই আমি। হয় মামদোবাজি ছাড়, নয়তো আমার মুখ বন্ধ কর—ব্যাস্।"

ঝন ঝন ঘটাং ঘট শব্দ করে সেলের দরজাগুলো খুলতে খুলতে জমাদার সাহেব এগিয়ে আসত। তোরাব চ'লে যেত। মিনিট দশেক পরে সঙ্গে নিয়ে আসত আর একটি লোককে। তার উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, টস টস ক'রে ঘাম ঝরছে। সেই লোকটির হাতে প্রকাণ্ড একখানা বারকোশের ওপর ভাতের থালা, ডালের মগ আর দুটো এলুমিনিয়ামের বাটি।

বারকোশ নামিয়ে দিয়ে লোকটি চ'লে গেলে তোরাব নামিয়ে দিত ছখানি গরম আটার রুটি তার তোয়ালের ভেতর থেকে। দিয়ে এমন মুখ ক'রে আমার দিকে চাইত যেন সে হচ্ছে এ বাড়ির কর্তা আর আমি তার অতিথি। মরমে সে ম'রে যাচ্ছে আমার সামনে শুধু রুটি নামিয়ে দিতে।

তাড়াতাড়ি সেই গরম রুটি কখানি লবণ-সহযোগে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করতাম। এ ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না। বি ক্লাসের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ভাত-তরকারি-ব্যঞ্জন কোনও দিন স্পর্শও করি নি। করবার সাহসও ছিল না আমার। দর্শনেই পেটের ক্ষুধা মাথায় উঠে যেত। তোরাবের লুকিয়ে আনা ওই রুটি কখানিই ছিল অগতির গতি। জেলের কয়েদীরা জাঁতায় গম ভাঙে। সেই আটায় বানানো হয় রুটি। জেলে ওই একটি জিনিস পাওয়া যেত যার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো নেই। ও-জিনিসটি না থাকলে একটি লোকও বাঁচত না জেলে গিয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে আবার দরজায় তালা পড়ত। তোরাব যেত খেয়ে আসতে তখন। বেলা দুটো নাগাদ আবার এসে দাঁড়াত গরাদে ধ'রে। তখন একটানা দু ঘণ্টা গল্প চলত আমাদের। কে আসছে দেখছে?

সেই সময় তার মেজাজটা থাকত নরম-গরম কিছুই না হয়ে। সেই সময় আমি তার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-কাহিনী [illegible]। আর [illegible]দের

একটু শুনলাম, তারপর শেষের দিকের খানিকটা হয়তো শোনালে সে দশ দিন পরে। মাঝখানের সবটুকু অনেক দিন ধ'রে আরও নানা কথার সঙ্গে মিলে-মিশে বেরুল তার মুখ দিয়ে। এইভাবে শুনেছিলাম তার জীবন-কাহিনী, আগাগোড়া সবটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে তোরাবালির জীবনী হচ্ছে এই—

নলবুনিয়ার উমেদালি মোল্লার ছেলে সে। উমেদালির একমাত্র ছেলে। ঘরে ধান-পান ছিল উমেদালির। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপল! খয়রাত শুরু ক'রে দিল। হাল বলদ লাঙল জমি বিলকুল খয়রাত হয়ে গেল। শেষে নিজে চ'লে গেল হজ করতে। যাবার সময় ছেলের হাত ধ'রে ব'লে গেল, দেখিস বাপজান, বংশের মুখে যেন কালি না পড়ে।

তোরাবের মা অনেক আগেই বেহেস্তে গিয়েছিলেন। হজ থেকে তার বাপজানও আর ফিরে এলেন না। ঘরে রইল শুধু তোরাব, ষোল বছরের মরিয়ম আর ছোট সাকিনা। অনেক খুঁজে পেতে উমেদালি ছেলের বিয়ে দিয়ে তেরো বছরের মরিয়মকে ঘরে এনেছিল। নাতনি সাকিনার মুখ দেখে সে হজের পথে পা বাড়াল।

ধর্মপ্রাণ লোক ছিল উমেদালি মোল্লা সায়েব। ও-তল্লাটের সকলেই এক ডাকে চিনবে তাকে। নলবুনিয়ার উমেদালি মোল্লার ঘর বললে, যে কোনও নৌকো নিয়ে যাবে পিরোজপুর থেকে। কোনও কষ্ট হবে না।

বাপ চ'লে গেলে তোরাব নামল সংসার করতে বউ বেটী নিয়ে। কিন্তু করবে কি? যতদিন বাপ ছিল, একমাত্র ছেলেকে সে কুটোটি ভাঙতে দেয় নি। সর্বস্ব খয়রাত ক'রে বাপ নিজের পথ দেখলে, তোরাবকেও আপন পথ খুঁজতে হ'ল। অবশেষে পথের সন্ধান পেল সে। ওস্তাদ আসমতালি সায়েব তাকে নিজের সাকরেদ ক'রে নিলেন। এক ধারে বিষখালি, অপর ধারে বলেশ্বর। সমগ্র এলাকাটি জুড়ে ছিল ওস্তাদ আসমতালি সায়েবের কর্মক্ষেত্র। নিজের দল নিয়ে কোপ বুঝে কোপ মারতেন তিনি। তারপর সকলকে ভাগ-বখরা দিয়ে যা থাকত তাই নিজের [illegible] নিতেন। ওস্তাদের মেহেরবানিতে অল্প দিনেই

তোরাব নায়েক হয়ে উঠল। দু-একটা জেদের কাজে সবার আগে ওস্তাদের হুকুম পালন ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলে যে, কিছুতেই তার প্রাণ কাঁপে না।

একবার এক জায়গায় হানা দিয়ে তারা বাড়ির কর্তাকে বেঁধে ফেললে, লোকটা কিছুতেই বলবে না কোথায় টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছে। বার বার জলন্ত মশাল চেপে ধরা হ'ল তার শরীরে, তবু তার মুখ ফুটল না। একটা মাস ছয়েকের ফুটফুটে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে সেই লোকটার নাতবউ থরথর ক'রে কাঁপছিল। ওস্তাদ হুকুম দিলেন, ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে পা ধ'রে আছাড় মারতে। কেউই এগোয় না। হুকুম শুনে সব সাকরেদের মাথা হেঁট। তোরাব এগিয়ে গেল। এক হেঁচকায় ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে তার পা দুটো ধ'রে ঘুরিয়ে মারলে এক আছাড়। ফটাস ক'রে মাথাটা ফেটে এক রাশ রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগল সেই লোকটার মুখে। তখন সে বাগে এল। টাকাকড়ি যেখানে পুঁতে রেখেছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

ওস্তাদ আসমতালি খুশি হলেন। বড় বড় কাজের ভার দিতে লাগলেন তোরাবকে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ভুল ক'রে আঁধার রাতে নদীর বুকে পুলিস সাহেবের নৌকোয় চড়াও হয়ে গুলির মুখে জান দিলেন ওস্তাদ পাঁচজন সাকরেদ সহ। জলের তলেই তাঁর সমাধি হ'ল। দল ভেঙে গেল।

তোরাব ইচ্ছে করলে দল বাঁধতে পারত। কিন্তু ও-কাজে বেজায় ঝুঁকি। বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে। দল রাখতে গেলে সকলের চলা চাই এমন সব কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু একজন ধরা প'ড়ে যদি বেইমানি ক'রে বসে তা হ'লেই সর্বনাশ। দল নিয়ে মাসের পর মাস বউ-বেটী ঘরে ফেলে ঘুরে বেড়ানো চাই।

দল বাঁধবার আশা ছেড়ে দিলে তোরাব। ছোটখাট ঠিকের কাজ চালাতে লাগল, যা একলা সামাল দেওয়া যায়। দু'জনের কাজ। মজুরি আগে দিয়ে দিতে হবে। সব কাজের মজুরিও সমান নয়। যেমন ঝুঁকি তেমনি মজুরি।

রাতের আঁধারে বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে রামদার এক কোপে কর্ম শেষ ক'রে আসবার যা মজুরি তাতে নদীর বুকে নৌকোর উপর হামলা ক'রে জলে ডুবিয়ে রেখে আসা হয় না। যেমন কাজ তার উপযুক্ত দক্ষিণা। সম্পূর্ণ টাকাটা হাতে পেয়ে যজমানকে কথা দেওয়া হ'ত, এক মাস বা দু মাসের মধ্যে তার পূজো বলিদান সব সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।

বেশ চলছিল তোরাবের সংসার। মাসে দু-তিন রাত ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যাওয়া আবার শেষ রাতে ঘরে ফিরে শান্তিতে বউ-ছেলে নিয়ে ঘুমনো। সুখ তখন ঘরে এসেছে। মাসে দু-একটা ছাড়া কাজে হাতই দিত না তোরাব। প্রাণে কি চায় চাঁদপানা ছেলে-মেয়ে ঘরে ফেলে আঁধার রাতে শিকারে বেরুতে! কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না। তার ওপর নিত্য নূতন বায়না সাকিনার মায়ের। সে বেচারা তো জানত না, তোরাবের রুজি-রোজগারের উপায়টি কি! সে জানত, তোরাব নৌকা বায়। গঞ্জে গিয়ে বেচাকেনা করে মাল।

হায় রে পোড়া নসিব, শুধু একগাছি রশি, হাতে পাকানো একগাছি সামান্য শণের দড়ি। তোরাবের এত বড় ভাগ্যবিপর্যয়ের হেতু হ'ল শেষ পর্যন্ত ঐ একগাছি সামান্য দড়ি।

জগতের অনেক নাম-করা কেতাবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের কথা লেখা আছে। তোরাবের জীবন-নাটকের সবচেয়ে জমজমাট দৃশ্যে একগাছি রজ্জু কালসর্প হয়ে তার শিরে দংশন করলে।

নলবুনিয়ার পাশের গ্রামের দুদু মিঞা। দুদু মিঞার পাঁচখান হাল, তিনটে মরাই, চার-চারজন বিবি, একপাল নোকর বাঁদী। যাকে বলে খানদানী ঘর। এমন যে দুদু মিঞা তিনি একদিন স্বয়ং তোরাবের ঘরে এসে তার হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে গেলেন। সামান্য কাজ। ব'লে গেলেন, কাজ খতম হ'লে আরও পাঁচ কুড়ি। তোরাব বলেছিল মিঞা সাহেবকে যে, টাকা আর সে নেবে না। তার পোলাপান দুধ পায় না। মিঞা সাহেবের অনেক গরু-বাছুর। যদি তার কাজে মালিক খুশি হন, তা হ'লে যেন একটা দুধালো

গাই আর বাছুর দেন। তার পোলাপান দুধ খেয়ে বাঁচবে। রাজী হয়ে মিঞা সাহেব ফিরে গেলেন।

খোঁজখবর নিতে লাগল তোরাব। নিয়ে দেখলে, ব্যাপারটা একটা মেয়েছেলে নিয়ে রেষারেষি। দুদু মিঞা ঠিক করেছেন, তাঁর মত সম্মানী লোকের অন্তত পাঁচটি বিবি থাকার একান্ত প্রয়োজন। পাঁচটা কেন, পঁচিশটারও অভাব হ'ত না তাঁর বিবির। কিন্তু কি যে মরজি হোল তাঁর, গোঁ ধ'রে বললেন যে ওকেই চাই—আমিনুদ্দি শেখের চোদ্দ বছরের বউটিকে চাই তাঁর। আমিনুদ্দিকে সরাতে হবে। তাই একশো টাকা দাদন দিয়ে গেলেন দুদু মিঞা তোরাবকে।

কিন্তু জুতমত পাওয়াই মুশকিল ছোকরাকে। ভয়ানক হুঁশিয়ার। বউকে সরিয়ে ফেলেছে দূর গ্রামে এক আত্মীয়বাড়ি। তাতেই আরও ক্ষেপে উঠেছেন দুদু মিঞা। কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। আমিনুদ্দির বিধবা মা একমাত্র ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে আছে। সন্ধ্যার আগেই আমিনুদ্দিকে ঘরে ফিরে মার পাশে পাশে থাকতে হয়। কার সাধ্য তখন এগোয় মায়ের বুক থেকে ছেলেকে টেনে আনতে!

হঠাৎ একদিন আমিনুদ্দি এসে উপস্থিত তার মাকে নিয়ে তোরাবের কাছে। লজ্জা শরম ত্যাগ ক'রে আকুল জননী তোরাবের দু হাত চেপে ধরলে। তার একমাত্র ছেলের প্রাণভিক্ষা চায়।

কি ক'রে কোথা থেকে যে হদিস পেল ওরা! তোরাব তো প্রথমে খুবই রেগে উঠল, এ সব কথা তাকে বলবার মানে কি? ওই সমস্ত কাজ সে করে নাকি? কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মায়ের প্রাণ খোদার দোয়ায় সব জানতে পেরেছে। তোরাবকে কথা দিতে হ'ল, দুদু মিঞার টাকা সে খাবে না।

মা বেটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না তোরাব। তার [illegible] দুই

আর কোথাও থেকে ডাক এল না। একটা পয়সা বায়না দিয়ে গেল না কেউ। শ্রাবণ মাস, ঘরে ক্ষুদটুকুও বাড়ন্ত হ'ল। তখন মুরুর পরে আর একটি এক বছরের বাচ্চা মরিয়মের কোলে। বাচ্চা মায়ের বুক চুষছে। চুষবে কি, বুকেও দুধ নেই, পেটে যে দানা পড়ে না মায়ের।

দিন আর কাটে না। একদিন আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে মরিয়ম এসে দাঁড়াল তার সামনে। এ ভাবে আর চলতে পারে না। ছেলেমেয়ের হাত ধরে সে উঠবে গিয়ে ওই রয়জুদ্দির ঘরে।

খুন চেপে গেল তোরাবের মাথায়। তার কলিজার মধ্যে আগুন ধ'রে গেল বেইমান রয়জুদ্দির নাম শুনে। হারামীর বাচ্চা চাটগাঁ থেকে জাহাজে ক'রে সফর কেমিয়ে আসে। ন-মাসে ছ-মাসে ঘরে ফিরে দু-দশ দিন থাকে। তখন তার বাহার কত! গোলাপী রঙের রেশমী রুমাল গলায় জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় শিস দিয়ে। পরনে পাজামা, ফুলতোলা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। যেন কত বড় এক নবাবজাদা! গাঁয়ের সোমত্ত বউ-ঝিদের এটা ওটা উপহার দেয়। দু-একবার তোরাবের দাওয়াতেও উঠে বসেছিল রয়জুদ্দি। বাঁকা বাঁকা বোলচাল ঝাড়ত তোরাবের বিবিকে শুনিয়ে। অসহ্য লাগল তোরাবের, একদিন রাম-দা দেখিয়ে দিলে। সেই থেকে তোরাবের ঘর এড়িয়ে চলত রয়জুদ্দি।

রয়জুদ্দির নাম শুনে তোরাবের সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল। চুপি চুপি আরও পঞ্চাশটা টাকা আর আধ মণ ধান নিয়ে এল দুদু মিঞার কাছ থেকে সে।

দুদু মিঞার চাপ বেড়েই চলল।—আগে টাকা খেয়েছ, এখন 'না' করলে চলবে কেন। এক নিষুতি রাতে বেরুতে হ'ল তোরাবকে ঠিকের কাজ সারতে।

ঠিকঠাক হয়ে গেল সব। বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে কান পেতে শুনলে সে ঘুমন্ত লোকের নিশ্বাসের শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে চোখে ভেসে উঠল মাচার ওপর পাশ ফিরে শোয়া যুবক আমিরুদ্দির তাজা দেহটা। ওস্তাদের নাম নিয়ে ঠিক ঠাহর ক'রে ঝাড়লে এক কোপ রাম-দা তুলে। সামান্য একবার একটু

আওয়াজ বেরুল—বাপ! তারপর একেবারে নিস্তব্ধ। তখন যদি আর একটা কোপ দিয়ে আসতে পারত সে!

পাশের ঘরের লোক জেগে উঠেছে তখন। আর ফুরসৎ পেলে না তোরাব। কাম যে ফতে—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সে ঘরে ফিরল। ফিরে তার সাকিনা আর সুরুকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে নিশ্চিন্তে ঘুমাল।

কিন্তু সবই হচ্ছে খোদার মরজি। সবই তার পোড়া নসিবের ফল। একগাছা দড়ি টাঙানো ছিল সেই মাচার ওপর। তোরাবের কোপ সেই দড়ি কেটে তবে নামল লোকটার ওপর। ফলে শুধু কাটা গেল তার একখানা হাত। হাত কেটে পাঁজরায় যেটুকু চোট লাগল, তাতে তার কিছুই হ'ল না। তাকে নৌকায় তুলে মহকুমায় নিয়ে গেল গ্রামের লোকেরা। সেখানে হাকিমের কাছে তোরাবের নাম ক'রে দিলে আমিরুদ্দি।

গেল সব ভেসে। ঘর সংসার ছেলে মেয়ে বউ সর্বস্ব রইল প'ড়ে। তোরাবকে চোদ্দ বছরের জন্যে ছেড়ে আসতে হ'ল তার সাকিনাকে, তার সুরুকে আর সেই এক বছরের দুধের বাচ্চাটাকে। তাদের দুধ খাওয়াবার জন্যে একটা গাই আর বাছুর জোটাতে গিয়েই এই ফ্যাসাদ বাধল।

"হায় খোদা, এই কি তোমার বিচার! কি অপরাধ করেছিল সেই দুধের বাচ্চারা তোমার দরবারে! কোন্ দোষে তাদের বাপজানকে হারাল তারা! কি পাপে আজ তারা পথের কুকুরের মত পরের দরজায় প'ড়ে আছে!"

বলতে বলতে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুত না তোরাবের।

যে হাত দিয়ে সে লোহার গরাদটা ধ'রে থাকত, সেই হাতখানা কাঁপত থরথর ক'রে। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বহুদূরে আকাশের গায়ে কি পড়ত তোরাব তা আমি বলতে পারব না।

আমার নয় থেকে খরচা হয়ে গেল আট। আর তোরাবের চোদ্দ থেকে নয় বাদ গিয়ে রইল মাত্র পাঁচ।

শেষের কটি দিন।

সকালে বিকেলে দুপুরে ত্রিশবার ক'রে শুনতে লাগলাম, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কত কম খরচে নলবুনিয়া গিয়ে পৌছতে পারব আমি। একবার যে যেতেই হবে আমায় সেখানে। তাদের যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে! তাদের মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, আর বাকি আছে মাত্র পাঁচ। এই পাঁচ থেকেও আর এক বছর ঠিক ছাড় পাওয়া যাবে। তার মানে মাত্র আর চারটে বছর। এ আর কতটুকু সময়! খুব সাবধানে থাকে যেন তারা। খুব সাবধানে, কোনও ছোঁয়াচ যেন না লাগে উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাবালির বংশে।

কিছুতেই তোরাবকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না যে, যাবই আমি তার বাড়িতে। যত খরচই লাগুক আর যতদিনই লাগুক। তোরাবের চুরি ক'রে আনা রুটি দোক্তা লেবু—এক কথায় তার অতিথি হয়েই কাটালাম আমি ন মাস। এ ঋণ আমি শোধ করবই।

কিন্তু ওখান থেকে তাদের দেখে এসে তোরাবকে সংবাদটা দেওয়া যাবে কি ক'রে?

তারও কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু একবার সাকিনা, নুরু আর নুরুর ভাইকে মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, তাদের বাপজান এল ব'লে। এলে সে তাদের ভার কাঁধে তুলে নেবে, তখন আর চিন্তা কি!

আমার ছাড়া পাবার আগের দিন তোরাব আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললে সে। বললে, "কত বাবুকেই ঠিক এই ভাবে সেবাযত্ন করলাম হুজুর। সকলেই কথা দিয়ে গেলেন। কে জানে, তাঁরা যেতে পেরেছেন কি না! যদি তাঁরা একবার যেতেনই সেখানে, তা হ'লে এই আট বছরের মধ্যে অন্তত একবারও কি সাকিনার মা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসত না এখানে?"

গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি। কি জবাব দেওয়া যায়!

হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল তোরাব। একটা কাল কেউটে যেন ফোঁস ফোঁস ক'রে উঠল।—"সেই হারামজাদা রয়জুদ্দি। সে ঠিক দখল করেছে সব। তার গ্রাসে নিশ্চয়ই গেছে আমার সমস্ত। হেই খোদা, যেন পাঁচটা বছর আর পার করতে পারি আমি। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে—"

দাঁতগুলো সব কড়মড় ক'রে উঠল তোরাবের।

পরদিন সকাল সাতটায় আমায় জেল-আফিসে পৌঁছে দিয়ে তোরাব মুখ বুজে ফিরে গেল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা চাপ দিতে পেরেছিলাম আমি।

জেলগেট পার হতেই মহা সমাদরে আমায় গ্রহণ করলেন বাইরের কর্তারা এবং মহাযত্নে সোজা স্টীমারে নিয়ে তুললেন।

তারপর নলবুনিয়ার বদলে বীরভূমের নলহাটি পৌঁছে মাঠের মাঝে একখানা খড়ের ঘরে তিন বছরের জন্যে আশ্রয় পেলাম। নলবুনিয়া অনেক পিছনে প'ড়ে রইল।

আরও সাত বছর পরে। অন্য এক জেল। এবার আমার ভাগ্যে সাগর ডিঙোনোর ডাক এসেছে। জাহাজের আর কয়েকটা দিন দেরি। এক বোঝা অলঙ্কার পরিয়ে রাখা হয়েছে আমায়। তা প্রায় সবসুদ্ধ সের পাঁচেক ওজন। দু পায়ের গোছে দুটো লোহার বেড়ি। এক-একটা দু হাত লম্বা লোহার ডাণ্ডা আটকানো সেই বেড়ির সঙ্গে। ডাণ্ডা দুটোর অন্য প্রান্ত দুটো আবার আর একটা লোহার বালায় লাগানো। একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। একটা হাত দিয়ে সেই লোহার বালাটা কোমরের কাছে ধ'রে তবে চলাফেরা করতে হয়। ঝড়াং ঝড়াং বাজনা বাজে পা ফেললেই।

চালান হয়ে এলাম গয়নাগাঁটি সুদ্ধ কলকাতায়। তোলা হ'ল এক জেলে। দিন চারেক পরে তোলা হবে জাহাজের খোলে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের সেল থেকে কে গোঙাচ্ছে! বরিশালিয়া ভাষায় কে বলছে—"সাকিনা রে, মুরু রে, তোদের জন্যে কিছুই ক'রে যেতে পারলাম না রে, কিছুই ক'রে যেতে পারলাম না।"

কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম—"কোথায় তোরা প'ড়ে রইলি রে, তাও জেনে যেতে পারলাম না।" কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ উৎকট শব্দে হা-হা ক'রে হাসি।—"শেষ ক'রে এসেছি হারামীর বাচ্চাদের। দুটোকেই জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে এসেছি নিজে। সেখানেও কি তোরা শান্তি পাবি মনে করেছিস? দাঁড়া, আসি আমি। তারপর দেখাব তোদের।" আবার সেই প্রেতের হাসি রাতের আঁধারকে খান খান ক'রে ফেললে।

হঠাৎ আমিও চিৎকার ক'রে উঠলাম, "তোরাব, তোরাবালি মেট!"

হাসি থামল। ভাঙা গলায় সাড়া দিলে, "কে?"

দু হাতে সেলের গরাদে দুটো আঁকড়ে ধ'রে গরাদের ফাঁকে মুখটা চেপে চেঁচাতে থাকলাম, "আমি—আমি তোরাব। সেই যে বরিশাল জেলে আমি সেলে ছিলাম আর তুমি আমায় রুটি খাইয়ে বাঁচিয়েছিলে ন মাস। সেই যে—"

নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব এল, "তা কি বলছেন বলুন।"

আকুল হয়ে উঠলাম, "এবার আমায় চিনতে পেরেছ তোরাব? সেই যে তুমি আমায় নলবুনিয়া যেতে বলেছিলে!

সে জিজ্ঞাসা করলে, "তা কর্তা, আবার এলেন কেন?"

কি উত্তর দেব? বললুম, "নসিব ভাই, সবই নসিব। এবার কালাপানি পেয়েছি। আর পাঁচ দিন পরেই জাহাজ ছাড়বে।"

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু তোমার তো এতদিনে খালাস পাবার কথা। সে সময় আমরা যেন হিসেব করেছিলাম যে, আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি ছিল তখন তোমার।"

আবার সেই প্রেতের হাসি শোনা গেল পাশের সেল থেকে। হাসি থামলে শুনতে পেলাম, "এবার একেবারে খালাস পাব কর্তা। সেবার হিসেবের

ভুল হয় নি। চার বছর পরেই বাইরে বেরিয়েছিলাম সেবার। তারপর তাদের খুঁজে বার করতে লেগে গেল পুরো এক বছর। এই শহরেরই এক বস্তি। ওয়াটগঞ্জ, না, মুন্সিগঞ্জ কি নাম তার! সেইখানে তাদের পাকড়াও করলাম। রয়জুদ্দি সারেং আর তার বেগম মরিয়ম বিবিকে। কত তার পর্দা, কত আবরু, কত ইজ্জত! দরজায় চিক টাঙানো! পায়ে বাহারী চটি, গালে ঠোঁটে হাতে রঙ, চোখে সুরমা! আসমানী রঙের ফুল তোলা ছুরছুরে শাড়ি! তা ওই সমস্ত বাহারসুদ্ধই সে গেছে। একই সঙ্গে দুজনকে ঠিক জায়গায় আশনাই করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমি এখানে এসেছি। আমাকেও তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা ওদের পিছু পিছু।"

আবার সেই উৎকট হাসি।

ওয়ার্ডার তেড়ে এসে আমার সেলের দরজায় রুলের ঘা মারতে লাগল, "এই, হল্লা বন্ধ করো।"

ওকে গ্রাহ্যই করলাম না। চিৎকার ক'রে বললাম, "তোরাব ভাই, তোমাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি নি আমি। তোমার ছেলেমেয়েকে দেখতে যাওয়া হয় নি আমার। জেল-গেটেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে—"

এবার আমার সেই আগেকার তোরাবের গলা শুনতে পেলাম। সেই একান্ত আত্মীয়ের গলা।—"সে খবর আমিও পেয়েছিলাম কর্তা। আপনি আর মনে দুঃখ রাখবেন না। গেলেও আপনি তাদের দেখা পেতেন না। আমিও ফিরে গিয়ে তাদের পাই নি। তাদের মা তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার পর তাদের কি দশা হয়েছিল কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। ছেলে মেয়ে বউ ওসব শাঁখের করাত—কর্তা, একেবারে শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে।"

ওয়ার্ডার তোরাবের দরজায় গিয়ে রুল ঠুকতে লাগল। তার পরদিন সকালে অন্য প্রান্তের সেলে আমাকে সরানো হ'ল। আর জাহাজও ছাড়ল ঠিক পাঁচ দিন পরে।

আমি রওনা হলাম। আমার যাত্রার আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমার বন্ধু তোরাব বোধ হয় ঠিক জায়গায় পৌছে এতদিনে শান্তি পেয়েছে।

২

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মত। হয় লুকিয়ে থাকা নয় পালিয়ে বেড়ানো এই করে জীবন কাটছে তখন। যেখানে বহু লোকের ভিড় জমে সেখানেই লুকিয়ে থাকার সব চেয়ে বড় সুযোগ। তাতেও যখন পোষায় না তখন পালিয়ে বেড়াই। কোনও কারণ না থাকলেও পালাতাম, পাছে কেউ কিছু আমার সম্বন্ধে চিন্তা করে এই ভয়ে লুকাতাম। কয়েক বছর জেল খেটে বার হয়ে মনে করলাম যে আমি এমনই একটা ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে পড়েছি যার জন্যে দেশ সুদ্ধ সবাই আমার সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে বাধ্য। দেশের জন্যে যখন জেল খাটলাম তখন দেশের লোকে হন্যে হয়ে খুঁজবে না কেন আমাকে। বিশেষতঃ ওঁরা, যাঁদের খাতায় জলজল করছে আমার নাম, নামের পাশে লেখা আছে—অতি বিপজ্জনক জীব—তাঁরা যে আমায় গরু খোঁজা করে খুঁজছেন সে সম্বন্ধে কি আর কোনও সন্দেহ আছে। হায় তখন কে জানত যে ওঁরাও এই দেশের লোক সুতরাং সমান অকৃতজ্ঞ। আমার মত দেশসেবকের কথা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন। শুধু লিখে রেখেছেন নিজেদের খাতায়—খামখেয়ালী লোক, কোনও ভয় নেই এর সম্বন্ধে।

কিন্তু ভুলতে দেব কেন আমি সকলকে আমার কথা। নিজেকে নিজে জড়িয়ে রাখব এমন রহস্যের মাঝে, করে বসব এমন সব তাজ্জব কাণ্ড কারখানা যার কোনও অর্থ খুঁজে না পেয়ে সবাই অস্থির হয়ে উঠবে। তবেই না মজা।

এই মজায় তখন পেয়ে বসেছে আমাকে।

জুটেছিলাম গিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায়। কাজও জুটেছিল একটি। জেলে-

ভাজার দোকানে বেগুনী ফুলরি পাঁপর ভাজার কাজ। মনের আনন্দে দিন কাটছে ভাজা ভেজে। একটা উনুনে আমি বসেছি আর একটায় দোকানদার নিজে বসেছে। সে ভাজছে কচুরি শিঙ্গাড়া জিলিপি। দোকানদারের ছেলে বেচছে আমাদের দুজনের ভাজা, পয়সা গুণে নিয়ে ফেলছে মস্ত একটা পেতলের ডাবরে। ভেজে কুলিয়ে ওঠা যায় না এত খদ্দের। পুণ্যস্নান করতে গিয়ে তেলে-ভাজা খাওয়ার ঝোঁকটাই যেন বেশী তীর্থযাত্রীদের। এতগুলো দোকানে যত তেলে-ভাজা ভাজা হচ্ছে তা চক্ষের নিমেষে যাচ্ছে উধাও হয়ে। পৌষ মাসের শীতেও দরদর করে ঘাম ঝরছে আমাদের কপাল থেকে, ধোঁয়ায় আর পোড়া তেলের গন্ধে দম আটকে আসছে। প্রচণ্ড ভিড়ে আর উড়ন্ত ধূলোয় কোনও দিকেই কারও নজর যাচ্ছে না।

তখনও সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি আছে। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল মানুষ। হুড়মুড় করে মস্ত একটা পাহাড় যেন ভেঙ্গে পড়ল আমাদের ওপর। উনুন কড়া তেল বেগুন পাঁপর সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক নিমেষে। গোলমাল উঠতেই দোকানদার চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল কড়া ছেড়ে—'হুঁশিয়ার ভেইয়া, আপনা জান বাঁচাকে।' বলে টাকা পয়সার ডাবর তুলে নিয়ে তৈরী হোল। আমিও খুন্তি ঝাঁজরা ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। পাল্লা বাটখারা নিয়ে দোকানদারের ছেলে আগেই দৌড় দিলে উত্তর দিকে। সমুদ্রের স্রোতের মত মানুষের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল হোগলা পাতার ছাউনি উনুন কড়াই পরাত গামলা ভাজা অভাজা সমস্ত মালপত্র। দুশো দোকান বসেছিল যেখানে সেখানে আর কোনও কিছুর চিহ্ন মাত্র রইল না।

এই ছিল তখনকার সরকারী রীতি। গোটাকতক হাতি দিয়ে বহুদূর থেকে লোক তাড়া করা হোত। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, খাবারের দোকান থেকে কলেরা ছড়ায়, সেই দোকানগুলো উঠিয়ে দিতে হবে। জমিদারকে উপযুক্ত সেলামী দিয়ে যারা দোকান দিয়ে বসেছে তাদের উঠতে বললে সহজে উঠবে

কেন? আর কে-ই বা যায় অত ঝঞ্ঝাটে, তার চেয়ে ঢের সোজা পন্থা হচ্ছে নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নেড়ে সব তছনছ করে দেওয়া। কার হাতি, কেন খামকা ক্ষেপে উঠল হাতিরা, কেনই বা লোক তাড়া করতে গেল এ সব প্রশ্ন কাকেই বা করা হবে আর কে-ই বা জবাব দেবে। কখন কোথায় হাতি ক্ষেপবে তার জন্যে সরকারী হুজুররা দায়ী হতে পারেন না। হয়ত কিছু লোকের সর্বাঙ্গ পুড়ে গেল গরম তেলে আর জ্বলন্ত উনুনে, কয়েকজন মেয়ে পুরুষ হয়ত সশরীরে স্বর্গলাভ করলে মানুষের পায়ের তলায় পড়ে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? পরিকল্পনা-মত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল ত!

দোকানদারদের যা লোকসান হ'ত তা তারা গ্রাহ্যও করত না। এই রকমের হাঙ্গামা হুজ্জতের জন্যে তারা তৈরী হয়েই দোকান সাজাত, মজুদ মাল কিছুই রাখত না, হাঙ্গামা ঠাণ্ডা হলে আবার দোকান খুলে বসত মেলার অন্য দিকে।

লক্ষ লোকের সঙ্গে দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগলাম। কি একটা ছিটকে এসে পড়ল পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার ওপর পেছনের মানুষের ধাক্কায়। হাজার হাজার লাথি পড়তে লাগল পিঠে। পায়ের দুই হাঁটু আর দুই হাতে ভর রেখে মাথা গুঁজে দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলাম। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। সহরের রাস্তা নয় যে দুপাশে লোক সরতে পারবে না। আর মানুষ কখনও ইচ্ছে করে মানুষের ওপর দিয়ে চলে না। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, কাজেই মানুষের পায়ের চাপে আর চিঁড়ে-চেপ্টা হতে হ'ল না। দু-পাশ দিয়ে লোকজন ছুটে বেরিয়ে গেল। আবার কয়েকজন দাঁড়িয়েও পড়ল আমার চারপাশে। টেনে তুললে আমাকে তারা। তুলে দেখে বুকের নিচে একটা চার পাঁচ বছরের ছেলে। ছেলেটা অক্ষত রয়েছে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ গেছে থেঁতলে আর নাক মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে।

বোধ হয় সামান্য ক্ষণ হুঁশ ছিল না আমার। হুঁশ হতে দেখি হুড় হুড় করে মাথায় মুখে জল ঢালা হচ্ছে। চোখ চাইতে জল ঢালা বন্ধ হ'ল আমি

তখন প্রথম খেয়াল হ'ল যে ছেলেটা নিজের ছোট্ট দুখানি হাত দিয়ে আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে।

চারিদিক হতে হাজার রকমের প্রশ্ন বর্ষণ হচ্ছে আমাদের ওপর। আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, সঙ্গে আর কেউ এসেছে কি না, কোথায় পৌছে দিতে হবে। কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। উত্তর দেবার মত অবস্থাও নয় তখন। ঠোঁট মুখ ফুলে উঠেছে, বাক্‌রোধ হবার মত অবস্থা।

ছেলেটি কিন্তু সমানে উত্তর দিচ্ছে সব প্রশ্নের। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, আমি তার ছোট মামা. ঠাকুমা বাবা সবাই এসেছে মেলায়, বাবার নাম শ্রীহিমাদ্রিশেখর ঘোষ, বাড়ী ভবানীপুরে। অতটুকু ছেলে, কিন্তু বেশ চালাক চতুর। আমি ওর ছোট মামা হ'তে গেলাম কি ক'রে! ওর কথা শুনছি আর মনে মনে ভাবছি এবার আমার কর্তব্য কি। কর্তব্য ছেলেটিকে ওর আত্মীয়দের হাতে দিয়ে আমার সেই তেলে-ভাজা মনিবের সন্ধান করা। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না, হাঁটু দুটো যেন কে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

"এই যে এখানে, এই যে অরুণ বলে," চেঁচিয়ে উঠল কে।

"ওরে আমার গোপাল রে, ওরে মানিক আমার," হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দু-হাতে ছেলেটিকে বুকে জাপটে ধরলেন এক বুড়ি।

"কই কোথায়, কোথায় অরুণ", কোমরে চাদর জড়ানো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে দুজন পুলিশ আর একজন বোধহয় ছোট দারোগা। ছেলের মা বোনও এসে পৌছল ছেলের কাছে। ছেলে ফিরে পেয়ে ওঁদের আনন্দ উত্তেজনা চরমে গিয়ে পৌছল। ছেলে বুড়ির বুকের ভেতর থেকে জোর করে বেরিয়ে এসে আমাকে জাপটে ধরলে। তখন তাঁদেরও নজর পড়ল আমার দিকে। শুনলেন সকলের মুখ থেকে যে আমি বুকের নিচে রেখে পায়ের তলায় পিষে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি ছেলেকে। বুড়ি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলে।

আমার আর সহ্য হল না গোলমাল। আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

যখন ভাল করে সব বোঝবার মত অবস্থা নিয়ে ঘুম ভাঙল তখন চোখ চেয়েই দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট মুখ। এক মাথা কোঁকড়া চুল সুদ্ধ ছোট্ট একটি মুখ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

• আমাকে চোখ চাইতে দেখে চীৎকার করে উঠল সে, "ও মা, ও দিদি শিগগির এস, ছোট মামা চোখ চেয়েছে।" বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম চারপাশে। খাটের ওপর ভাল বিছানায় শুয়ে আছি, খাটের পাশের দুটো জানলা দিয়ে অপর্যাপ্ত রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। আলমারি টেবিল চেয়ার দিয়ে ঘরখানি সাজানো। বুঝতে পারলাম নেহাৎ গরীব লোকের ঘর নয়।

সব মনে পড়ে গেল। গঙ্গাসাগর মেলা, তেলে-ভাজার দোকান, প্রাণ নিয়ে পালানো, লোকের পায়ের তলায় পড়া, একে একে সব ফুটে উঠল আমার স্মৃতির পর্দায়। ছেলেটির সুন্দর মুখখানিও মনে পড়ে গেল।

কিন্তু এখন আমি এ কোথায় কার ঘরে শুয়ে আছি!

অরুণের সঙ্গে অনেকে ঘরে ঢুকলেন। অরুণ এক লাফে উঠে এল খাটের ওপর। আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেঁচাতে লাগল, "ও মামা, চোখ খোলো না। এই ত খুলেছিলে চোখ একটু আগে—ও মামা।"

কে ধমক দিলেন, "ছিঃ অরুণ চেঁচিও না অত, তোমার মামার কষ্ট হবে যে।"

এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল অরুণের গলা, "আঃ চেঁচাচ্ছি না কি আমি। এই ত মামা চোখ খুলে দেখলে আমাকে একটু আগে।"

সুতরাং আবার চোখ খুলতে হ'ল, হেসে ফেললাম অরুণের মুখের দিকে চেয়ে।

অরুণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা—এই দেখ মামা হাসছে।"

অরুণের মা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার কপালে হাত রাখলেন। "নাঃ আজ আর জ্বর আসবে না বোধহয়।"

পেছন থেকে কে বললে, "আবার আসতে কতক্ষণ, বিকেলের দিকে আবার আসবে হয়ত।"

—"ছিঃ অমন অলক্ষণে কথা আর মুখে আনিস নি শিউলি। আবার জ্বর আসবে কি করতে? বাছা এবার সেরে উঠবে ঠিক।"—এগিয়ে এলেন অরুণের ঠাকুমা। এসে আমার কপালে বুকে হাত বুলিয়ে দেখলেন।

শিউলি জিজ্ঞাসা করলে তার মাকে, "এবার কমলার রস করে আনব মা?"

তার মা নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমায়, "কি খেতে ইচ্ছে করছে ভাই?"

বললাম, "শুধু একটু গরম চা।"

"চা—এবার চা খাবে মামা", অরুণ হাততালি দিয়ে উঠল।

পেছন থেকে শোনা গেল বেশ ভারী গলার আওয়াজ, "কই দেখি, একটু সর ত তোমরা, এই যে ভায়া, কেমন মনে হচ্ছে এখন?"

আমাকে কোনও উত্তর দিতে হোল না। অরুণ বললে, "মামা একদম সেরে গেছে। এইবার চা খেতে চাচ্ছে বাবা—শুধু চা।"

হিমাদ্রিবাবু বললেন, "চা নয়, ভাল করে কফি তৈরী করে নিয়ে আয় শিউলি। আঃ বাঁচা গেল, এ কদিন যে ভাবে কেটেছে আমাদের। আপনার ঐ পাজী ভাগ্নেটার জন্যে এক মিনিট কেউ মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পাইনি। কখন আপনি চোখ চাইবেন আর কথা বলবেন এই এক কথার উত্তর দিতে দিতে আমরা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। এবার যত পারেন বকুন ঐ পাজীটার সঙ্গে। যাই ডাক্তারকে খবরটা দিয়ে আসি। মা—এবার তুমি ভাত-টাত খাবে ত, আজ পাঁচ দিন ত শুধু জল খেয়ে কাটালে?"

মা ধমক দিলেন ছেলেকে, "তুই থাম্ ত হিমু, আমার ভাত খাওয়া পালাচ্ছে না। আগে বাবার মুখে দুটি অন্ন পথ্য দি, মা কালীর পূজো পাঠাই,

তা না আগেই আমার ভাত খাওয়া। ওরে ও শিউলি—গেলি তুই কফি করতে?" বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অরুণের মা বললেন, "এখন আর বকিও না তোমার মামাকে অরুণ। চল এখন, স্নান ক'রে ভাত খেয়ে আবার এসে বসবে মামার কাছে।"

একান্ত অনিচ্ছায় অরুণ উঠে গেল মায়ের সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবু এসে বসলেন খাটের পাশে।

বললেন, "আপনার বাড়ীতে একটা খবর পাঠাতে হবে।"

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলাম। হিমাদ্রিবাবু বললেন, "কি হোল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি।"

চোখ চাইলাম, হিমাদ্রিবাবু আবার বুঝিয়ে বললেন, "আপনার বাড়ীতে একটা সংবাদ দিই এবার। যদি দূরে হয় আপনার বাড়ী, তাহলে তার করব তাঁদের আসবার জন্যে। আর কাছাকাছি কোথাও হ'লে নিজে যাচ্ছি এখনই। কি ঠিকানা আপনার, কার কাছে খবর দিতে হবে?"

মাথার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বললেন আপনি?"

হিমাদ্রিবাবু ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন তাঁর বক্তব্য। আমি মুখে চোখে অনাবিল বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললাম, "কই—মনে ত পড়ছে না কিছু।"

অরুণের বাবা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর দুই চোখে ফুটে উঠল অকৃত্রিম বেদনা। মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, "ও আচ্ছা আচ্ছা, শুয়ে থাকুন আপনি শান্ত হয়ে, যাচ্ছি আমি ডাক্তারের কাছে।"—উঠে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে।

বাইরে তাঁর চাপা গলা শোনা গেল। স্ত্রীকে বলছেন, "খুব সাবধান, একজন না একজন নজর রাখবে ওঁর দিকে। মাথায় চোট লেগে সব গোলমাল হয়ে গেছে, নিজের ঠিকানাও মনে করতে পারছেন না। আপনার লোকের কথা মনে পড়ল না ওঁর। দেখ, যেন রাস্তায় না বেরিয়ে পড়েন ভদ্রলোক, আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আসছি।"

বাঁধা পড়লাম আত্মীয়তার ডোরে। রোগ সেরে গেল, হাত পায়ের চোট গেল শুকিয়ে, বিছানা ছেড়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম স্বাভাবিক ভাবে। সবই ঠিক আছে শুধু বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি, দুহাতে নিজের মাথার চুল ধরে টানাটানি করি বা ঘাড় হেঁট করে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের ডাক্তার আর মাথার ডাক্তার ডেকে আনলেন হিমাদ্রিশেখর। তাঁরা বলে গেলেন, "মাথায় চোট লাগলে এ রকম হয়, একদিন সব সেরে যাবে, বাড়ীর কথা মনে পড়বে। এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। রুগীর মন যাতে প্রফুল্ল থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।"

এতটুকু ত্রুটি হ'ল না সে চেষ্টার। হিমাদ্রিশেখরের ছিল বই কেনার সখ আর মেয়ে শেফালীকে শিখিয়েছিলেন গান। বিয়ে দেবার জন্যে হারমোনিয়াম টিপে হাঁপাতে শেখান নি, সত্যিকারের গানই শিখিয়েছিলেন। গানে আর বইএ ডুবে রইলাম। কিন্তু এভাবে এঁদের ঠকিয়ে কতদিন আর কাটানো যায়। স্নেহ ভালবাসা অকপট আত্মীয়তার বদলে নির্জলা কপটতা চালাতে আর মন চাচ্ছিল না। কিন্তু উপায় কি? চোখের আড়াল হবার যো নেই, কেউ না কেউ ঠিক পাহারা দিচ্ছেই।

সবচেয়ে বেশী পাহারা দিচ্ছে অরুণ আর তার দিদি শেফালী। শেফালীকে পড়াচ্ছি। আমার গরজেই সে পড়ছে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে তার অসুখ হওয়ার ফলে পড়া বন্ধ হয়। সে আজ তিন বছর আগেকার কথা। আমি বললাম, "দিয়ে দাও এবার ম্যাট্রিকটা। সামান্য খাটলেই হয়ে যাবে। খামকা ম্যাট্রিকটা না দিয়ে বসে আছ কেন যখন প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত ঠেঙিয়েছ!"

শেফালীর বাবা মা ঠাকুমা বলেন, "ও যদি ম্যাট্রিক পাশ করে ত করবে অরুণের মামার জন্যে। ও রকম যত্ন করে গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করবে কে ওকে।" শুনে আমি নিজের মনকে বোঝাই যে আমার জন্যে এঁদের যে খরচাটা হচ্ছে তার বদলে তবু কিছু পরিশ্রম করছি শেফালীকে পড়িয়ে। পড়াবার মত বিদ্যে আমার পেটে আছে জেনে ওঁরাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

খোঁজাখুঁজি সুরু হয়েছে আমার আত্মীয়স্বজনের, একটি লেখাপড়া জানা ভদ্রসন্তান যার জন্যে ওঁদের একমাত্র ছেলের জীবন বেঁচেছে, তাকে এ ভাবে আটকে রাখতে বিবেকে বাধছে ওঁদের। আমার আত্মীয়স্বজনকে একটা সংবাদ দিতে না পেরে হিমাদ্রিবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

আরও একটা ঝঞ্ঝাট বাড়ছিল দিন দিন। এঁদের পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হিমাদ্রিবাবুর অফিসের বন্ধুবান্ধব দল বেঁধে দেখতে আসা সুরু করলেন আমাকে। তা ছাড়া যাঁদের কস্মিন্‌কালে কোনও আপনার লোক হারিয়েছে তাঁরা বার বার এসে পরীক্ষা করে গেলেন—আমিই তাঁদের সেই হারানো আপনার জন কি না। শেষে একটা উপায় ঠাওরালাম। কেউ দেখতে এলেই খাওয়া আর কথা বলা বন্ধ করে দিতাম। আবার এঁরা ছুটলেন মনের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—"কেউ যেন বিরক্ত না করে রুগীকে। ভিড়ের মাঝে পড়ে মাথায় গোলমাল হয়েছে, সেই জন্যে ভিড় দেখলেই ও রকম হয়ে যায়।" আমাকে দেখতে আসা বন্ধ হ'ল তারপর।

নিশ্চিন্ত হয়েই আছি এক রকম। ওঁরাও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। কি দরকার অত খোঁজাখুঁজি করে, যেদিন মাথার ঠিক হবে সেদিন যাবে বাড়ী চলে। ছেলে মেয়ের একজন ভাল শিক্ষক পাওয়া গেছে। হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী নিজের ভাই বলেই মনে করেন, ছেলে অরুণও অষ্টপ্রহর আমাকে ছাড়া থাকে না। খাওয়া শোওয়া সব আমার সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবুর মা ভাবেন আমি তাঁর আর একটি ছেলে। শুধু শেফালী মাঝে মাঝে উলটো পালটা এক একটা প্রশ্ন ক'রে বসে। কোন দিনও সে আমায় মামা বলে ডাকে না। কিছু বলেই ডাকে না। তার ডাকবারই দরকার করে না। যা বলবার সামনে এসে বলে।

এক এক দিন বলে বড় গোলমেলে সব কথা। একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ চাপা গলায় বললে, "আপনার নাম আমি জানি।"

হাসি-মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাই নাকি। আচ্ছা বল ত আমার নাম কি?"

সোজা আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে শেফালী, "আপনার নাম নিরঞ্জন।"

"কি করে জানলে ?"

"অসুখের সময় বেহুঁশ অবস্থায় অনেকবার নিজে উচ্চারণ করেছেন ঐ নাম।"

চুপ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। খুবই সম্ভব বেহুঁশ অবস্থায় ও নামটি উচ্চারণ করেছি। নিরঞ্জন আর আমি অনেক দিন এক জেলে ছিলাম। তার ফাঁসি হয়ে গেছে আন্দামানে একটা ওয়ার্ডারকে খুন করেছিল বলে। ফাঁসি আমারও হোত, নিরঞ্জন সব দোষ নিজের মাথায় নিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দেয়।

সে কথা ত শেফালীকে খুলে বলা চলে না। কাজেই চুপ করে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। ও রাগ করে উঠে চলে যায়।

বেশীক্ষণ ওর রাগ থাকে না আমার ওপর। চা কফি দুধ যা হোক্ একটা কিছু নিয়ে ফিরে আসে। বলে, "রাগ করলেন ত ? আচ্ছা কি করব বলুন ত আমি, আমারও আর কিছু ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে—"

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করি, "কি করে, কি ইচ্ছে করে তোমার শেফালি ?"

"জানি না যান্", বলে শেফালি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পড়াশুনা ভালোই চলছে। ওর মাথা ভালো, একবারের বেশী দু'বার কোনোও কিছু বোঝাতে হয় না। তবু এক একদিন যেন কিছুই বুঝতে চায় না শেফালী। আমি চটে উঠি, "যাও তুমি উঠে। কিছু হবে না তোমার। মন দিয়ে না শুনলে কাকে বোঝাব।"

"এবার কেমন লাগছে মশাই, যে বুঝতে চায় না তার কাছে শুধু শুধু মাথা খুঁড়তে হলে কেমন লাগে ?" শেফালীর চোখে কৌতুকের হাসি।

আশ্চর্য হয়ে বলি, "তার মানে !"

"মানে, আমারও ঠিক ঐ রকম লাগে বুঝলেন।"

আবার এক এক দিন প্রায় কেঁদে ফেলে, 'আর এভাবে চলবে না বুঝলেন, আর আমি পারি না। কিছুতেই আপনি কাকেও বিশ্বাস করতে পারেন না। কেন, কেন আমায় বিশ্বাস করেন না আপনি ?" কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর গলা।

না বোঝার ভান করা বৃথা, প্রায় উনিশ বছর বয়স হয়েছে ওর। তবু চাপা দেবার চেষ্টা করি।

"বই-খাতা তুলে রাখ শেফালি, নামাও তানপুরা তোমার। এবার শোনাও গান একখানা।"

নিজেকে সামলে নেয় শেফালী। গানই আরম্ভ হয় তখন, নিস্তব্ধ দুপুরে সেই সুর শুনে সত্যিই ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি রকম একটা করুণ অসহায়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। ইচ্ছে হয় অনর্থক এই ছল চাতুরী বন্ধ করে নিজেকে কারও হাতে সঁপে দিতে। শেফালীর দিকে চেয়ে দেখি ও তখন চোখ বুজে তানপুরাটা বাঁ গালে চেপে ধরে গমক না গিটকিরির প্যাঁচ কষছে গলায়। যদি ও ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত তা হ'লে হয়ত ঠিকই কিছু একটা করে ফেলতাম।

কিন্তু না—আর দেরি করা উচিত নয়। এঁদের নুনের দাম দিতেই হবে। অর্থাৎ আর একটুও অপেক্ষা না করে পলায়ন।

হঠাৎ শেফালী গান বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করে, "পালাবার কথা ভাবছেন ত ?" অবাক্ হয়ে যাই। মনের কথাও জানতে পারে নাকি ও। আমার ভ্যাবাচাকা-লাগা মুখের দিকে চেয়ে ও হেসে ফেলে, "তা হবে না মশাই, যতই সাধুপুরুষ হোন আপনি, আমি না ছেড়ে দিলে যাবেন কোথায় ?"

নিস্পৃহকণ্ঠে বলি—"তাই ভাবছিলাম শেফালী, তোমার পরীক্ষাটা চুকে গেলে—"

"আমার পরীক্ষা চুকবে না কখনও, আর আপনার যাওয়াও হবে না কোথাও।"

বলে উঠে পড়ে শেফালী।—"যাই এবার চা করে আনি, তিনটে বাজল; চা

না দিলে মা উঠে বকাবকি করবে।" একটু বেশ রহস্যময় হাসি হেসে ও চলে যায়।

বসে বসে ভাবতে থাকি, বড্ড জড়িয়ে পড়ছি। এবার সরতে হচ্ছে, আরও দেরি করার মানে হচ্ছে—

মানে যে কি তা আর কয়েকদিন পরেই বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় শেফালী এক মনে মাথা নিচু ক'রে অঙ্ক কষছে, আমি পড়ছি সদ্য প্রকাশিত একখানি উপন্যাস। নায়ক তখন বিদায় নিচ্ছেন নায়িকার কাছে। একটি বেশ প্রাণ-মোচড়ানো বক্তৃতা দিচ্ছেন নায়ক। এমন সময় শেফালী খাতাখানা আমার দিকে ঠেলে দিলে। আমি এমন মশগুল হয়ে আছি নায়কের বিদায়কালীন বক্তৃতায় যে সেদিকে খেয়ালই করলাম না।

"আঃ চট করে পড়ে ফেলুন না"—চাপা গলায় বললে শেফালী। চমকে উঠে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখি—একি! এ যে—

"আপনি পালান, এখনই চলে যান এখান থেকে, আপনার পরিচয় সকলে জেনে ফেলেছে। আমি লুকিয়ে শুনেছি, কাল রাত্রে বাবা যা বলছিলেন মাকে। পুলিশ আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে। কাল সকালে ফোটো তোলা হবে আপনার, সেই ফোটোর এক কপি দিতে হবে পুলিশকে। আমি জানি আপনার মাথা খারাপ হয় নি। কিচ্ছু হয় নি আপনার। এবার দয়া করে পালান আপনি।"

মুখ তুলে চাইলাম ওর দিকে। কি আছে ঐ চোখে! অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই ত এই চিঠি লেখার? পালাবার চেষ্টা করলে ত নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলব। হয়ত এই চিঠি পড়ে আমি কি করি তা দেখবার জন্যে আড়ালে সকলে সজাগ হয়ে আছে। আর তা যদি না হয়, যদি কাল সকালে ফোটো তোলা হয় আর সেই ফোটো যায় পুলিশের হাতে তা হলে—

হাত পা ঝিম ঝিম করতে লাগল। ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

খাতাখানা টেনে নিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে নিজের মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার কি লিখলে খসখস করে। লিখে ঠেলে দিলে খাতাখানা। পড়লাম "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? যখন বরিশাল জেলে ছিলেন তখন আপনার যে ফোটো তোলা হয় সেখানা বাবাকে দিয়েছে। আমি চুরি করেছি সে ফোটো। এ চেহারার সঙ্গে সে চেহারা না মিললেও আপনার চোখ দেখে আমি চিনেছি। নষ্ট করবার মত সময় নেই আর। আপনার দুখানা কাপড় আর দুটো জামা আমি বেঁধে রেখেছি। চলে যান ওপাশের দরজা দিয়ে। বাইরে হয়ত পুলিশে পাহারা দিচ্ছে। এখনও বাড়ী ফেরেন নি বাবা। যান—"

খবরের কাগজে জড়ানো ছোট একটি প্যাকেট টেবিলের নিচে থেকে বার করলে।

ওর দুই চোখ তখন জলছে। প্রায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। শেফালী উঠে গিয়ে ভেতর দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে এল কেউ এধারে আসছে কিনা। তারপর নিঃশব্দে বাইরের রোয়াকের দরজা খুলে কি দেখে এসে দাঁড়াল আমার বুক ঘেঁষে। ডান হাতে আমার ডান হাতখানা ধরে বাঁ হাতে নিজের জামার বোতামগুলো এক টানে পট পট ক'রে খুলে ফেললে। বার করলে জামার ভেতর থেকে একখানা ফোটো। একবার দেখেই চিনতে পারলাম। জেলের পোষাক পরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যক্তি যে আমি তাতে কোনও ভুল নেই। শেফালীর উদলা বুকের ওপর নজর পড়ল। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে উনিশ বছরের মেয়ের বুক। ওর কোনও লজ্জাসরম নেই সে সময়। আমার হাতখানা তুলে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললে, "বল, কথা দাও আর একবার অন্ততঃ আমায় দেখা দেবে।"

আমার মুখ দিয়ে বার হোল, "দোব।"

শেফালী ফোটোখানা বুকে রেখে জামার বোতাম এঁটে দিল। প্যাকেটটা আমার বগলে গুঁজে দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে কি দেখলে। দেখে এসে এক রকম ঠেলে বার ক'রে দিলে

আমাকে ঘর থেকে। সেই মুহূর্তে তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "মনে থাকে যেন আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলে তুমি।"

বন্ধ হয়ে গেল কপাট। অন্ধকার রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। ভয়ে আনন্দে না উত্তেজনায় তা আজ ঠিক বলতে পারব না।

দরজাটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নিজের ডান হাতখানা কপালে মুখে বুলিয়ে নিলাম। তারপর আমার দু পকেটে দু হাত পুরে মাথা নিচু ক'রে পথে নেমে পড়লাম। হাতে কি ঠেকল পকেটের ভেতর। টিপে দেখলাম এক তাড়া কাগজ। এ কাগজগুলো আবার এল কি ক'রে পকেটে—বার ক'রে মুখের কাছে ধরে অন্ধকারেই চিনতে পারলাম এক তাড়া নোট।

শরীরের রক্তে আবার আগুন ধরে গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের রক্তে এই আগুনই জ্বলত।

আচ্ছা, দেখাচ্ছি এবার মজা—আমায় ধরতে কত কলসী জল খেতে হয় বাছাধনদের তা দেখাচ্ছি। চিরপলাতকের চোখ-কান-নাক আবার সজাগ হয়ে উঠল। বড় রাস্তায় পড়ে মিশে গেলাম জনতার সঙ্গে। আর আমায় পায় কে।

আবার পথ।

পথ ত নয়, একখানি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। দিনগুলি সেই উপন্যাসের এক একখানি পাতা, বছরগুলি এক একটি পরিচ্ছেদ। পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিচ্ছেদ। রহস্য, রোমাঞ্চ, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা, হাসি কান্নায় ভরা উপন্যাস হচ্ছে পথ। এ উপন্যাসখানি হাত থেকে নামিয়ে রাখলে জীবন হয়ে যায় একঘেয়ে, বিস্বাদ, বিড়ম্বনাময়। সেই বিরতিটুকু ভরে ওঠে বাজে আবর্জনায়, জঘন্য ভাবে জট পাকিয়ে যায় নিজের ভাগ্যের সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার হাসি কান্না মান অভিমান। আর তখন জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসে একটা অসহ্য অবসাদ। নেশার মত আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরে সেই অবসাদ, অজগর সাপের মত একটু একটু ক'রে গ্রাস করতে থাকে।

তবু একটা অদ্ভুত মোহ আছে এই বিরতিটুকুর। বিগত পরিচ্ছেদগুলিতে যা পড়া হয়ে গেছে সেগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভাল ক'রে চেখে চেখে রসাস্বাদন করা যায় সেই সময়। আর নিজের মনকে তৈরী ক'রে নেওয়া যায় নতুন পরিচ্ছেদ সুরু করার উপযুক্ত ক'রে।

কিন্তু সেবার যখন আবার ডুব দিলাম আমার পথ নামক উপন্যাসে তখন কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে। অনবরত একটা কাঁটা যেন খচ খচ করছে কোথায়! ডান হাতখানা নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। বড় বেশী সচেতন হয়ে পড়েছি ডান দিকের কাঁধে ঝোলানো পুরানো হাতখানা সম্বন্ধে।

মাঝে মাঝে হাতখানা মুখের সামনে তুলে ধরে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। হিজিবিজি দাগ অনেকগুলি, কে জানে ঐ দাগগুলির গূঢ় অর্থ কি! অনেকবার নিজের কপালের ওপর, মুখে, বুকে চেপে ধরি হাতখানা। কৈ সে রকম ওঠানামা করছে না-ত! সেই ঈষৎ উষ্ণতা কোথায়! অবহেলায় উপন্যাসের পাতার পর পাতা উলটে চলে যাই। পাত্র পাত্রীদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আমায় স্পর্শ করে না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার, সব পাত্র পাত্রীই যেন এক কথা বলে—'মনে থাকে যেন আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।'

জুতো জামা কাপড় অলংকারের মত মন নামক পদার্থটিকেও যদি খুলে ফেলে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া যেত তা'হলে কত সহজ হোত আমার মজা ক'রে উপন্যাস পড়া! কিন্তু তা হবার নয় সহজে, বড় বিশ্রী পোষাক হচ্ছে এই মন। এ খোলস সহজে খুলে ফেলা যায় না।···অনেকগুলো পাতা, আস্ত গোটা-কতক পরিচ্ছেদ পড়া শেষ হয়ে গেল আমার পথ উপন্যাসের। তখন একদিন সবিস্ময়ে দেখলাম কবে পুরানো হয়ে পচে গলে খসে পড়ে গেছে আমার সেই রঙমাখা পোষাকটি তা আমি টেরও পাইনি। আর ডান কাঁধে হাতখানি যথা নিয়মে একান্ত অবহেলায় ঝুলছে আগের মতই, ঝুলন্ত হাতখানা দোলাতে দোলাতে অনেক দূরে আমি পৌঁছে গেছি উপন্যাসে ডুবে।

ভোল ফিরিয়ে ফেলেছি একেবারে! কাঁচা পাকা চুল দাড়ি, রক্ত বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে ইয়া বড় সিঁদুরের শুল আঁকা তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মহাপাত্র আর মহাকালকে। এতগুলি উপচারে সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে নিজে কল্কি অবতারের সাক্ষাৎ বংশধর ব'লে জ্ঞান করছি তখন। চা বাগানের কাঁচা পয়সা আর কাঁচা মদে মশগুল হয়ে দীর্ঘ বিরতি উপভোগ করছি মেটেলি কালীবাড়ীতে বসে। কাঁচা সাহেব থেকে সুরু করে পাকা বাবুরা পর্যন্ত সব আমার ভক্ত। চায়ের টেবিলের প্রেমের গল্প লিখতে লিখতে যাঁদের অরুচি ধরে গেছে তাঁরা হয়ত জানেন না ঐ প্রেম সোজা চা বাগান থেকে চা পাতার সঙ্গে মিশে সহরে এসে পৌঁছোয়। কাঁচা চা পাতা যারা তোলে আর যারা তোলায় তাদের মনের বিষাক্ত জীবাণু সেই কাঁচা পাতার সঙ্গে মিশে যায়। সেই জন্যেই অত বিকার উৎপন্ন হয় চায়ের টেবিল ঘিরে। কিন্তু তখন চা পাতা থাকে কাঁচা কাজেই সেই প্রেমও থাকে কাঁচা। সেই কাঁচা বিকারের চিকিৎসা করছি সর্বজনীন বাবার ভূমিকা নিয়ে।

হাতিফাঁদা বাগানের বড় সাহেব বড় ভাল লোক। দুর্গা পূজার সময় বিস্তর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন! কলকাতা থেকে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ের আমদানি করান। সেবার এল এক মেয়ে-পুরুষের থিয়েটার পার্টি। আর তার সঙ্গে একজন নাম করা কীর্তন গায়িকা। ঐ কীর্তন গায়িকা একাই মাত করে দিলেন সব বাগান। দুর্গা পূজা মিটে গেল, যাত্রা থিয়েটার ম্যাজিক পার্টি বিদেয় নিলে। কিন্তু কীর্তন গায়িকা রয়ে গেলেন তাঁর দলবল সহ। আজ এ বাগান কাল ও বাগান তারপর দিন আর এক বাগানে গান হচ্ছে। গান নাকি এমনই গাইছেন তিনি যে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠছে। কালী বাড়ীতে বসেই শুনতে পাচ্ছি—তাঁর গানের সুখ্যাতি। আরও একটি কথাও কানে আসছে যে কীর্তন গায়িকা হলেও তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অর্থাৎ 'বাজারে' নন।

দাবড়াচেরা বাগানের বড়বাবু আমার বড় ভক্ত। আমার দেওয়া এক

মাদুলির দৌলতে তাঁর বেশী বয়সে বংশ রক্ষা হয়েছে তৃতীয়বার বিবাহ ক'রে। অবশ্য বজ্জাত লোকে বলে গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যানভাসার গানবাবুকে ধর্মের ভাই সম্বন্ধ পাতিয়ে বাসায় স্থান না দিলে নাকি আমার কবচও কিছু করতে পারত না। গানবাবু ছোকরাটিকে আমি চিনি, সেও আমার বিশেষ ভক্ত। কাজেই সৎ চরিত্র। আমি আমার কবচকেই বিশ্বাস করি।

বংশ-রক্ষার হেতু সেই ছেলেটির অন্নপ্রাশন। বড়বাবু দশটা খাসি কিনে ফেল্লেন। দশখানা বাগানের বাবুদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। কলকাতার কীর্তন গায়িকাকে বায়না দিলেন তিন দিনের জন্য। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাগানের লরি পাঠালেন।

লরি থেকে নামতে বড়বাবুর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী নিজে হাতে পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে পা মুছে দিলেন। তাঁর ধর্মের ভাই সদা সর্বদা একখানা পাখা হাতে খাড়া আমার পেছনে। যার অন্নপ্রাশন তাকে আমার কোলে বসিয়ে ফোটো তোলা হ'ল। খাসি খেতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও আমার ভক্ত। কাজেই ধোয়া আর আঁচল-দিয়ে-মোছা পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে আশীর্বাদ করলাম। জ্বরে আর পেটের অসুখে অনবরত ভোগবার দরুণ হাড় জির-জিরে ছেলেমেয়ে-গুলিকে 'দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাক' বলতে হ'ল। যদিও জানি এদের অনেকগুলিই আমার আশীর্বাদ নিষ্ফল প্রমাণ করবার জন্যে ডুয়ার্সের ব্লাক ওয়াটারের ঠেলায় কিছু দিনের মধ্যেই স্বস্থানে প্রস্থান করবে।

এমন সময়ে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের মেয়ে এসে প্রণাম করলে আমায়। এর সাজপোষাক অন্য রকম, চোখে মুখে চা-বাগানের ছাপ পড়েনি। ছোট শরীরটি স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে টলমল করছে।

ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা এক মাথা নরম চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"নাম কি তোমার মা লক্ষ্মী, কোথা থেকে এসেছ তুমি?"

মিষ্টি হাসি হেসে ঘাড় হেঁট করে বললে সে—"কি ক'রে জানলেন আপনি

আমার নাম ?"

হো হো করে হেসে বললাম—"এই দেখ, তোমার নাম যে লক্ষ্মী তা ত দেখেই বোঝা যায়। তা কোথা থেকে এসেছ তোমরা ?"

"কলকাতা থেকে। আমার কিন্তু আর একটা নাম আছে, শুধু মা আমায় লক্ষ্মী বলে ডাকেন।"

"ও, তোমার মাও এসেছেন বুঝি—"

"আমারই মেয়ে ও" লাল পাড় দুধেগরদ পরা এক ভদ্রমহিলা গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আমায় প্রণাম করলেন।

প্রণাম সেরে উঠে হাঁটু গেড়ে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে জোড় হাতে বসে রইলেন আমার সামনে। তাঁর মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ব্যবধান মাত্র দুহাত, চতুর্দিকে অনেক জোড়া চোখ চেয়ে আছে আমাদের দিকে। আমার মাথাটা যেন কি রকম ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল আমার চোখ। তলিয়ে গেলাম নিজের মনের মধ্যে। হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম মনের অন্ধি-সন্ধি। ঘুলিয়ে যাচ্ছে অনবরত সব ছবি। এতবড় উপন্যাসখানার সব ক-টা চরিত্র যেন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আঁকুপাঁকু করছে বুকের ভেতরটা। একান্ত দামী জিনিস হঠাৎ হারিয়ে ফেললে যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি অবস্থা তখন আমার।

"আপনার সঙ্গে নির্জনে একটু দেখা হ'তে পারে কি ?"

চোখ চেয়ে দেখলাম তিনি তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পেছন থেকে বড়বাবু তাঁর ধ্যানখেনে গলায় ব'লে উঠলেন—"ইনিই এসেছেন বাবা কলকাতা থেকে, কীর্তন গেয়ে আমাদের মত পাপীদের উদ্ধার করতে। আপনিও পায়ের ধুলো দিলেন দয়া ক'রে অধমের বাসায়। তিন দিন এঁর গানের ব্যবস্থা করেছি—শুধু আপনাকে শোনাব ব'লে। হেঁ হেঁ—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ—হেঁ হেঁ।"

নিজের কৃতিত্বে নিজেই দুহাত কচলে হাসতে লাগলেন, হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।

তখনও চেয়ে আছি সেই চোখ-দুটির দিকে, দেখছি ঐ চোখে কোথাও লুকিয়ে আছে কি না ওঁর পরিচয়! ওই মুখ, ওই চিবুক, কপালের ওই রেখা ক-টি, বাঁ কানের ঠিক পাশে গালের ওপর ছোট্ট ঐ আঁচিলটি, অত লম্বা আর কালো চোখের পল্লব, এমন কি নাকের ওপর ঐ ঘামের বিন্দুগুলি পর্যন্ত কোথায় যেন লুকিয়ে আছে আমার মনের মধ্যে! কিন্তু চিনতে পারছি না ঐ চোখের দৃষ্টি, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আর আত্মপীড়ন লুকিয়ে আছে ঐ দৃষ্টিতে, কার তপস্যা করেন ইনি!

আবার কানে গেল সেই গলার স্বর—"আমি আপনাকে কয়েকটি কথা নির্জনে নিবেদন করতে চাই।" চমকে উঠলাম, কি জানি কেন বহুদিন পরে আবার সচেতন হয়ে উঠলাম নিজের ডান হাতখানা সম্বন্ধে। হাতখানা নিজের মুখের সামনে মেলে ধরে অন্যমনস্কভাবে হুকুম করলাম বড়বাবুকে—"যোগীন, সকলকে একবার বাইরে যেতে বলো ত, আগে শুনি এঁর কি বলবার আছে।"

"হেঁ হেঁ—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, চলো চলো সব বাইরে যাও তোমরা। বাবা এখন কৃপা করবেন আমাদের মা ঠাকরুণকে, হেঁ হেঁ।"

মেয়েটির মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন—"লক্ষ্মী, তুমিও মা একটু বাইরে যাও ত, আমি এঁর সঙ্গে দুটো কথা ব'লে আসছি।"

দরজা বন্ধ হ'ল বাইরে থেকে।

মাথা হেঁট ক'রে উনি বসে আছেন আমার সামনে, কোলের ওপর দুটি হাত রেখে। হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর একখানি হাতে। বাঁ হাতে তর্জনীর মাথাটা নেই।

অনেকদিন আগে আচমকা একদিন একখানা জলন্ত কয়লার ওপর পা পড়ে যায়। সেদিন যে রকম একটা ধাক্কা লেগেছিল ভেতরে, ঠিক সেই রকম একটা ধাক্কা লাগল বুকে। পেন্সিল কাটতে গিয়ে একটি মেয়ে একদিন উড়িয়ে দিয়েছিল তর্জনীর মাথাটা, কিন্তু একবার উঁহু আহাও করেনি মুখে। বরং সে কি হাসি, যেন অমন মজা সহজে হয় না। যত আমি লাফালাফি করছি রক্ত

বন্ধ করার জন্যে, মেয়ের তত স্ফূর্তি। ডান হাতে বাঁ হাতের আঙুলটা টিপে ধরে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। শেষে ডাক্তার এসে রক্ত বন্ধ করে!

হাঁ করলাম, গলা পর্যন্ত ঠেলে এল নামটি। সেই মুহূর্তে উনি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায় তাই জানতে চাই আমি।"

প্রাণপণ চেষ্টায় একটা ঢোঁক গিলে ফেললাম। তারপর বার করলাম বাবা-জনোচিত উচ্চাঙ্গের হাসি, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে। যতটা সম্ভব পরিহাসের স্বর আমদানি করলাম গলায়। বললাম—"আমি তা জানব কেমন ক'রে?"

অতি সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আপনি জানেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে বলতে পারেন। চা বাগানের সাহেব থেকে কুলিরা পর্যন্ত সবাই এক বাক্যে আমায় বলেছে আপনার শক্তির কথা। কিছু না জেনেই কি এসেছি আপনার কাছে! কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর ওপর কি আপনার দয়া হবে?"

তিনি মাথা নিচু করলেন আবার। আমার মাথার ভেতর, শুধু মাথার ভেতর কেন, সারা শরীরের রক্তের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে কয়েকটি কথা—'মনে থাকে যেন আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলে তুমি।'

চেয়ে আছি ওঁর বুকের দিকে, সেদিনের সেই বুকের চেয়ে অনেক উচু অনেক সুস্পষ্ট ঐ মেয়ের মায়ের বুক, দুধে-গরদের জামার নিচে আজও যেন ঈষৎ ওঠানামা করেছে। কিন্তু যদিই বা ফিরে যেতাম একদিন, তাতেই বা কি হোত! অন্য এক ভদ্রলোকের সাধ্বী স্ত্রী খুব ভক্তি ভরে একটি প্রণাম করতেন ঠিক এই আজকের মত। কিন্তু প্রণামে আমার আর লোভ নেই, ওতে অরুচি ধরে গেছে। আমার নিজের ডান হাতখানার দিকে চাইলাম। বড় বিতৃষ্ণা লাগল হাতখানার ওপর। মিছামিছি যত্ন ক'রে এতদিন বয়ে বেড়াচ্ছি এখানা।

"আমাকে কি দয়া করবেন না আপনি?"

আবার সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ হচ্ছে ভিখারিণীর গলার আওয়াজ, বহুকাল

আগে শোনা সেই জীবন্ত মেয়েটির গলার আওয়াজ এ নয়।

সামলে নিলাম নিজেকে! বললাম—"কি নাম তাঁর ?"

এবার অনেকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে থেকে—বললেন, "তাও জানি না।" স্পষ্ট শুনতে পেলাম ওঁর বুক খালি ক'রে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এবার জ্বালা আরম্ভ হোল পায়ের তলার সেই জায়গাটায়, অনেকদিন আগে জলন্ত কয়লাটা চেপে ধরেছিলাম যে জায়গাটা দিয়ে।

অর্থাৎ ? তাও জানি না—এই ছোট্ট কথাটির অর্থ কি ?

অতি সোজা অর্থ—পণ্যাঙ্গনা জানবে কি ক'রে কে ওই মেয়ের জন্মদাতা। অথচ ন্যাকাপনা করতে এসেছে – এখন সে কোথায় তাই আমায় গুণে ব'লে দিতে হবে। যেন তাঁর নাম ঠিকানা পেলে উনি তাঁর ঘরে গিয়ে উঠবেন ঐ মেয়ে নিয়ে। নচ্ছার মেয়েমানুষ, গরদের লালপাড় শাড়ী শাঁখা সিঁদুর পরে গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিয়ের সঙ্গে মিশে মা ঠাকরুণ হয়ে কীর্তন শুনিয়ে পাপীদের উদ্ধার করছেন। আজই ব্যবস্থা করছি যাতে ওঁকে কালই ঝাড়ু মেরে তাড়ায় সকলে চা-বাগান থেকে।

"আপনি ত সবই জানতে পারেন ইচ্ছে করলে, আপনি অন্তর্যামী—" দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে ওঁর।

নিজেকে শক্ত করে সামলে নিলাম, দেখি না কতদূর ছলনা জানে ও। বললাম—"জানতে ত অনেক কিছু পারছি, তারপর যে অনেকটা অন্ধকার দেখছি, কেন যে এ রকম হচ্ছে! মানে আপনার উনিশ কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ধরুন আপনার ঐ আঙুলটির মাথা কবে কাটা যায় তাও দেখছি, তখন আপনি একটুও কাঁদেন নি। আচ্ছা আপনার নাম আগে শেফালী ছিল না ?"

উনি নির্বাক, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে, শুধু ঘাড় নাড়লেন। চোখ বুজে বেশ রসিয়ে বলে গেলাম সেই পর্যন্ত। উনি ওঁর নিজের উদলা বুকের ওপর অন্য একজনের হাত চেপে ধরে বলছেন—"মনে

থাকে যেন আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলে তুমি।"

চেয়ে দেখি ওঁর দুই চোখ বোজা, আর দুই চোখ থেকে নেমেছে দুটি জলধারা, বুকের ওপরে দুধে গরদ ভিজছে।

কিন্তু অশ্রু ভেজাতে পারবে না আমাকে। নির্জলা-ভক্তি আর প্রণাম পেতে পেতে ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন আমি ষোল আনা একজন মার্কা-মারা বাবা।

বললাম—"তারপরই যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। আপনি যদি তারপর কিছু কিছু বলে যান তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে পারি ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায়।"

তিনি চোখ খুললেন। যেন একটি অতি গোপনীয় কথা বলছেন এইভাবে বললেন—"আচ্ছা, যদি তাঁর ফোটো দেখাই তা'হলে আপনি বলতে পারবেন কোথায় আছেন তিনি এখন ?"

আবার ফোটোও সঙ্গে রেখেছে, কিন্তু সে লোকটাই বা কেমন নির্বোধ, এই রূপজীবার কাছে নিজের ফোটো রেখে যায়। আছে, আছে বটে অনেক বড় ঘরের পাঁঠা, যারা বিশেষ ভঙ্গিমায় এই জাতের মেয়েদের সঙ্গে নিজের ফোটো তোলার বাহাদুরি করে—নিজের কুচরিত্রের চিরস্থায়ী দলিল রাখবার জন্যে।

দেখাই যাক্ না সে মহাপুরুষের মূর্তিখানি কেমন। বললাম—"সঙ্গে আছে না কি আপনার সেই ফোটো ? থাকে ত দেখান—দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

আরে, এ-ও যে পটপট করে জামার বোতাম খুলছে ! বার করলে লাল ভেলভেটে মোড়া কি একটা। অতি যত্নে ভেলভেট খুলে ফোটোখানি নিজের মাথায় ছুঁইয়ে আমার হাতে দিলে।

বোধহয় একটা অদ্ভুত আওয়াজও বেরিয়েছিল আমার গলা থেকে সেই মুহূর্তে। ফোটোখানা আমার হাত থেকে পড়ে গেল।

পড়ে গেল চিৎ হয়ে ফোটোখানা, আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপর চোখ তুলে চাইলাম সামনে বসা সেই রূপজীবার দিকে। সেও অবাক হয়ে দেখছে আমাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। ঘরের ভেতর কারও নিশ্বাস পড়বার শব্দও হচ্ছে না তখন। তিনিই প্রথম কথা বললেন—"কি হোল আপনার, এঁকে আপনি চেনেন না কি!"

জড়িয়ে জড়িয়ে আমার গলা দিয়ে বার হোল—"কৈ না, চিনি না ত। তবে ঠিক এই রকমের একটি চেহারাই ভেসে উঠেছিল কি না আমার মানস চক্ষে। কিন্তু ঐ জেলের পোষাকে নয়। আর বয়সও অত কম নয়।"

তিনি বললেন—"তাই ত হবে। যখন তিনি আমায় ছেড়ে চলে যান প্রথমবার তখন ত তিনি জেলের পোষাকে ছিলেন না আর তখন তাঁর বয়সও আরও বেশী হয়েছে। আমি শুধু ঐ চোখ দুটি দেখে ওঁকে চিনেছিলাম তখন।"

বহুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। নিশ্চয়ই সামনে বসে ভাবতে লাগল, আমি অন্তর্যামীগিরি ফলাবার চেষ্টায় চোখ বুজে বসে আছি। ভাবুক ওর যা খুশি, আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছি তখন—কি হোল আমার সেই চোখের! আজ তুমি চিনতে পারছ না কেন আমায়—চোখ দেখে? দাড়ি গোঁফের জঙ্গল গজিয়ে কি আমি আমার চোখ দুটিকেও খুইয়েছি! সেদিন ত চিনেছিলে তুমি, আজ কেন পারছ না? কেন পারছ না? কেন?

শেষ 'কেন'টা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে—"কেন কি! কি কেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

চোখ চাইলাম আবার। বললাম—"কেন যে তার পরের ব্যাপারগুলো জোড়া দিতে পারছি না তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, এবার দয়া করে বলুন ত আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হোল এঁর।"

তখন শুনলাম সেই দীর্ঘ কাহিনী। আমি চলে আসবার পর ওর বাবার সরকারী চাকরিটি গেল বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। ওকে নিতে হ'ল

লোকের বাড়ী গিয়ে মেয়েদের গান শেখাবার কাজ। তাতেও কিছু হ'ল না, হিমাদ্রিবাবু কোথাও আর চাকরি পেলেন না, শেষে এক রকম না খেতে পেয়ে অরুণ মারা গেল। হিমাদ্রিবাবু স্কুল মাষ্টারি নিয়ে চলে গেলেন রাজসাহী।

সেই রাজসাহীতে আর একবার দেখা হয় ফোটোর ঐ লোকটির সঙ্গে শেফালীর। বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে সে এসে আশ্রয় নেয় শেফালীর এক বন্ধুর বাড়ীতে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিন রাত তার সেবা করে শেফালী। প্রায় এক মাস ছিল, তারপর সুস্থ হয়ে সে পালায়। শেফালীকে ধ'রে সরকার রাজবন্দিনী ক'রে রাখে। সেই সময় ঐ মেয়ে জন্মায় দিনাজপুর জেলে। তিন বছরের মেয়ে নিয়ে শেফালী যখন ছাড়া পায় তখন বাপ মায়ের আর পাত্তাই পেলে না কোথাও। তখন পেটের দায়ে আর মেয়েকে বাঁচাবার দায়ে নিজের গলার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হ'ল।

"আমার আর কোনও বাসনা কামনা নেই, শুধু তার মেয়েকে তার হাতে সঁপে দিয়ে মরতে চাই। আমি যে ওই মেয়েকেও জবাব দিতে পারছি না ওর বাবা কে ?"

এবার আর আমার ছলনা বলে মনে হ'ল না ওর ঐ অশ্রুর প্লাবনকে। ডুবে মরার আগের মুহূর্তটিতে একগাছা খড়কুটো ভেসে যেতে দেখলেও আঁকুপাঁকু করে ধরতে যায় মানুষ। ঠিক তাই করতে গেলাম, অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরতে গেলাম এক গাছা খড়—"আচ্ছা—এমন কি হতে পারে না যে আপনি লোক ভুল করেছিলেন—"

কথাটা ভাল ক'রে শেষ করতে দিলে না আমাকে। আর্তনাদ ক'রে উঠল—"কি, কি বললেন ? লোক চিনতে ভুল হয়েছে আমার ? তার মানে এক মাস ধরে সেবা ক'রে যাকে আমি যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম তাকে চিনতে পারি নি আমি ?"

ওর দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল।

সেই চোখের দিকে চেয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। থাক, শান্তিতে

থাক ও—ওর বিশ্বাস বুকে নিয়ে চিরকাল। আমি তাতে বাগড়া দেবার কে?

আরও অনেকটা সময় কেটে গেল। চোখ বুজে বসে রইলাম, অন্তর্যামী যে আমি, আমি যে একজন মার্কা-মারা বাবা।

বললাম শেষে—"তিনি হয়ত এখন সন্ন্যাসী হয়ে ভগবানের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করেছেন।"

ধ্বক্ করে জলে উঠল শেফালীর চোখ—"কখ্খনো নয়, কিছুতেই তা হ'তে পারে না। এত হীন এত নীচ তিনি হ'তেই পারেন না। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে তাঁর বুকের ভেতর আগুন জলছে। কোনও ভগবান সে আগুন নেভাতে পারবে না যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে। বরং আমি বিশ্বাস করব ইনি মরে গেছেন পুলিশের গুলিতে, তবু সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন বিশ্বাস করতে পারব না।"

ছোঁ দিয়ে তুলে নিলে ফোটোখানা। নিয়ে সযত্নে ভেলভেট জড়িয়ে বুকে রেখে জামার বোতাম আঁটতে লাগল।

একান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, "হরশৃঙ্গার মানে জানেন?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অল্প হেসে বললাম—"হিন্দী ভাষায় শিউলি ফুলের নাম হরশৃঙ্গার। তা আপনি ত শেফালী, আপনার গর্ভে ঐ যে জন্মেছে—মনে করুন ওর বাবা স্বয়ং বিশ্বনাথ। মনে শান্তি পাবেন, আপনার হরশৃঙ্গার নামটিও সার্থক হবে।"

ও আবার চোখ বুজে ফেলেছে। যেন ধ্যানমগ্না। কিছুক্ষণ পরে ফিস ফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি মরবার আগেও কি একবার দেখা পাব না, সে যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে। একবার প্রতিজ্ঞা রেখেছে আর একবার কি রাখবে না?"

পেছনের দরজা খুলে ওর মেয়ে ঘরে ঢুকল।

"মা, সভায় সকলে বসে আছেন, আজ গাইবে না?"

আঁচলে চোখ মুছে আমায় প্রণাম ক'রে মেয়ের হাত ধরে শেফালী ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ যোগীনকে ডেকে বললাম—"লরী ঠিক করে দাও যোগীন। মা বেটী আমায় স্মরণ করেছে, আসন ছেড়ে থাকতে পারব না আজ রাত্রে।"

তটস্থ হয়ে ওরা লরি ঠিক করে দিলে। সোজা স্টেশন। তারপর আবার পথ—

উপন্যাসের না-পড়া পাতা কখানা যে শেষ করতেই হবে আমাকে।

৩

পোসরা তারিখে হাতে পেতাম গুণে গুণে দশটি টাকা। ওরই মধ্যে সমস্ত। মা কালীর ভোগ নৈবেদ্য ফুল বেলপাতা সন্ধ্যারতির ঘি থেকে আরম্ভ করে নিজের আহার বিহার পর্যন্ত পুরাপুরি ত্রিশটি দিন চলা চাই। তার ওপর বিনা ভাড়ায় একখানি থাকবার ঘর। সিঁড়ির নিচের ঘর। মাথায় ঠেকে এই মাপের একটি দরজা। এক বিন্দু আলো যাবার অন্য কোনও পথ নেই ঘরে। আগে বোধ হয় সেই ঘরে কেরোসিন তেল আর তেলের আলো রাখা হোত। বড় বড় বাড়ীতে কেরোসিনের বাতিগুলো সাজাবার জন্যে ঐ রকমের আলাদা একটি ঘর থাকে। আমার ঘরখানাও বোধ হয় সেই কাজেই ব্যবহার হোত। যতদিন সে ঘরে আমি ছিলাম সদাসর্বদা কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছি। যেন কেরোসিনের মধ্যে ডুবে আছি। একটা মাটির কলসীতে খাবার জল রাখতাম। সেই জল থেকেও কেরোসিনের গন্ধ বেরোত। চাকরী পাবার পর সেই ঘরখানিতেই আমাকে থাকতে দেওয়া হোল। কারণ অতবড় বাড়ীতে এই ঘরখানিতেই কোনও ভাড়াতে জুটত না।

চাকরি পেয়ে বর্তে গেলাম। মা কালীর নিত্য সেবা-পূজার কাজ। এটি হচ্ছে একটি মঠ। মহাতান্ত্রিক পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী তারানন্দ পরমহংস আগমবাগীশ মঠ আর কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিপুল ধন-সম্পত্তি

আর বিরাট বাড়ীখানি রেখে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর দৌহিত্র শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ শর্মা এম-এ ডি-ফিল এখন এই মঠ আর কালীর মালিক। ভদ্রলোক মনুষ্যত্বের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ডি-ফিল পেয়েছেন। সমস্ত বাড়ীটার একতলা দোতলা তিনতলার চব্বিশখানা ঘরে চব্বিশটি ভাড়াটে। ভাড়া আদায় হ'ত মাসে একশ কুড়ি টাকা। শুধু মা কালীর ঘরখানি, তার সামনের দালানটি আর সিঁড়ির নিচের ঘরখানি ভাড়া দেওয়া হয়নি। এমন কি কালী-ঘরের সামনের উঠানেও ভাড়াটে ছিল। এক কবিরাজ সেই উঠানে মস্ত মস্ত উনুন গেঁথে তার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াই বসিয়ে তেল জ্বাল দিত।

শঙ্করীপ্রসাদ থাকতেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিত্যালয়ের বাঙলোতে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিলেত-ফেরত। বিশ্ববিত্যালয়ে মোটা মাহিনার চাকরী করতেন তিনি। দোসরা তারিখে যেতে হ'ত তাঁর বাঙলোয় দশটি টাকা আর একটি শিশিতে এক ছটাক দেশী মদ আনবার জন্যে। এক ফোঁটা মদ জলে ফেলে সেই জলে মা কালীর ঘর ধোয়া থেকে ভোগ পূজা সমস্ত সম্পন্ন করা চাই। কারণ-বারি ছাড়া মায়ের সেবা নিষিদ্ধ। এই কালীর পূজায় একমাত্র অভিষিক্ত কৌলের অধিকার। চাকরি পাবার জন্যে আমাকেও অভিষিক্ত হ'তে হয়।

যিনি আমাকে কাজটি জুটিয়ে দেন, তিনিই সংক্ষিপ্ত পূজা-পদ্ধতি শিখিয়ে অভিষেক ক'রে কৌলের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দিয়ে তবে শঙ্করীপ্রসাদের সামনে নিয়ে দাঁড় করান আমাকে। তখন ঐ জাতের একটা কাজকর্ম না জুটলে আমার বাঁচবার কোনও উপায় ছিল না।

বাঙলাদেশে মাথা বাঁচাবার স্থান নেই। ধরা পড়লে হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নয়ত বা একেবারে ঝুলিয়েই ছাড়বে। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম রক্ত-বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরে। জ্বরে আর রক্ত-আমাশায় ধরল বাগে পেয়ে। ওখানে এক

কুলীন জাতের জ্বর আছে। নামটিও ভাল। ব্লাক ওয়াটার ফিভার। একবার ধরলে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় যাকে ধরে তাকে। সেই জ্বরের ভয়ে ওখান থেকেও সরতে হ'ল। তাড়া খেতে খেতে একদিন, মাত্র ঐ জ্বর আর রক্ত-আমাশা সম্বল ক'রে, কাশী গিয়ে পৌছলাম। বাঙালী টোলার এক বাড়ীর সামনের রোয়াকের ওপর থেকে এক ব্রাহ্মণ আমাকে তুলে নিয়ে যান নিজের বাড়ীতে। জ্বর গেলে তাঁকেই ধরে বসলাম কোথাও যে-কোন রকমের একটি কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। যেখানে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে অন্ততঃ বছর দুই সংস্কৃত ভাষাটা রপ্ত করতে পারি। আমার আশ্রয়-দাতার তিনটি গুণ ছিল একসঙ্গে। কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তিনি, সর্বজন-পূজ্য সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—আর একবিন্দুও বিদ্যার অহংকার ছিল না তাঁর। কেউ পড়াশুনা করতে চাইছে অথচ সুযোগ পাচ্ছে না, এ শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যে ক'রে হোক একটা সুযোগ করে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিলাম আমি। ফলে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে রাজযোটক ঘটে গেল। চুল দাড়ি অনেকদিন থেকে স্বাধীনতা পেয়ে বেড়েই ছিল। রক্তবস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা ত ছিলই। এবার কালী বাড়ীর চাকরি পেয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে খট খট ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মহাতান্ত্রিক সাধক মানুষ হয়ে গেলাম দুদিনেই।

তবু প্রথম প্রথম সেই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুতে সাহস হ'ত না। ভোর-বেলা গঙ্গাস্নান ক'রে এসে একটা ছোট পিতলের হাঁড়িতে চাল, ডাল, আলু, কচু, যা যখন জুটত একসঙ্গে চড়িয়ে দিতাম। সেটা সিদ্ধ হ'লে নামিয়ে নিয়ে মা কালীর ঘরে গিয়ে ঢুকতাম। এক পয়সার ফুল-বেলপাতা ফুলওয়ালা শালপাতায় জড়িয়ে জানালা গলিয়ে ঠাকুর ঘরে কখন ফেলে রেখে যেত। বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে মা কালীর সেবা পূজা চলত। শেষে ঘণ্টা কাঁসরে ঘা কতক বাড়ি দিয়ে পূজা সমাপ্ত হ'ল ঘোষণা ক'রে পেতলের

হাঁড়িটা হাতে ক'রে নিজের ঘ'রে ঢুকতাম। তারপর সেই পিণ্ডি প্রসাদ গিলে সারাদিন দরজা বন্ধ ক'রে সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকতাম। সন্ধ্যায় আর একবার ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঘণ্টা নেড়ে আরতি ক'রে আসা। তাহ'লেই চাকরীর লেঠা চুকে যেত। কেউই আমার নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজনের ব্যাঘাত করতে সাহস করত না।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলল না। লোকে সমীহ ক'রে কথাবার্তা বলতে সুরু করলে আমার সম্বন্ধে। কারও সঙ্গে মেশে না, কথা কয় না, সারাদিন-রাত দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকার ঘরে কি করে? সহজ লোক নয় মানুষটি। অসীম-ক্ষমতাসম্পন্ন লোক যে আমি, আর সহজে কাউকে ধরা-ছোঁয়া দেব না কিছুতেই —এ কথা চুপি চুপি এ-মুখ থেকে ও-কানে আর ও-কান থেকে সে-মুখে রটতে লাগলো।

ফলও ফলল। স্বয়ং ডি-ফিল সাহেব একদিন সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন তাঁর কালী-বাড়ীতে। উদ্দেশ্য—তাঁর দশ টাকা মাইনের পূজারী বামুনকে একটু বাজিয়ে দেখা। অনেকের মুখ থেকে অনেক রকমের কথা শুনে তাঁর খেয়াল হয়েছে লোকটি আসল না মেকী একটু যাচাই করবার।

একথা অবশ্য মানতেই হবে যে, তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে কে কেমন দরের 'চিজ' তা এক আঁচড়ে বোঝবার শক্তি তাঁর মত লোকের থাকা উচিত। তারানন্দ পরমহংসের সাক্ষাৎ মেয়ের ছেলে তিনি। কাশীর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তারানন্দকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন—বা জানতেন, তাঁরা এখনও স্বামীজীর নাম করলে কেঁপে ওঠেন। শুধু তাঁরা কেন—এত সব অদ্ভুত কাহিনী চালু আছে তারানন্দ আর তাঁর এই মঠবাড়ী সম্বন্ধে—যে এখনও লোকে এই কালী আর কালী-বাড়ীর নামে কপালে জোড়হাত ঠেকায়। সাক্ষাৎ ভৈরব ছিলেন তারানন্দ। দুধকে মদ আর মদকে দুধ বানানো কর্মটি ছিল তাঁর কাছে ছেলে-খেলা। গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, কতদিনের মড়া কে জানে, গা থেকে মাংস খসে খসে পড়ছে। তাই তুলে নিয়ে এসে মা কালীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ

করেছেন। একপক্ষ কাল পরে দরজা খুলে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছেন। এই ধরনের নাকি সমস্ত অমানুষিক শক্তি ছিল তাঁর। কালে ভদ্রে যখন তিনি বার হতেন তখন মঠ থেকে দামামা বেজে উঠত। তা শুনে রাস্তার দুপাশের বাড়ীর জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে যেত। লোকে বিশ্বাস করত তাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিললে আর রক্ষে নেই। ঘরের বউ-ঝি যাকে তাঁর ইচ্ছা হবে তাকেই টেনে নিয়ে যাবেন মঠের মধ্যে। বহু নরবলি নাকি হ'য়ে গেছে তাঁর সময় কালীর সামনে।

বড় বড় রাজা মহারাজা ছিল তাঁর শিষ্য ভক্ত। আর ছিল তাঁর তিনটি শক্তি। প্রথমা তাঁর বিবাহিতা পত্নী, দ্বিতীয়া এক অন্ধ্রদেশীয়া কন্যা—তাঁকে তিনি গ্রহণ করেন যখন পরিব্রাজক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতে তীর্থ দর্শন ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, শেষ বয়সে তৃতীয়া শক্তি পান গুরু-দক্ষিণা হিসেবে তাঁরই এক শিষ্যের মেয়েকে।

ঐ তেলেঙ্গী শক্তির গর্ভে জন্মায় এক মেয়ে। মেয়ে ত নয় যেন অগ্নিশিখা। আট বছর বয়সেই সে মেয়ের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যেত। সেই জন্যেই বোধ হয় মেয়ের নাম রেখেছিলেন স্বামীজী—স্বাহা। বয়স যখন তার ঠিক ন'বছর তখন কোথা থেকে এক অতি সুদর্শন ষোল বছরের ব্রাহ্মণ সন্তানকে যোগাড় করে আনলেন স্বামীজী। এনে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। শৈব বিবাহ হ'ল শাস্ত্র মতে। গৌরীদানের ফল লাভ করলেন তারানন্দ। বিয়ের পরে মেয়ে জামাই কাছে রেখে দিলেন। জামাইকে দীক্ষা দিলেন, শাক্তাভিষেক থেকে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করলেন। মেয়ে জামাইকে মঠ আর কালীর ভবিষ্যৎ সেবায়েত ক'রে রেখে যাবেন এই ছিল তাঁর বাসনা। সে জন্য উপযুক্ত বিদ্যেও তিনি দিচ্ছিলেন জামাইকে। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। তারানন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। শোনা যায় তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

তার অল্প কিছুদিন পরে তাঁর জামাইও রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হলেন।

বোধ হয় উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবেশ করবার জন্তে চলে গেলেন হিমালয়ে। মেয়ের বয়স তখন মাত্র উনিশ-কুড়ি। অতুলনীয়া রূপ লাবণ্যবতী সেই মেয়ে সেই বয়সেই যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে ভৈরবী পদে অভিষিক্তা হলেন। হয়ে কায়মনোবাক্যে সাধন-ভজনের স্রোতে গা ভাসালেন। পা পর্যন্ত এলোচুলে আর রক্তবর্ণ মহামূল্য বেনারসীতে তাঁকে এমন মানান মানালো যে সাক্ষাৎ শিবও দেখলে হয়ত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তেন।

স্বাহা ভৈরবীর হাতে এল প্রচুর সোনাদানা, হীরে জহরত। মঠের এক গুপ্ত ঘরে ছিল কয়েক ঘড়া গিনি আর মোহর। দেহ-ত্যাগের আগে মেয়েকেই সে সন্ধান দিয়ে যান তারানন্দ। সুতরাং স্বাহা ভৈরবীর আমলই হচ্ছে মঠের সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ধন-দৌলতের সঙ্গে একপাল শিষ্য সেবক সাধক-সাধিকা এসে জুটল ফাউ হিসাবে স্বাহা ভৈরবীর পায়ের তলায়। তখন আরম্ভ হ'ল স্বর্ণযুগ। তান্ত্রিক সাধন অনুষ্ঠানাদির বিপুল সমারোহ আরম্ভ হ'ল। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ইত্যাদির ঢেউ বয়ে যেতে লাগল মঠে। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর শোনা যেতে লাগল কেউ বলছে 'জুহোমি'—তৎক্ষণাৎ কেউ উত্তর দিচ্ছে 'জুষখ পরমানন্দে'। এক সংগে বহু-বিচিত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে লাগল যখন তখন—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা॥"

তখন এই বাড়ীর বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে কান পাতলে শোনা যেত আরও কত বিচিত্র রহস্যময় শব্দ। কত হাসি আর তার সঙ্গে মর্মন্তুদ চাপা আর্তনাদ। আরও কত বিচিত্র সব-মন্ত্র। যেমন—

"ওঁ ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহং॥"

ভৈরবী স্বাহা দেবীর আমলে এই মঠ থেকে জলন্ত অঙ্গার-তুল্য এক দল সাধক সাধিকা বার হ'ল—যারা প্রকাশ্যে তন্ত্রের মহিমা চারিদিকে প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল। কিছুদিন পরেই শঙ্করীপ্রসাদের জন্ম হয়। অতি অল্প

দিনই মায়ের বুকের দুধ পায় সে। ছেলে জন্মাবার পর আরও প্রচণ্ডভাবে স্বাহা ভৈরবী সাধন-মার্গে প্রবেশ করলেন। একটি উল্লেখযোগ্য ভাল কাজও তিনি করেছিলেন সেই সময়। প্রচুর টাকা আর তাঁর শিশু সন্তানটি তিনি দিয়ে এসেছিলেন দেরাদুনে খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে। দিয়ে এসে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে ডুবে গেলেন আধ্যাত্মিক জগতে।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত দেহ রাখতে পেরেছিলেন তিনি। বড় বড় কয়েকটা মামলা মকদ্দমা করতে হয় তাঁকে তারানন্দের অন্য আর একদল শিষ্যদের সঙ্গে। শেষে যখন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন তিনি জীবনের মাত্র বত্রিশটি বছর পার হয়ে—তখন সোনা রূপো হীরে জহরতের এতটুকুও আর পাওয়া গেল না মঠে। রইল শুধু তাঁকে আর মঠকে ঘিরে সব ভয়াবহ বদনাম। এতবড় তিনমহল বাড়ীখানার ঘরে ঘরে তালা ঝুলতে লাগল। কালীর সেবা বন্ধ হ'ল। তখন প্রাণহীন বাড়ীখানার পাশ দিয়ে যেতে আসতে লোকের বুক কেঁপে উঠত। রাশি রাশি আজগুবি গল্প চালু হয়ে গেল মঠ আর কালী সম্বন্ধে। বন্ধ বাড়ীখানার ভেতর থেকে নাকি দিনের বেলাতেও অদ্ভুত সব আওয়াজ পাওয়া যেত। কখনও পাওয়া যেত হোমের গন্ধ, কখনও শোনা যেত বিচিত্র সুরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ। কখনও বা বুকফাটা হাহাকার আর আকুল কান্না। যেন অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে কোন এক হতভাগিনী মাথা খুঁড়ছে মঠ বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে। লোকে বলে কুলবধূদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে এনে মঠে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু তারা আর কখনও এখান থেকে বার হ'তে পারেনি। আরও কত কি লোকে বলে। এমন কথাও অনেকে বলে যে, যাকেই এ কালীর সেবায় লাগানো হয় তারই নাকি মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। একবার বলতে আরম্ভ করলে লোকে কীই বা না বলতে পারে।

স্বাহা ভৈরবীর মহাপ্রয়াণের ঠিক সতেরো বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এলেন শঙ্করীপ্রসাদ। এসে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে মঠ আর কালী অধিকার করলেন। ঘরে ঘরে ভাড়াটে বসালেন। পুনরায় সেবা পূজার ব্যবস্থা

করলেন মা কালীর। বরাদ্দ করলেন মাসে দশটি টাকা আর এক ছটাক মদ। কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার ভয়ে সহজে কোনও ব্রাহ্মণ মেলে না কালীর নিত্যপূজার জন্যে। এমনও হতে পারে যে মাত্র দশটাকার মধ্যে ত্রিশ দিন পূজার খরচা আর পারিশ্রমিক পোষায় না ব'লেই সহজে কেউ রাজী হয় না এ কাজ নিতে। এটা আমারই বরাত জোর বলতে হবে। তার ওপর তিনমাস কালীর পূজা চালাবার পরেও যখন মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না—তখন সহজ লোক যে আমি নই, সেটাও ত প্রমাণ হয়ে গেল। তাই স্বয়ং মালিক আর মালিক-পত্নী এসে উপস্থিত।

জুতা পায়ে খট খট মস মস আওয়াজ তুলে তাঁরা একতলা দোতলা তেতলা ঘুরে সব দেখে শুনে এলেন! ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষ ক'রে সিঁড়ির তলায় আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে ওঁদের আলাপ আলোচনা শুনতে পেলাম। ভাড়াটেদের মধ্যে মিনুর মা কইয়ে-বলিয়ে মানুষ। ভদ্র-মহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কানপুরে তাঁর ভাই-ভাইপোরা ভাল চাকরী করেন। অতি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কাশীবাস করছেন মিনুর মা। মাকে নিয়ে কেদার বদরী পর্যন্ত ক'রে এসেছেন। শক্ত পাকানো শরীর। বার-ব্রত-উপবাস আর নিত্য ছ'ঘণ্টা জপ—তার ওপর চলতে ফিরতে অশক্তা জননীকে শিশুর মত ক'রে নাওয়ানো, খাওয়ানো এই সমস্ত করতে করতে তাঁর চক্ষু দুটিতে স্নিগ্ধ প্রশান্ত জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পরে লক্ষ্য করেছিলাম—তাঁর সুন্দর ইংরেজি হাতের লেখা। ইংরেজীতে নাম সই ক'রে তিনি মণি-অর্ডার নিতেন।

তিনি সঙ্গে ছিলেন বাড়ীওয়ালাদের। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওঁরা চাপা গলায় আলাপ করতে লাগলেন।

"কি করেন সারাদিন ঘরের মধ্যে ?"

"ধ্যান জপ করেন নিশ্চয়।"

"কখনও কথাবার্তা বলেন না আপনাদের সঙ্গে ?"

"আমাদের দিকে কোনও দিন একবার চেয়েও দেখেননি !"

"কেউ কখনও দেখা করতে আসে না ওঁর সঙ্গে ?"

"কাকেও দেখিনি ত কোনও দিন আসতে।"

"চিঠিপত্র কিংবা টাকা-কড়ি কখনও আসে না ওঁর নামে ?"

"আজ পর্যন্ত একখানি চিঠিও আসে নি।"

"কোনও অলৌকিক কিছু কখনও টের পেয়েছেন আপনারা !

"উনি যখন মায়ের ঘরে থাকেন তখন কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলেন, দরজা ত বন্ধ থাকে। কাজেই ঘরের ভিতর কি যে করেন তা দেখতে পাই না ত। শুধু বাইরে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যায়।"

মেয়েলী গলায় ইংরেজীতে কে বললেন, "দরকার নেই আর ওঁকে ডেকে। হয়ত বিরক্ত হবেন। চল আমরা পালাই এখন।"

"একবার ডেকে দেখলে হয় না ?"

মিনুর মা বললেন—"কি দরকার এখন বিরক্ত ক'রে। মাসকাবারে যেদিন টাকা আনতে যাবেন সেইদিনই আলাপ করবেন।"

"সেই ভাল। চল আমরা আজ পালাই এখন।"

ওঁরা চলে গেলেন।

পরদিন পূজা সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরুচ্ছি। একটা ঘটি হাতে ক'রে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিনুর মা।

"বাড়ীওয়ালারা কাল এসেছিলেন। আজ থেকে মায়ের ভোগে একসের ক'রে দুধের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। আপনি যখন মায়ের ঘরে ছিলেন গয়লা তখন দুধ দিয়ে গেছে।"

চাকরী আরও বাড়ল ! দুধ জ্বাল দাও·তারপর আবার বাসনটা মাজো ধোও। দশটাকায় আর কত হ'তে পারে ! ভুরু কুঁচকে ঘটিটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনুর মা মুস্কিল আসান করলেন।

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা'হলে দুধ জ্বাল দিয়ে পাথরের বাটিতে করে মায়ের ঘরে রেখে দোব। সন্ধ্যায় মায়ের ভোগ দেবেন।"

বেঁচে গেলাম। "তাই করবেন" ব'লে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

সন্ধ্যার পর দুধের বাটি হাতে নিয়ে মিনুর মার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

"প্রসাদ নিন।"

"না না না। আমরা প্রসাদ নোব কেন! রাতে ওটুকু আপনি সেবা করবেন বাবা।" ব্যাকুল মিনতি তাঁর গলায়।

"তবে এক কাজ করুন। যে অন্ধ বুড়িটা বাইরের দালানে পড়ে থাকে তাকে দিয়ে দিন।" বাটিটা ওঁদের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম।

মাসকাবারে টাকা আনতে গেছি। টাকা ক-টা আর মদটুকু চাকরের হাতেই প্রতিবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসে। এবার শঙ্করীপ্রসাদ সাহেব নিজে বেরিয়ে এলেন। সম্বর্ধনা ক'রে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রয়িং রুমের গদি-মোড়া চেয়ারে। স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। আরম্ভ হ'ল আলাপ পরিচয়।

"আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত?"

"কষ্ট আর কি, বেশ আরামেই ত আছি।" উত্তর না দিয়ে উপায় নেই।

"দোতলার দুটো ঘর খালি আছে। ওঘর দুটো আর ভাড়া দোব না আমি।" ব'লে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছু শোনবার জন্যে আমার মুখ থেকে। কিন্তু আমি কি বলব! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

"ওপরের ঘরে থাকতে আপনার অসুবিধে হবে?" জিজ্ঞাসা করলেন স্বামী, স্ত্রী তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন: "বাসন মাজা, উনুন ধরানো, ঘর দরজা ধোয়া মোছার জন্যে একজন লোক দেখতে আমি ভাড়াটেদের বলে এসেছি।"

"ওপরের ঘর দু'খানার চুনকাম হয়ে গেলে আপনি ওপরেই থাকবেন।"

স্ত্রী আরও একটু যুক্ত করলেন—"এ মাস থেকে আমরা দুজনে পূজো দিচ্ছি" বলে দশটাকার দু'খানা নোট রাখলেন আমার সামনে।

তথাস্তু, আমার আপত্তি করবার কি আছে। নোট দুখানা তুলে নিয়ে চলে এলাম। মায়ের পূজার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এলাম ওঁদেরই গাড়ীতে চেপে। মনিব ঠাকরুণ এক ঝুড়ি ফল দিয়ে দিলেন সঙ্গে। রাতারাতি কপাল ফিরে গেল। একেই বলে মায়া দয়া!

ঝঞ্ঝাট বেড়েই চলল দিন দিন।

মায়ের মন্দিরের ভেতর ইলেকট্রিক আলো হ'ল। প্রতি অমাবস্যার রাতে বিশেষ পূজা-ভোগ-হোম। শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবরা প্রসাদ পেতে লাগলেন। বাড়ীর ভাড়াটেরা সবাই বিধবা কাশীবাসিনী। সকলেই ভদ্র সংসার থেকে এসেছেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাজ-কর্ম সমস্ত বাঁধা-ধরা। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে জপে বসেন। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত জপ চলে। জপ থেকে উঠে কেদার ঘাটে গিয়ে গঙ্গা স্নান ক'রে কেদারনাথের পূজা সেরে বাড়ী ফিরতে সেই একটা দেড়টা। তখন উনুনে আগুন দিয়ে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়ায় ঘণ্টা তিনেক সময় ব্যয় হয়। এই সময়ই সমস্ত বাড়ীটা জেগে ওঠে। বেলা চারটের মধ্যে ঘর দরজা ধুয়ে মুছে, বাসন কোসন মেজে পরের দিনের জন্যে উনুন সাজিয়ে রেখে কোথাও পাঠ বা কীর্তন শুনতে যান। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন দু'চার পয়সার বাজার হাট ক'রে নিয়ে। সেই সময় আর এক বার বাড়ীতে সকলের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপরই আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়ী ঘুমিয়ে পড়ে। ওঁরা নিজের নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আবার জপে বসেন!

এতদিন শান্তিতেই সমস্ত চলছিল—ঘড়ি-ধরা সময়ে। মায়ের সেবা পূজার ধুমধাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁদেরও কাজকর্ম বেড়ে গেল। সকলকেই এটা ওটা ক'রে দিতে হয় প্রতিদিন। মা কালীকে নিয়ে মেতে উঠলেন সকলে।

প্রাণহীন বাড়ীটায় আবার প্রাণ ফিরে এল। কাঁসর ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে আবার গুরু গুরু শব্দে বেজে উঠল ঠাকুর দালানের কোণে বসানো প্রকাণ্ড তামার খোলের উপর নতুন চামড়া লাগানো মঠের বহু পুরাতন দামামাটা। গঙ্গা স্নান ক'রে যাবার সময় শত শত স্ত্রী-পুরুষ মায়ের পায়ে ফুল জল দিতে লাগলেন রোজ সকালে!

•

তবু লোকের মন থেকে ভয় ঘুচল না। সে ভয়টা আরো কালো হয়ে উঠল আমাকে ঘিরেই। কই—রক্ত ত উঠল না এর মুখ দিয়ে! সুতরাং এ লোক সহজ লোক নয়। মা কালীর ভক্ত যত না বাড়ুক আমার ভক্ত বেড়ে চলল দিন দিন। রোজই নতুন নতুন মুখ। সকলেরই গুহ্য কথা আছে। সময় ক'রে দেওয়া হ'ল—বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। তখন সকলে সাক্ষাৎ পাবে আমার। সবার মুস্কিল শুনব তখন।

দু'ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে শুনতে হ'ত সকলের গুহ্য কথা। বলতে হ'ত মাত্র একটি উত্তর। "ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। মা যা করেন।" তাতেই কাজ হ'ত। মায়ের ইচ্ছেটা যাতে তাঁদের অনুকূলে মোড় ফেরে তার দরুণ বেশ মোটা-হাতে প্রণামী দিয়ে বিদেয় নিতেন সকলে।

শঙ্করীপ্রসাদরা মহা সন্তুষ্ট; তাঁদের কালী-বাড়ীর উন্নতি হচ্ছে। এমন কী বাড়ী ভাড়া আদায় করাও ওঁরা ছেড়ে দিলেন। সে কাজটিও আমার ঘাড়ে পড়ল। ওটা আদায় হ'লে ব্যয় করাও আমার দায়। ওঁরা শুধু অমাবস্যা পূজার একথাল প্রসাদ পেয়েই খুশী। মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করতেন যে মায়ের পূজায় মদের বরাদ্দটা না বেড়ে যায়। ঐতেই একবার ঘুচে গিয়েছিল কি না সেবা-পূজা সমস্ত। সে ভয়টা আমারও ছিল। কাজেই তর্পণ করতে বা করাতে যাঁরা এলেন তাঁরা মনঃপীড়া পেয়ে ফিরলেন।

এই রকমে যখন সব দিক দিয়ে জল-জলে অবস্থা কালীবাড়ীর—তখন একদিন বিকেলবেলা মোটা একগাছি জুঁই ফুলের গোড়ে হাতে নিয়ে আমাকে,

দর্শন করতে এল একটি ছোক্‌রা। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে উঠে সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দেবে।

"আরে, এ আবার কি আপদ? ফুলের মালা আমাকে কেন?"

কোনও ওজর আপত্তি শুনবে না সে। আমাকে পরাবে বলে কিনে এনেছে মালা, সুতরাং পরাবেই আমার গলায়। সামনে যে কজন বসে ছিলেন তাঁরাও ওর হয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। হৈ-চৈ গোলমাল আরম্ভ হ'ল। বিরক্ত হয়ে বললাম, "দাও পরিয়ে।" গলা বাড়িয়ে দিলাম। মালা পরিয়ে দিয়ে আবার প্রণাম ক'রে যখন সে উঠে বসল সামনে, তখন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম ছোক্‌রার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম।

এমন অপরূপ রূপ সত্যই কোনও দিন চোখে পড়েনি। ছিপছিপে গড়নের—কালোবরণ একখানি দেহ। এমনই মানানসই তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যে মনে হয়, কোনও ওস্তাদ কারিগর মাপজোপ ক'রে হাতে গড়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি। লম্বা চুল দু'ভাগ হয়ে গলার দুধার দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। চুলের শেষটুকু আবার বেশ কোঁকড়ানো। কপালের সঙ্গে সমান টিকোলো নাক। মুখের দুধারে প্রায় কানের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে টানা টানা দুই চক্ষু। কেমন যেন ভাববিহ্বল সেই চোখের চাহনি। আরও আছে অনেক কিছু সেই মুখে। ছোট্ট কপালখানিতে আর নাকের ওপর যত্ন ক'রে তিলক আঁকা। কালো রঙএর ওপর সাদা তিলক। এমন খুলেছে যেন তিলক না থাকাটাই অস্বাভাবিক হ'ত। দুই কানের পাতায় সাদা পাথর বসানো দুটি সোনার ফুল—সে দুটি দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। লম্বা গলায় জড়ানো তিন-ফের তুলসীর মালা। একখানি সিল্কের চাদরে বিশেষ ছাঁদে জড়ানো তার দেহখানি। চাদরের নিচে আরও কিছু আছে কি না দেখতে পেলাম না। সবকিছুর ওপর প্রথমেই নজরে পড়ে তার ঠোঁটের একফালি অদ্ভুত ধরণের হাসি। যাদের জীবনে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নেই—ঐ জাতের হাসি তাদের ঠোঁটেই লেগে থাকে।

"আপনার কাছে এলাম, মাকে একপালা গান শোনাব ব'লে।" এমন ভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে যেন সেই অপূর্ব চক্ষু-দুটির চাউনি আমার দেহের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

তখন পরিচয় পেলাম তার। সকলেই চেনে তাকে। প্রায় একমাস এসেছে কাশীতে দলবল নিয়ে। নাম মনোহর দাস। লীলা-কীর্তন গায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে, কুচবিহারের কালী বাড়ীতে, ছাতুবাবু লাটুবাবুর ঠাকুর-বাড়ীতে—কয়েক পালা গান ইতিমধ্যেই গাওয়া হয়ে গেছে। তার গান শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেছে চারিদিকে। এমন গানই সে গায়, যা নাকি কাকপক্ষী 'থির' হ'য়ে শোনে। নিজে সেধে আমাদের কালী-বাড়ীতে গান শোনাতে এসেছে মনোহর দাস—এটা একেবারে আশাতীত কাণ্ড। সে সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের—আর ভাড়াটেদের মুখ থেকে মনোহর সম্বন্ধে যা শুনতে পেলাম, যে রকমের খাতির সম্মান সকলে করলে তাকে, তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে মনোহর অতটুকু মানুষ হ'লে হবে কি—তার খ্যাতি অনেক বড়।

বললাম, "আমি টাকা পয়সা দিতে পারব না বাবাজী, সে সামর্থ্য নেই আমার।" মনোহর আরও বিনীত ভাবে উত্তর দিলে, "সে জন্যে অন্যস্থান আছে। আপনার কাছে আমিই ত সেধে এসেছি।"

সুতরাং আমার আর আপত্তি করবার কি আছে।

কবিরাজ মশাই স্বেচ্ছায় উনুন ভেঙে তেলের কড়াই সরিয়ে মায়ের সামনের উঠান সাফ ক'রে দিলেন পরদিন সকাল বেলাতেই। বিকেলে মনোহরের গানের আসর। লোকজন জমতে লাগল বেলা একটা থেকে। ছোট্ট উঠানে শ'তিন-চার লোক ধরে বড় জোর। লোক এল তার ঢের বেশী। মেয়েদের ভিড়ই অত্যধিক।

আসরের মাঝখানে বসল পাঁচজন—একটি হারমোনিয়াম, দুখানি খোল, একটি বেহালা আর একজোড়া খত্তাল নিয়ে। তাদের মাঝখানে সামান্য একটু জায়গায় দাঁড়াল মনোহর। গলায় প্রকাণ্ড জুঁইফুলের মালা। গায়ে চাঁপা

বুকএর সিল্কের নামাবলী। এক হাতে দুলছে রূপো বাঁধানো মস্ত বড় সাদা চামর। মনোহরের দিক থেকে তখন চোখ ফেরায় কার সাধ্য।

পালার নাম কলঙ্কভঞ্জন।

শতছিদ্র একটি কলসী। যমুনা থেকে জল আনতে হবে ঐ কলসীতে ক'রে। মনে প্রাণে যে সতী—সেই পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে।

বুকে তুলে নিলেন সেই কলসী রাধারাণী। তাঁর ভেতর-বার শ্যামকলঙ্কে কালো হয়ে গেছে। সেই কলঙ্কে কলসীর শতছিদ্র লেপে যাক। শ্যামকলঙ্ক কি কিছুতে ভঞ্জন হবে রাই কলঙ্কিনীর? বললেন তিনি অন্তর দিয়ে অন্তরের অন্তরতমকে "আমি শ্যামকলঙ্কে গরবিনী, দেখি কেমন করে এই ছেঁদা কলসী আমার সে গরম ভাঙ্গে। তা যদি হয় তবে তোমার কালা মুখ তুমি দেখাবে কেমন ক'রে ত্রিজগতে? তোমার চেয়ে আরও বড় কিছু আছে না কি, আরও বড় লজ্জা, আরও নিবিড় কোন কালো! ঐ কালোরূপ দেখতে দেখতে আমার চোখের তারা দুটি কালো হয়ে গেছে। ঐ কালোরূপের আগুনে পুড়ে পুড়ে আমি যে আঙার হয়ে গেছি। আঙারের কালিমা কোনও কিছুতে ঘোচে না-কি কখনও! শতবার ধুলেও কয়লা কয়লাই থেকে যায়। কি করবে এই শত-ছিদ্র কলসী আমার?" ব'লে তিনি জল আনতে চলে গেলেন। যমুনার কালো জল, জল ত নয়। এও যে সেই শ্যামরূপ। শ্যামরূপে ছেঁদা কলসীর ছেঁদা গেল লেপে। জল ত নয়, এক কলসী শ্যামরূপ ভরে নিয়ে ফিরে এলেন রাই। তাঁর শ্যাম-কলঙ্কের ভঞ্জন হ'ল না!

মনোহর গাইছে। গাইছে নাম-মাত্রই। করছে যা তার নাম ব্যাখ্যান। হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে চোখের তারা দুটিতে কখনো আলো কখনো আঁধার ফুটিয়ে তুলে নিজের মনের মত ক'রে বোঝাচ্ছে তার শ্রোতাদের। তার কণ্ঠ দিয়ে যেন মধু ঝরে ঝরে পড়ছে। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও বা অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে। সহস্র-জোড়া চক্ষু তার ওপর স্থির হয়ে আছে, একটি চোখের পাতাও পড়ছে না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সবাই। আমিও।

মনোহরের কথা বিন্দুবিসর্গও কানে যাচ্ছে না। শুধু চেয়ে আছি তার চক্ষু দুটির দিকে। ঐ সর্বনেশে চোখ দুটিই এতগুলো মেয়ে পুরুষের বাহ্যজ্ঞান লোপ ক'রে ফেলেছে।

সন্ধ্যার পর শেষ হ'ল সেদিনের পালা। চাল-ডাল-ঘি-মসলা-আনাজ তরকারি দিয়ে সাজানো বড় বড় কয়েকটা সিধা পড়ল। টাকা পয়সাও মন্দ পড়ল না।

বিদায়ের সময় তাকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনোহর জানিয়ে গেল কালকের পালা রাইরাজা।

আরও একদিন আরও একপালা এই ক'রে ক'রে পরপর সাতদিন গান হয়ে গেল। নেশা ধরে গেছে সকলেরই। বেলা একটা না বাজতেই লোক জমতে সুরু করে। আগে এসে সামনের জায়গা দখল করবার জন্যে সকলেই সচেষ্ট। বড়লোকের বাড়ীর ঝি এসে মনিব ঠাকরুণের জন্যে কার্পেটের আসন পেতে পাহারা দেয়। গান আরম্ভ হবার একটু আগে আসেন স্বয়ং গিন্নী ঠাকরুণ। পিছনে চাকরের মাথায় মস্ত এক ডালা। তাতে চাল ডাল আনাজ ঘি মসলা ক্ষীর সন্দেশ ফুলের মালা। রূপার পানের কৌটা আর সিধের ডালা সামনে নিয়ে গিন্নী-মা তিন জনের জায়গা জুড়ে কার্পেটের আসনে বসেন। গানের শেষে নিজে সিধা তুলে দিয়ে যাবেন মনোহরের হাতে। তারপর আরও আছে, পরদিন দুপুরে তাঁর কাছে সেবা ক'রে আসবার সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু মনোহর একজন মাত্র—আর তার পেটও একটাই। রোজ দশজনের কাছে সেবা গ্রহণ করেই বা কি ক'রে সে। সুতরাং তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো নিয়ে রেষারেষির অন্ত ছিল না।

মা কালীর সামনে প্রণামী পড়ার বহরও বেড়ে গেল। বেশ চলছিল ক'দিন। সকালের দিকটা একটু চুপচাপ তারপর দুপুর থেকেই উৎসব আরম্ভ। লোক সমাগম হৈ চৈ কলহ কোলাহল। বিকেলে গান আরম্ভ হ'লে আর এক রূপ। খোল খত্তাল হারমোনিয়াম বেহালা বেজে উঠলে চারিদিক একেবারে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ। তখন মনোহরের মধুকণ্ঠ থেকে—অপরূপ রূপে জন্মগ্রহণ

করে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধার দল। মান অভিমান হাসি অশ্রু বিরহ মিলনের এক মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে মনোহরের কণ্ঠ, যারা শোনে তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলে সেই কল্পনার সুরলোকের মাঝে।

সেদিন পালা হচ্ছে কলহান্তরিতা।

নত-মুখে দাঁড়িয়ে শ্যামসুন্দর। চন্দ্রাবলীর কাছে রাত কাটিয়ে এসেছেন। তার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। গালে সিন্দুরের দাগ, অঙ্গে নখের আঁচড়, মোহন চূড়াটি খসে পড়েছে বুকের ওপর। আরও কত কি।

ছি ছি ছি, লজ্জা করে না তোমার সারা রাত কাটিয়ে এসে মুখ দেখাতে। কি দশা হয়েছে তোমার রূপের! কে করেছে অমন দশা তোমার? আমরা হ'লে লজ্জায় মরে যেতাম। না, তুমি ফিরে যাও। তোমার ও মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

গঞ্জনা দিচ্ছেন রাধারাণী। তখন করুণ-ভাবে মিনতি করলেন, ক্ষমা চাইলেন শ্যামরায়। মান ভাঙাবার শতচেষ্টা ক'রে নতমুখে ফিরেই গেলেন শ্রীমতীর হৃদয়-বল্লভ। সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ে গেল। দুর্জয় মান কোথায় গেল কে জানে, তার বদলে যা আরম্ভ হ'ল তার নামই কলহান্তরিতা।

কেন ফিরিয়ে দিলাম তাকে—হায়, কোন্ প্রাণে ফিরিয়ে দিলাম। আরম্ভ হ'ল অন্তর্দাহ। সেই অন্তর্দাহের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে মনোহর নিজেই। তার দুই চোখ দিয়ে, গলা দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছেদের জ্বালা বেদনার মধুরস হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এত জোড়া চোখের মধ্যে এক জোড়া চোখও শুষ্ক রইল না। আসরের চতুর্দিক থেকে আরম্ভ হ'ল ফোঁস ফোঁস শব্দ আর নাক-ঝাড়ার আওয়াজ।

মা কালীর দরজায় বসে গান শুনছি। মিন্নুর মা এসে ডাকলেন।

"একবার উঠে ভেতরে আসুন বাবা। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

মিন্নুর মা ভয়ানক হিসেবী মানুষ। গুরুতর কিছু না হ'লে আমার উঠে

আসতে বলবেন না। কি হ'তে পারে! কে আবার এল এসময় দেখা করতে? উঠে গেলাম বাড়ীর মধ্যে।

"কই, কে ডাকছে আমায়?"

মিনুর মা দেখিয়ে দিলেন, "এই এরা।"

এরা বলতে অন্ততঃ দুজনকে বোঝায় কিন্তু দেখতে পেলাম মাত্র একজন। এক ছোট্ট বউ। মুখের অর্ধেক ঘোমটা ঢাকা। গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বউটি প্রণাম করলে। এতটুকু বউ মানুষ—কি চায় আমার কাছে! নিজে থেকে কিছু বলবে এই আশায় চেয়ে রইলাম। হঠাৎ কানে এল—কান্না চাপবার শব্দ। ঘোমটার মধ্যে বউটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বেশ ঘাবড়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনও কথা আসছে না আমার। মিনুর মার দিকে চাইলাম। তিনিই পরিচয় দিলেন—"মনোহর দাস বাবাজীর বউ। আপনি না বাঁচালে মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আকাশ থেকে পড়লাম! মনোহরের আবার বউ আছে একটি! তার মানে এর মধ্যেই মনোহর বিয়ে-থা ক'রে ফেলেছে! মনোহর পুরোপুরি সংসারী মানুষ এ কথা যে কল্পনা করাও সহজ নয়। মান অভিমান বিরহ মিলন ইত্যাদি কাণ্ডকারখানা-গুলোর জন্যে যে আলাদা এক জগৎ আছে মনোহর হচ্ছে সেখানকার মানুষ। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, স্ত্রীপুত্র ক্ষুধা অভাব অনটন কামড়াকামড়ি এ সমস্ত হচ্ছে এই মাটির জগতের ব্যাপার। মনোহর এই মাটির জগতের মানুষ নয়—তবু সাত-তাড়াতাড়ি একটি বিয়েও ক'রে ফেলেছে! কিন্তু যতই আশ্চর্য মনে হোক এই বউটি ত আর মিথ্যে হ'তে পারে না! মনোহরের বিয়ে করা বউ চাক্ষুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। কোন্ জাতের রস যে এর কান্না থেকে ঝরে পড়ছে তার সঠিক ব্যাখ্যা মনোহরই করতে পারে সব চেয়ে ভাল ক'রে।

আপাততঃ তা না জানলেও আমার চলবে। এখন কি থেকে বাঁচাতে পারলে মেয়েটির সর্বনাশ হবে না এইটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট।

মিনুর মা বউটিকে সাহস দিলেন, "বলো না মা—সব কথা খুলে বলো বাবার কাছে। কোনও ভয় নেই তোমার। ওঁর দয়া হ'লে এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অতএব শুনতে হ'ল মনোহরের বউএর মুখ থেকে তার দুঃখের কাহিনী। আস্তে আস্তে তার কান্না কমে এল, একটু একটু ক'রে ঘোমটাও উঠল কপাল পর্যন্ত। বসে বসে হাঁ করে শুনলাম মনোহরের ব্যক্তিগত জীবনের পদাবলী কীর্তন। সেও বড় সহজ ব্যাপার নয়, আগাগোড়া সহজিয়া পরকীয়ার ছড়াছড়ি তাতে। ওস্তাদ পদকর্তার হাতে পড়লে সমস্ত মাল মসলা নিয়েই এমন মুখরোচক জিনিষ তৈরী হত, যা শুনে পাষাণও গলে জল হয়ে যেত।

সবকিছু বলা হয়ে গেলে পর মনোহরের বউ এই বলে শেষ করলে যে সে এবার গলায় দড়ি দেবে। কারণ গলায় দড়ি দেওয়া ভিন্ন তার আর কোনও উপায় নেই।

হয়ত তা নেইও। নিজের স্বামী আর মনোহরের মত অমন স্বামী যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য গলায় দড়ি দেওয়া কি না তা আমি জানব কেমন ক'রে। এসব ব্যাপারের যথাবিহিত আইন-কানুন আমার জানা নেই। জানবার কথাও নয়। কিন্তু আমাকে এখন করতে হবে কি?

কথাটি অবশেষে খুলে বললেন মিনুর মা। বশীকরণ ক'রে দিতে হবে। মনোহর যাতে বউটির হাতের মুঠোয় ঢুকে পড়ে সেই রকমের শক্ত জাতের বশীকরণ ক'রে দেওয়া চাই। এমন একটি তান্ত্রিক ক্রিয়া করতে হবে, যার ফলে মনোহর বাবাজী এই বউ ভিন্ন আর কারও দিকে কস্মিনকালে চোখ তুলেও চাইবে না। ব্যস্, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

একদম হতভম্ব। বশীকরণ করা কাকে বলে, তার হাড়হদ্দ কিছু ধারণা নেই। কিন্তু সে কথা শোনে কে। এই কালী পূজা ক'রেও যার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে না, সে কি সোজা মানুষ না কি? মিনুর মার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। ইচ্ছে করলে সব পারি। সুতরাং এই একটিবার দয়া করতেই হবে। নয়ত বউটির গতি হবে কি?

মিনুর মা কোনও কথা শুনবেন না। বউটিও তাই, পা জড়িয়ে ধরতে এল। ওধারে গান শেষ হয়ে আসছে। মায়ের আরতির সময় হ'ল। এখন এদের হাত ছাড়াতে পারলে বাঁচি।

বললাম, "মা যা করেন। সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আজ তুমি যাও মা। দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

এতেই মিনুর মা একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, "এই ত কথা পেয়ে গেলে। এইবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও মা। আমার বাবা তেমন বাবা নয়। কথা যখন পেয়েছো আর ভাবনা কি তোমার। তোমার দুঃখের দিন এবার ঘুচল বলে।"

দিন চার পাঁচ কাটল। ভাবছি মনোহর বাবাজীকে একদিন বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলে দেব—নিজের ধর্মপত্নীকে অবহেলা করাটা কতবড় অন্যায়। রস নিয়ে তার কারবার। নব রসের নিগূঢ় অর্থ আর তার অলিগলি সব সে নিজে অত ভাল ক'রে বোঝে কিন্তু তার নিজের ঘরে কোন্ রসের ভিয়ান চড়ছে সে কি তার কোনও খবরই রাখে না! শেষে যে রস জাল হ'তে হ'তে বিপদ ঘটে যাবে। বউটি গলায় দড়ি-ফড়ি যদি দেয়, তখন কতদূর কেলেঙ্কারী হবে সে যেন একটু ভেবে দেখে।

মনোহরের গান তখনও চলছে। হয়ত আরও কিছুদিন চলতও। হঠাৎ একদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। সেদিন কি পালা হচ্ছিল মনে নেই। মনোহর রূপ বর্ণনা করছে একেবারে জীবন্ত ভাষায়। কুচ-যুগল হচ্ছে এই রকমের, নিতম্ব হচ্ছে ঐ রকমের আর অমুকটা হচ্ছে ঠিক অমুক জিনিষের মত দেখতে। যাঁরা শুনছেন তাঁদেরও কান-মন গরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় দারুণ হৈ চৈ লেগে গেল। কোথা থেকে একপাটি চটি এসে পড়ল মনোহরের গায়ে। গান ভেঙে গেল। কাকেও ধরা গেল না।

এতবড় দুঃসাহস কার হ'ল, কালীবাড়ীর মধ্যে জুতো ছোড়বার! ধরতে

পারলে তৎক্ষণাৎ তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত মনোহরের ভক্তরা। ধরা গেল না লোকটাকে—এজন্যে আপসোসের অন্ত রইল না কারও। চোখা চোখা গালাগাল ঘোররবে বর্ষণ হ'তে লাগল সেই অদৃশ্য শত্রুকে তাক করে। তবু কি সহজে কারও গায়ের ঝাল কমে! কিন্তু একেবারে কাটা গেল আমার মাথাটা। কারণ, আমাদের কালী-বাড়ীতে গান গাইতে এসেই সকলের প্রাণতুল্য মনোহর বাবাজীর এ হেন লাঞ্ছনা। এ নিশ্চয়ই সেই পুরান পচা তান্ত্রিক-বৈষ্ণবের ঝগড়া। তন্ত্রের জীবন্ত পীঠস্থান যেখানে নরবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে একদিন, সেখানে দিনের পর দিন এই হা-হুতাশ অভিসার অভিমান আর সহ্য করতে না পেরে মঠেরই ভক্ত কোন ব্যাটা তান্ত্রিক এই দুষ্কর্ম করে গা ঢাকা দিয়েছে। নয়ত আর কি কারণ থাকতে পারে মনোহরের মত সকলের নয়ন-দুলালের এ হেন অপমান করবার। সুতরাং সেই অদৃশ্য তান্ত্রিক ব্যাটার অপকর্মের জন্যে মাথা হেঁট ক'রে করজোড়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইলাম আমি।

তারপর দিন সকালে মনিব-বাড়ী থেকে একখানি পত্র এল। শঙ্করী-প্রসাদরা তাঁদের ঠাকুরবাড়ীতে কোনও রকমের ইতরামো বরদাস্ত করতে রাজী নন। চিঠির শেষে আমাকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আমি সাধক মানুষ, কি এমন দরকার আমার কালী বাড়ীতে গান-বাজনা করবার। এ-ও লেখা আছে শেষে যে আমার মত লোকের পক্ষে ঐ সমস্ত ফচকে কীর্তনীয়াদের কীর্তিকলাপ বোঝার সাধ্য নেই।

চিঠিখানা পড়ে বেশ গরম হওয়াই হয়ত উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। শরীরের হাড় মজ্জা তখন চাকরির রসে বেশ জারিয়ে উঠেছে। বরং বেঁচে গেলাম রোজ রোজ হৈ-হট্টগোল থামল ব'লে। সকলকে মালিকের চিঠিখানা দেখিয়ে কীর্তন বন্ধ ক'রে দিলাম।

কীর্তন বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু অত সহজে তার জের মিটল না। ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জলতেই লাগল। বরং বলা উচিত কীর্তনের আদি রস তখনই গাঢ় হয়ে জমে উঠল।

মনোহর কোথাও গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে। যেখান থেকেই ডাক আসুক, যত টাকার বায়নাই হোক না কেন, সে আর কাশীতে গান গাইবে না। একান্ত মনমরা হয়ে আমার কাছে বা মা-কালীর দরজায় মার দিকে চেয়ে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে লাগল। দলের লোকদের টাকাকড়ি গাড়ীভাড়া সব চুকিয়ে দিয়ে বিদায় ক'রে দিলে। খোল কত্তাল হারমোনিয়াম বেহালা সব চলে গেল। কাজেই গান আর হয়ই বা কি ক'রে।

ছোকরার অবস্থা দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। ওর চক্ষু-দুটির আলো যেন নিভে গেছে। মুখ একেবারে অন্ধকার। কি বললে যে ওর মুখে একটু হাসি ফোটে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

মায়ের পূজা দিতে এল একদিন মনোহরের ছোট্ট বউটি। মা কালীকে সোনার নথ দেবে সে। মা তার কামনা পূর্ণ করেছেন ষোল আনা। স্বামী একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। আমার দয়াতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। যাকে বলে হাতে হাতে ফল। মিনুর মা চুপি চুপি সকলকে বললেন যে মানুষ চেনবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। তিনিই টের পেয়েছিলেন যে কতবড় তন্ত্রমন্ত্র-জানা সাধক পুরুষ আমি। সবাই এবার চোখ মেলে চেয়ে দেখুন কি ভাবে বশীভূত ক'রে দিয়েছি আমি মনোহরকে তার বউ-এর কাছে। ইচ্ছে করলে চোখের পলকে দিনকে রাত আর রাতকে দিনে পরিণত করা যে আমার পক্ষে কিছুই নয়—একথা যন্ত্রতন্ত্র ব'লে বেড়াতে লাগলেন মিনুর মা আর কালী বাড়ীর অন্য সব ভাড়াটেরা। এর ফলও হাতে হাতে পেলাম।

আমার মনিব ঠাকরুণ একদিন বিকেল বেলা তাঁর এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কালী দর্শন করতে। বান্ধবীটির বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। আঁটসাট দোহারা গড়ন। মাজা-ঘষা রঙ, একরকম ফর্সাই বলা চলে। গোল-গাল মুখ, মুখে পান জর্দা। মাথার চুল যত্ন ক'রে সাজানো। বুকের দিকটা অনেক নিচু পর্যন্ত কাটা পাতলা সাদা কাপড়ের জামা আর খুব ভালো কালো-

পাড় একখানি তাঁতের ধুতি তাঁর পরণে। গলায় আধ ইঞ্চি চওড়া সোনার বিছা হার, দু'হাতের আঙ্গুলে গোটা তিনেক মূল্যবান পাথর-বসানো আংটি। সিঁথিতে সিন্দুর নেই। দেখে চিনতে কষ্ট হয় না ইনি কোন বড় ঘরের বিধবা কাশীবাসিনী।

কালী-দর্শনাদি সমাপন ক'রে ওঁরা এসে আসন গ্রহণ করলেন আমার সামনে। শঙ্করীপ্রসাদের গৃহিণী সম্ভ্রমের সঙ্গে নিচু গলায় পরিচয় দিলেন তাঁর সঙ্গিনীর। নামকরা ঘরের বউই বটে। কাশীতে খান-চারেক আর কলকাতায় খান পাঁচ-ছয় বাড়ী আছে এঁর। কলকাতার পাশে কোথায় একটা বিরাট বাগান-বাড়ীও আছে। প্রায় দশ বছর বিধবা হয়েছেন। সদ্‌গুরু খুঁজছেন। শাস্ত্রপাঠ আর কীর্তনাদি শুনে, সাধু বৈষ্ণবের সেবা ক'রে কাশীতে দিন কাটান। এঁর সংকল্প একদিন আমায় হাত দেখাবেন।

এই সেরেছে! হাত-দেখা মানে কবিরাজের নাড়ী টেপা নয়। এ হাত-দেখার অর্থ হচ্ছে হাতের চেটোর ওপর নজর রেখে ভূত ভবিষ্যৎ বাতলানো। হে মা কালী! রক্ষা করো মা এবার আমাকে। আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ এ বিদ্যা জানতেন কি না তাও আমি জানি না। আমি নিজে যে একজন কতবড় হাত-দেখিয়ে সেটুকু অন্ততঃ আমি ভাল ক'রে জানি। রাত পোহালে কাল আমার ভাগ্যে কি ঘটবে মাত্র এইটুকু জানবার বাসনায় বহুবার নিজের দু'হাতের চেটো দুই চোখের সামনে মেলে ধরেছি। ফল সেই একই—বড় বড় কড়াগুলো গড়গড় ক'রে মনে করিয়ে দিয়েছে বিগত জীবনের দুঃখময় কাহিনী-গুলি। আর তা দেখে অনাগত ভবিষ্যৎটুকু সম্বন্ধে আশা করবার মত কোনও কিছুই খুঁজে পাইনি। কিন্তু এখন উপায় কি? এঁর হাত নাকের ডগায় মেলে না ধরেও স্পষ্ট এইটুকু মাত্র বুঝতে পারছি যে, ঐ নরম হাত দুখানি দিয়ে এঁকে জীবনে কুটোটি ভেঙে দুটো করতে হয় নি। এর অতিরিক্ত যে একবর্ণও বলবার সাধ্য নেই আমার।

কিন্তু অত সহজে ভোলবার পাত্রী ওঁরা নন। বেশী তর্কাতর্কি করতে

ভয়ও হ'ল। মনিব-পত্নীকে চটানো কাজের কথা নয়। মুখ বুজে রইলাম। পরদিন সকাল সাতটায় পূজোয় বসবার আগে আসবেন হাত দেখাতে, এই ব'লে মোটা হাতে প্রণামী দিয়ে ওঁরা বিদায় হলেন। তখনকার মত বাঁচলাম।

সন্ধ্যার পর আরতি সেরে মন্দিরের দরজা বন্ধ করছি, মনোহর একান্ত করুণ মুখে নিবেদন করলে যে তার বক্তব্যটুকু দয়া ক'রে শুনতেই হবে আমাকে। আর যা সে বলতে চায়, তা শোনাবার জন্যে আমাকে সে একটু একলা পেতে চায়।

তাই হ'ল, মন্দির বন্ধ ক'রে দোতলায় আমার ঘরে এনে তাকে বসালাম। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। কেউ কোথাও থেকে কান পেতে শুনছে না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে মনোহর তখন উন্মোচন করলে তার হৃদয় দুয়ার। আর আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম সেখানকার আলো-আঁধারের মাঝে। রহস্য রোমাঞ্চ উৎকণ্ঠা উত্তেজনা হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ এই সব নিয়ে মনোহরের সেই গুহ্য জগৎ। শুনতে শুনতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

ভাগ্য পরীক্ষা করতে দলবল নিয়ে কাশীতে এসে ওরা প্রথমে ওঠে বাঙালী-টোলার এক তিনতলা বাড়ীর একতলার দুখানা ঘুপসি ঘরে। সাতটাকা ভাড়ায় ঘর দুখানা মিলে যায়। ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছানা পাতলে ভিজে উঠত। ওরই একখানায় থাকত দলের পাঁচজন আর একখানায় মনোহর আর তার বউ। এতদিন সেখানে বাস করতে হ'লে নির্ঘাত সবাই মরতে বসত। মনোহরের বউ ত কিছুতেই বাঁচত না। দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই গলা ফুলে তার জ্বর এসেছিল।

থাকবার জায়গার ত ঐ অবস্থা। এধারে হাতের সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। দলের পাঁচজন লোকের খাই-খরচা চালাতে হচ্ছে। অনেক জায়গায় ঢুঁ দিলে মনোহর। একটা দশটাকার বায়নাও কোথাও জুটল না। শেষে মরীয়া হয়ে লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে ভিখারীর মত দশাশ্বমেধ ঘাটে বসতে হ'ল একদিন। নিজেদের বিছানায় জড়ানো শতরঞ্চি খুলে নিয়ে গিয়ে

তাই পেতে গানের আসর বসল ঘাটের সিঁড়ির ওপর বিনা নিমন্ত্রণে বিনা বায়নায়। দেখতে দেখতে লোক জমতে লাগল। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর পালা শেষ হ'লে শতরঞ্চির ওপর পাতা চাদর-খানা ঝেড়ে ঝুড়ে যা পাওয়া গেল তা বাড়ীতে নিয়ে এসে গুণে দেখে সবাইয়ের চক্ষুস্থির। নগদ তেইশ টাকা দশ আনা, দুটো সোনার আংটি আর একটা সোনার কানের দুল। পর দিন থেকে সিধে পড়া শুরু হ'ল। চাল ডাল আনাজ তরকারি ফল মিষ্টি ঘি মসলায় ঘর বোঝাই। কত রাঁধবে বউ—কত খাবে সকলে। দশাশ্বমেধ ঘাটে দিন-পাঁচেক গান হয়। তখন পাওয়া যায় প্রথম বায়না—প্রতি পালা ত্রিশ টাকা।

মাসখানেকের মধ্যে বউ-এর হাতের আট গাছা নিরেট চুড়ি গড়াতে দিলে মনোহর। দলের সকলে বাড়ীতে একমাসের মাহিনা মণি অর্ডার করলে। প্রত্যেকের দু' জোড়া ক'রে ধুতি আর জামা জুতো কেনা হয়ে গেল। রান্নাবান্না বাসন-কোসন মাজা-ধোয়ার জন্যে দুজন লোক রাখতে হ'ল। এধারে বউ বিছানা নিলে। তখন আরম্ভ হল একটা ভাল বাসা খোঁজা।

বাড়ী পাওয়া গেল। প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। কাশীর ঘিঞ্জি বসতি এড়িয়ে সেই দুর্গা বাড়ীর ওধারে। কিন্তু বিনা ভাড়ায়। সে বাড়ী ভাড়া দেবার বাড়ী নয়। আর তার ভাড়া দেবার সামর্থ্য মনোহরের ছিলও না। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে সেই রাজপ্রাসাদে তাদের থাকতে দেওয়া হ'ল যতদিন খুশী ততদিনের জন্যে। এই রকমের বাড়ী মিলবে—এ আশা করা একেবারে আকাশ-কুসুম। সে বাড়ীর সাজসজ্জা আসবাব-পত্র জন্মেও তারা চোখে দেখেনি। চাকর বামুন দারোয়ান মালী সব মিলে চোদ্দ জন লেগে গেল তাদের সেবা যত্ন করতে। একেবারে যাকে বলে রাজসুখ।

যে ভদ্রলোক সেধে আলাপ ক'রে তাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন সেই বাড়ীতে —তিনি মালদহ জেলার কোন্ এক জমিদারের পদস্থ কর্মচারী। তাঁর মুখ থেকে মনোহর শুনলে যে, বাড়ীর মালিক স্বকর্ণে তার গান শুনেছেন কুচবিহারের

কালীবাড়ীতে। শুনে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, হয়ত মনোহরকে দলবল সমেত তাঁর নিজের দেশ সেই মালদহে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর বিরাট ঠাকুরবাড়ী। শ্যামরায়ের সেবা। বার মাসে তের পার্বণ। সেই ঠাকুরবাড়ীতে থাকবার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে! নিত্য শ্যামরায়কে গান শোনাতে হবে।

বাগান-বাড়ীতে গিয়ে মনোহরের বউ সেরে উঠল। তখন শহরময় সর্বত্র ডাক মনোহরের। একদিনও কামাই নেই গানের। টাকা পয়সা জিনিসপত্র যা আমদানী হচ্ছে তা গোনেই বা কে, দেখেই বা কে। কিন্তু এত সুখ কপালে সইবে কেন! অন্যদিকে অবস্থা জটিল হয়ে উঠল দিন দিন।

ডাক এল বাগানবাড়ীর মালিকের কাছ থেকে ওদের স্বামী-স্ত্রীর। এক-গা গয়না পরে ফিরল মনোহরের বউ। মনোহরকেও অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে হ'ল। পর্দার আড়ালে বসে মনোহরের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন মালিক নিজে। সেইদিনই মনোহর প্রথম জানতে পারলে যে, মালিক পুরুষ নন। তিনি বিধবা এবং নিঃসন্তান। তারপর যেদিন চাক্ষুষ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হল তাঁর সঙ্গে, সেদিন মনোহর দেখলে যে বয়সও তাঁর বেশী নয়—চল্লিশের মধ্যেই। শেষে রোজ মনোহরকে দুপুরবেলা যেতে হ'ত সেই রাণীর কাছে। ওখানকার কর্মচারী চাকর বামুন সবাই তাঁকে রাণী-মা বলে ডাকে। সেখানে আহারাদি ক'রে বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত রাণীকে নিরালায় কৃষ্ণতত্ত্ব শোনানো ছিল তার কাজ। কিন্তু এতটা সহ্য হ'ল না মনোহরের বউএর, এক গা সোনার গয়না পরেও। গোলমাল সুরু ক'রে দিলে।

এ সব ত গেল ঘরোয়া ব্যাপার। বাইরেও ঝড় বইতে লাগল। কাশীতে ঐ একজনই ভক্তিমতী রাণী আর বাকি সবাই পাপীয়সী মেথরাণী এই বা কেমন কথা! গানের শেষে কোথাও না কোথাও তাকে একটু জলযোগ ক'রে আসতেই হ'ত। সেখানে খেতে বসে সন্দেশ ভাঙলে বেরুত সোনার আংটি, ক্ষীরের বাটির মধ্যে সোনার হার। বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যেত মনোহরের। জল খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বাইরে আরম্ভ হ'ল নিদারুণ

অশান্তি। কানা-ঘুষোয় আকাশ-বাতাস ভরে গেল। কবে কোথায় কোন্ বাড়ী থেকে অনেক রাতে তাকে বেরুতে দেখা গেছে, কে কোথায় কোন্ বাড়ীতে তাকে অসময়ে ঢুকতে দেখেছে, এইসব আলোচনা আর গা টেপা-টেপি একরকম প্রকাশ্যেই চলতে লাগল তার গানের আসরের মধ্যে— সামনের সারিতে। আসতে লাগল বেনামী চিঠি। ঐ বিশেষ বাড়ীটিতে জলযোগ করা যদি না সে ত্যাগ করে, তাহলে তার প্রাণ যাবে—এই ধরণের মধুর সম্ভাষণ থাকত সেই সব চিঠিতে।

এধারে মাথা খুঁড়ে, গলায় দড়ি দিতে গিয়ে মহা অনর্থ বাধালে বউ। শেষ পর্যন্ত বাগানবাড়ী ছাড়তে হ'ল। একটা বাসা ভাড়া ক'রে উঠে গেল সেখানে সবাই। কিন্তু রাণী একেবারে বেঁকে বসলেন। মনোহর আর তাঁর সঙ্গে দেখাই করতে পারলে না।

বাইরে জলযোগ করা ছেড়ে দিলে মনোহর। কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে? যাঁরা জলযোগ না করিয়ে ছাড়বেন না, তাঁরা তার বাসায় হানা দিতে সুরু করলেন। গানের আসরের মধ্যে বচসা কেলেঙ্কারী সুরু হ'ল তাঁদের মধ্যে। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমার শরণাপন্ন হল মনোহর। তার ধারণা ছিল কালী-বাড়ীকে লোকে যে রকম ভয়-ভক্তি করে তাতে এখানে ওসব গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খারাপ যে, চরম কাণ্ডটা এখানেই ঘটে গেল।

এই পর্যন্ত বলতে বলতে দুঃখে ক্ষোভে মনোহরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল সে। আর এতক্ষণে একটু একটু আলোর রশ্মি দেখতে গেলাম আমি। তা'হলে চটি জুতোখানা কোনও উৎকট তান্ত্রিকের পায়ের নয়। ওখানাকে দক্ষিণা হিসেবেও ধরা যায়—বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মনোহরকে নিরিবিলি জল খাওয়ানোরই জের ওখানা। অথচ খামকা আমি জোড় হাতে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ম'লাম। একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইলে মনোহর। অনেকদিন পরে আবার

তার চোখে আলো দেখতে পেলাম। প্রথম দিন আমার গলায় মালা পরাতে এসে যে জাতের চাউনি চেয়েছিল সে আমার দিকে, এ হচ্ছে সেই জাতের চাউনি। বড় বিষম জিনিষ। শরীর মনের ভেতরে কেমন যেন সুড়সুড়ি দিতে থাকে। এটি হচ্ছে তার মোক্ষম অস্ত্র। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে মনোহর তখন আসল কথাটা পাড়লে।

আমাকে একটি বশীকরণ ক'রে দিতে হবে!

মনোহরের-উপর-বেঁকে-বসা সেই মালদহের রাণীর মনটা যাতে একটু ফেরে ওর দিকে—তাই ক'রে দিতে হবে আমাকে। তা'হ'লেই ওরা কাশী ছেড়ে মালদহ চলে যেতে পারে। সেখানে শ্যামরায়কে নিত্য গান শোনাবার চাকরিটি পেলে বেঁচে যায়। নয়ত এখানে না খেয়ে মরতে হবে যে!

সে-ই এক কথা। আর একটি বশীকরণ। সোজা বশীকরণ নয়—এবার রাজরাণী বশীকরণ। কিন্তু যাকে কোনও দিন চোখে দেখিনি এমন কি যার নাম পর্যন্ত জানি না—তাকে দূর থেকে বশীকরণ করব কেমন করে?

কি একটু চিন্তা ক'রে শেষে মনোহর নামটি বলে গেল।

নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।

রাতে স্বপ্ন দেখলাম সেই রাণীকে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল মনোহরের রাণীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে। ছটার সময় উপস্থিত হলেন আমার মনিব ঠাকরুণের সেই বান্ধবীটি। স্নান সেরে এসেছেন। গরদের ধুতি আর গরদের জামা পরা। এক হাতে ছোট একটি রূপার কমণ্ডলু। এক রাশ ভিজে চুল বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে বুকের ওপর ফেলা রয়েছে। চুলের রাশি নিচের দিকে পৌছেছে কোমর পর্যন্ত। চুলের ডগায় একটি গিট বাঁধা। একটি মাত্র মাথায় এত চুল থাকতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বুক ঢিপঢিপ শুরু হ'ল আমার। এ কি বিষম পরীক্ষায় ফেলে দিলি মা শেষকালে! চাকরিটুকু যাবেই দেখছি। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম তাঁর

সামনে পরীক্ষা দিতে। কি একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ ঢুকতে লাগল আমার নাকে। বোধ হয় ও গন্ধ তাঁর ভিজে চুল থেকেই আসছিল। তিনি বাঁ হাতখানি মেলে ধরলেন আমার সামনে। হাতখানি আর ছুঁলাম না। মিনিট তিন-চার একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম হাতের দিকে। তারপর মুখ তুলে বললাম—"এখন হাত আপনি তুলে নিতে পারেন। বলুন ত এবার কি জানতে চান। মনে রাখবেন একদিনে মাত্র তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারি আমি।...সবই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।"

বলে চোখ বুজে বসে রইলাম তাঁর প্রশ্ন করার অপেক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বোধ হয় একটু বিপাকেই পড়ে গেলেন তিনি। মাত্র তিনটি প্রশ্ন—তার মধ্যেই তাঁর যা জানার সব জেনে নিতে হবে। এই রকমের বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়বেন এ নিশ্চয়ই তিনি ভেবে-চিন্তে আসেন নি। কিন্তু সবই যখন মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা তখন আর উপায় কি? অবশেষে তাঁর প্রথম প্রশ্ন কানে এল।

"আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে কিনা?"

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিলাম—"না।"

আবার নিঃশব্দে কাটল কিছুক্ষণ। চোখ বুজেই বসে আছি তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নটি শোনার জন্যে। অতি নিচু স্বরে বেশ কম্পিত কণ্ঠে শোনা গেল আবার, "কেন?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "বাধা আছে।"

নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনি ভাবে তাঁর তৃতীয় প্রশ্ন শুনতে পেলাম।

"কি সেই বাধা।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দিলাম, "শত্রু।" উত্তর দিয়ে চোখ মেললাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখখানি একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তিনি নতমুখে বসে রইলেন। আর ত প্রশ্ন করার উপায় নেই। তিনটি প্রশ্নই খতম। শেষে একটি নিঃশ্বাস চেপে বললেন, "আরও কত কথাই জানবার ছিল। কিন্তু আর ত কোনও উত্তর আজ পাওয়া যাবে না।"

বললাম, "আপনার আরও প্রশ্ন থাকলে আমাকে ব'লে যেতে পারেন। রাত্রে আসনে বসে মার কাছে থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করব। দেখি যদি বেটির দয়া হয়।'

তবুও সেইভাবে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "সে শত্রু যে কে, তাও আমি জানি। কিন্তু কি ক'রে তাকে ভুলে গিয়ে"—বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন। কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরল। চকিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি। একটি ঢোঁক গিলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—"মানে কি ক'রে সেই শত্রুকে জব্দ করা যায়?"

বললাম, "যদি সে শত্রুর নাম আপনার জানা থাকে, তবে তা ব'লে যান আমার কাছে, দেখি কি করতে পারি।"

বেশ কিছুক্ষণ আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। শেষে একান্ত মিনতির সুরে বললেন—"আমার বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে আর কেউ এ নাম জানতে পারবে না। নাম—নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।"

সাপের গায়ে পা পড়লে মানুষ যে ভাবে চমকে ওঠে, সেইভাবে চমকে উঠলাম আমি। কিন্তু তা ভেতরে ভেতরে। রাতে আসনে বসে যা জানতে পারব তা তিনি কাল সকালে এলে শুনতে পাবেন, এই কথা ব'লে তাঁকে বিদায় দিলাম।

সকালের পূজা শেষ হ'ল। কাঁসর-ঘণ্টা থামতে না থামতেই পিছন থেকে কানে এল, "মা—মা গো, মুখ তুলে চাও মা। হতচ্ছাড়ী আবাগীরা যেন দুটি চক্ষের মাথা খায়। যেন ভাতে হাত দিতে ভয়ে হাত দেয়। তাদের ভরা কোল খালি ক'রে দাও মা—নির্মূল ক'রে খালি ক'রে দাও। যে মুখ নেড়ে

আমার গায়ে নোংরা ছিটোচ্ছে, সে মুখ দিয়ে যেন রক্ত ওঠে। তুমি যদি সত্যি মা হও—তাহলে যেন তেরাত্তির না পেরোয় মা, তেরাত্রির যেন না কাটে। যেন সব উঁচু বুক ভেঙে নেপ্‌টে যায়।" টিপ টিপ ক'রে শব্দ হতে লাগল দরজার চৌকাঠের ওপর।

এ আবার কোন্ মেয়েমানুষ দুর্বাসা রে বাবা! সভয়ে পেছন ফিরে দেখলাম এক দশাসই বুড়ি হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে মাথা খুঁড়ছে।

আরতি শেষের প্রণামটা করতেও ভুলে গেলাম। তিনি তাঁর বপুখানি খাড়া করে উঠে বসলেন। তারপর তাঁর ভাঁটার মত দুই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি আমার ওপর ফেলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি বাড়িয়ে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ গা, তুমিই আমাদের শঙ্করীর পুরুত—নয় বাছা? তোমার সঙ্গেই দুটো কাজের কথা আছে।" বলে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত মুখব্যাদান করলেন। অর্থাৎ ওঁদের শঙ্করীর পুরুতকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্যে হাসলেন।

ভয়ে দুর্ভাবনায় একেবারে কুঁকড়ি-সুকড়ি মেরে গেলাম। কিন্তু পালাবারও ত পথ নেই। দরজা জুড়ে তিনি অধিষ্ঠান করেছেন। কোনক্রমে শুধু গলা দিয়ে বেরুল, "বলুন।"

"এখানে কি বলা যায় বাছা সে সব কথা। কোন্ হারামজাদী কোথা থেকে শুনে ফেলবে। পরের হাঁড়ীর খবর গিলবে ব'লে সব হাঁ ক'রে রয়েছে যে আবাগীরা। তোমার কাজ হয়ে থাকে ত চলো না তোমার ঘরে। সেখানেই সব কথা বলব।"

অগত্যা তাই করতে হ'ল। হুকুম তামিল না ক'রে উপায় নেই। এ লোক সব করতে পারে। তাঁর কথা শোনাবার জন্যে আমার টুঁটিটা টিপে ধরে বিড়াল বাচ্চার মত ঝুলিয়ে নিয়ে কোনও নির্জন স্থানে যদি রওয়ানা হন, তাহলেই বা কি করতে পারি আমি? তার চেয়ে ভালয় ভালয় ওঁর বক্তব্যটুকু শোনা ঢের নিরাপদ।

বললাম, "চলুন।"

চললেন তিনি আগে আগে। বোঝা গেল এ বাড়ীর অন্ধি সন্ধি সবই তাঁর জানা। কোন্ তলায় থাকি আমি, এইটুকু মাত্র জেনে-নিয়ে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে।

পেছন থেকে ইসারা করলেন মিনুর মা থামবার জন্তে। ওঁর অলক্ষ্যে কাছে এসে বললেন, "ওমা, এ যে গাঙ্গুলী গিন্নী গো—এ মাগী আবার জুটল কোথা থেকে? কোথায় যাচ্ছেন ওর সঙ্গে?" আঙ্গুল দিয়ে ওপরটা দেখিয়ে তাঁর পেছন পেছন উঠে এলাম দোতলায়।

আমার ঘরের দরজা খুলে দিতে তিনিই আগে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই ধপ ক'রে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। আবার হুকুম হ'ল, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস বাছা।"

তাই করে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। তিনি বসবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁর হুকুম মানলাম না। উল্টে তাঁকেই হুকুম করলাম দৃঢ় কণ্ঠে— "বলুন আপনার কি বলবার আছে। মনে থাকে যেন—পাঁচমিনিটের বেশী আমি কারও সঙ্গে আলাপ করি না। আপনাকেও পাঁচমিনিট সময় দিলাম।"

ব'লেই চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে।

আমার কথা শুনে তাঁর মুখের অবস্থা কি দাঁড়ালো দেখতে পেলাম না। তবে তাঁর গলার আওয়াজ বদলালো। এতক্ষণ চলছিল হুকুম করার গলা, এবার তা থেকে নরম সুর বার হ'ল। শুধু তাই নয়, বেশ বুঝলাম হঠাৎ মুখের ওপর চড় খেতে তিনি অভ্যস্ত নন। চিরকাল লোকের ওপর আধিপত্য করা যাঁর স্বভাব, তাঁর সেই হামবড়া ভাবটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না আর। তখন তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। আসল দুর্বল মানুষটি তখন বেরিয়ে পড়ে খোলস ছেড়ে।

তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে আরম্ভ করলেন, "আমি—মানে আমার পরিচয়টা আগে দিই। আমি হলুম এই—।" তখনই থামালাম তাঁকে, "আপনি গাঙ্গুলী

গিন্নী। কথা বাড়াবেন না। দরকারী কথাটুকু বলুন আগে।" চোখ বুজেই আছি আমি। যেন চোখ বুজে সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখছি। এবার আরও নরম হলেন তিনি, "তাই ত বলছি বাবা। তুমি ত সাক্ষাৎ অন্তর্যামী, সবই ত বুঝতে পারছ বাবা তুমি। সবই আমার অদৃষ্ট, সবই আমার এই পোড়া—"

আবার থামালাম তাঁকে—"থাক, কপালের দোষ দেবেন না আমার সামনে। সবই সেই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। এখন বলুন কি চান আপনি ?"

ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একটিও বাজে কথা বলা চলবে না, এ অবস্থায় পড়তে হবে বুঝলে হয়ত তিনি আসতেনই না আমার কাছে। একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি।

"মেয়েটার মাথাটা যাতে ভাল হয়, তাই ক'রে দাও বাবা। তাই তোমার কাছে এসে পড়েছি।"

"সে মেয়ে আপনার কে ?"

"ভাইঝি। আমার একমাত্র ভায়ের ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অগাধ ঐশ্বর্য আমার ভায়ের। ঐ মেয়েই এখন মালিক। হতভাগীর ভাল ঘরে বিয়েও দিয়েছিলাম বাবা, কিন্তু কপাল পুড়ল এক বছর না পেরোতেই। সেখান থেকেও অগাধ সম্পত্তি তার হাতে এল। এখন এখানেই আমার কাছে আছে।"

"মাথা খারাপ হয়েছে জানলেন কি ক'রে ?"

"মাথা খারাপ নয় ত কি বাবা। লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েছে। যা খুশী তাই করছে। লোকে কি বলছে না বলছে সেদিকে মোটে খেয়াল নেই। কোথাকার কে এক হাড়হাবাতে কেত্তনওলাকে নিয়ে মেতে উঠেছে। তাকেই নাওয়ানো, তাকেই খাওয়ানো, তাকেই ঘুম পাড়ানো। আবার বলে কি না—এই আমার সেই শ্যাম, সেই কালোরূপ, সেই চোখ, সেই সব। অত আদিখ্যেতা আর বেলেল্লাপনা লোকের গায়ে সইবে কেন বাবা! পাঁচ-জনে পাঁচ-কথা বলাবলি করবে না ত কি ? এই ত আমি—এই যে বিধবা হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর কাশীবাস করছি—কই বলুক ত দেখি কোন ব্যাটাখাগীর বেটি কি

বলতে পারে আমার নামে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না তার? কিন্তু ঐ মেয়ের দরুন আমার মাথা কাটা গেল বাবা, লোকে আমার মুখে এবার ময়লা তুলে দিচ্ছে!"

এতখানি একসঙ্গে বলে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, "আপনার সেই ভাইঝি কি মালদার কোনও জমিদার-বাড়ীর বউ? যাঁকে তাঁর কর্মচারীরা রাণী-মা ব'লে ডাকে?"

জ্বলে উঠলেন গাঙ্গুলী গিন্নী দপ্ ক'রে—"ঝাড়ু মারি সেই রাণীর মুখে! সেই ঢলানীর জন্যেই ত আমার অমন সোনার 'পিতিমের' এমন মতিচ্ছন্ন আজ। সেই ছোঁড়া কেত্তুনে প্রথমে সেই রাণী-মাগীর কাছেই ত গিয়ে জুটেছিল। সে হচ্ছে আমার মেয়ের ননদ। তার সেখান থেকেই ত ঐ ভূত ভর করেছে আমার মেয়ের ঘাড়ে। একটা কিছু তোমায় ক'রে দিতে হবেই বাবা—যাতে মেয়েটা আমার কথা শোনে। আমি যে আর মুখ দেখাতে পারি না লোক-সমাজে, আমার যে আর—"

আবার থামাতে হ'ল তাঁকে। আর এবার দুই চোখ খুলে সোজা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ভাইঝির নাম হচ্ছে কল্যাণী রায়। কেমন—সত্যি কিনা?"

ভদ্রমহিলার নীচেকার পুরু ঠোঁট একেবারে ঝুলে পড়ল। এতবড় অন্তর্যামী সত্যই তিনি জন্মে কখনও চোখে দেখেন নি। তাঁকেও বিদায় করলাম। কথা দিতে হ'ল যে এমন ভাবেই বশীকরণ করে দেব যে ভাইঝি একেবারে তাঁর কথায় উঠবে আর বসবে!

খেতে বসলাম। খেতে খেতে ভাবছি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করব।

"কি খাচ্ছেন না কি? এত বেলায় খাওয়া দাওয়া করলে শরীর টিঁকবে কেন?"

ঘরে ঢুকলেন আমার মনিব খোদ ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা। এমন সময় তিনি উপস্থিত হবেন, একথা ভাবাও যায় না। খান-তিনেক মোটা মোটা বই তাঁর বগলে। বই কখানা আমার বিছানার ওপর ফেলে কোট প্যাণ্ট সুদ্ধ মেঝের ওপর বসে পড়লেন তিনি।

"আহা হা, হাত তুলবেন না, হাত তুলবেন না। আপনার খাওয়াটা নষ্ট হ'লে সত্যি আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কোথাও শান্তি-ফান্তি নেই মশায়। ভাল লাগে না আর। ক্লাস না ক'রেই চলে এলাম। অনর্থক ভূতের ব্যাগার খাটা। আপনারাই শান্তিতে আছেন। মাকে নিয়ে আছেন। মা আনন্দময়ী—আনন্দে আছেন আপনারা মার দয়ায়। ভাবছি এবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এই পথই ধরব।"

তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। টাঙ্গায় ক'রে এসেছেন এই দুপুর রোদে। নিজের গাড়ীও আনেন নি। কে একজন এসে দরজার বাইরে থেকে জানালে যে, টাঙ্গাওলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। শঙ্করীপ্রসাদ কোট-প্যাণ্টের সব ক'টা পকেট হাতড়াতে লাগলেন। মুখ আরও লাল হয়ে উঠল তাঁর। কাছে টাকা পয়সা কিছু নেই। থাকার কথাও নয়। তাঁর বাঙলো থেকে কলেজে যেতে গাড়ী লাগে না। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে ক্লাসে পড়াতে পড়াতে পড়ানো বন্ধ ক'রে টাঙ্গায় চড়ে এখানে চলে এসেছেন। কাছে যে কিছু নেই, এটুকুও খেয়াল হয় নি।

খাওয়া আমার শেষ হয়েছিল। উঠে পড়ে একটা টাকা পাঠালাম নিচে ভাড়া দিতে। মিন্থুর মাকে এক গেলাস লেবু চিনির সরবৎ করতে বলে এসে বসলাম ওঁর কাছে।

"দেখুন দেখি, একটা পয়সাও সঙ্গে নেই। এমন নিঃসম্বল হয়ে কাকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন কখনও? একেই বলে ষোল আনা সন্ন্যাসী, কি বলেন?" ব'লে হা হা ক'রে হাসতে লাগলেন ডক্টর সাহেব।

বললাম, "তাহ'লে আরও একটু সন্ন্যাসী হোন। এই দুপুর রোদে আর

ওগুলো পরে থাকবেন না। ছেড়ে ফেলুন আমার এই কাপড়খানা পরে। দেখবেন শান্তি পাবেন।"

কাপড়খানা নিয়ে তিনি বললেন, "শেষ পর্যন্ত রক্তবস্ত্রই ত পরতে হবে একদিন। দিন, আজ থেকেই অভ্যাসটা হোক। সত্যই এগুলো অসহ্য লাগছে।"

পাশের ঘরে কাপড় পালটাতে গেলেন তিনি। তারপর নিচে গিয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে আবার যখন এসে বসলেন তখন তাঁকে দেখে একেবারে থ হয়ে গেলাম। ধপধপে ফর্সা রঙ মোটা সোটা মানুষটি, গলায় এক গোছা শুভ্র পৈতা, তার ওপর লাল টকটকে রক্তবস্ত্র। মানুষটিই যেন একদম বদলে গেছেন।

"কি দেখছেন অমন ক'রে? একেবারে কাপালিক হয়ে গেছি ত। আরে মশাই—শরীরে রয়েছে যে কাপালিকের রক্ত। এ ভিন্ন আমায় মানাবে কেন বলুন।"

বললাম, "বাস্তবিকই মানিয়েছে আপনাকে। শ্রীমতী শর্মা একবার দেখলে—"

যেন জ্বলে উঠলেন তিনি, "কি করতেন? কি করতেন আপনার মনে হয়? জানেন না ঐ সমস্ত আলোক-প্রাপ্তাদের! সখ ক'রেও একদিন এই বেশ পরেছি দেখলে তিনি শক্ড্ হবেন। মানে আঁতকে উঠে ভিরমি যাবেন। যেতে দিন, যেতে দিন ওঁদের কথা।"

সরবৎ এল। এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা শেষ ক'রে মেঝের ওপরেই চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

বললাম, "এখন চোখ বুজে ঘুমোন একটু—এই নিন বালিশটা।"

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসলেন তিনি।

"আরে, ঘুমোব কি মশায়? ঘুমোতে এলাম নাকি এখানে? আপনার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে যে। কোথায় গেল বইগুলো?"

বইগুলো নামিয়ে এনে খুলে বসলেন।

তখন আরম্ভ হ'ল আসন আর মুদ্রা। তা থেকে তত্ত্ব আর আচার। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, শেষ ক'রে যখন বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার পর্যন্ত আসা গেল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিলেত-ফেরত ডক্টর সাহেবের পড়াশুনার বহর দেখে। সমস্ত পড়েছেন—সবই জানেন। কেবলমাত্র তর্ক করবার জন্যে বা একটিকে উঁচু অন্যটিকে নিচু প্রতিপন্ন করবার বাসনা নিয়ে শাস্ত্রগুলো পড়েন নি। তত্ত্ব আর আচার কোন্‌টি কোন্‌ অবস্থায় কোন কাজে লাগে তা তলিয়ে বোঝবার তাগিদে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়েছেন। কিন্তু আর ত পারা যায় না। অন্ততঃ এবার একটু চা হ'লে হ'ত। বললাম—"এবার চা করি—এ-ত আর সহজে শেষ হচ্ছে না। এখনও দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার রয়েছে। তারপরেও থাকবে অঘোরাচার, যোগাচার, কৌলাচার। সেই কৌলাচারে না পৌঁছে ত আর থামছেন না আজ। এধারে চায়ের সময় যে বয়ে যায়। চায়ের সময় চা না খেলে সেটা কোন্‌ আচারের মধ্যে পড়ে তা জানেন আপনি?"

বই বন্ধ ক'রে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুই চোখের ওপর একখানা হাত চাপা দিয়ে বললেন,—"স্রেফ ভ্রষ্টাচার। চা-ই হোক—আর যা।" বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

চা দিলাম। ফলও দিলাম। আগে চায়ের বাটিটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর বেশ নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা—ঐ সমস্ত বিশ্বাস করেন আপনি?"

"কি সমস্ত?"

"ঐ যে আপনাদের মারণ উচ্চাটন বিদ্বেষণ স্তম্ভন এই সব বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারগুলো?"

"আমার বিশ্বাসে কি যায় আসে। লোকে ত করে।"

"লোকে বোঝে ছাই। এই কাশীতেই কত ব্যাটা ঐ সব ধাপ্পা দিয়ে ক'রে খাচ্ছে।...কিন্তু আপনার কথা আলাদা। লোকে আপনাকে ভয়ানক ভয় করে।

আপনি নাকি হাতে হাতে মোক্ষম বশীকরণ ক'রে দিতে পারেন। অরুণার বিশ্বাস আপনি মরা বাঁচাতে পারেন। তাই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—এসব কি সত্যি ?"

বললাম, "লোকে ত আরও কত কথাই বলে। মিনুর মা আর আপনার অন্য সব ভাড়াটেরা এমন কথাও ত বলে বেড়াচ্ছেন যে, আসনে বসে ধ্যান করতে করতে আমি এক-দেড়-হাত শূন্যে উঠে যাই। একথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন !"

শঙ্করীপ্রসাদ ঠক্ ক'রে বাটিটা নামিয়ে রেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

"নাঃ, একটা লোককেও আপনার ক'রে পেলাম না এ জীবনে। জন্মের পরই মা দিলেন দূর ক'রে। মানুষ হলাম পরের কাছে। দুনিয়া পর রয়ে গেল চিরদিন। কারও কাছে যে মনটা একটু হাল্কা করব—এমন কাকেও আজ পর্যন্ত পেলাম না। ভেবে এলাম আপনি সংসার-ত্যাগী সাধক মানুষ, আপনি বুঝবেন আমার দুঃখ। তা আপনি সুদ্ধ ভ্যাঙ্চাতে লাগলেন।"

বেশ কয়েক মিনিট কাটল নিঃশব্দে। নিঃশব্দেই তিনি কমলার কোয়া চিবুতে লাগলেন। তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একখানা পর্দা উঠে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বাড়ী গাড়ী উচ্চ বিলাতী-ডিগ্রী, প্রচুর বেতন সুসজ্জিত বাঙলো, বিদুষী-ভার্যা এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও এই লোকটির কিছু নেই, কেউ নেই। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল সঙ্গ-বিবর্জিত একক একটি বয়োবৃদ্ধ শিশু ইনি—সব কিছু পেয়েও একটি অভাব আজও পূরণ হয়নি এঁর। জীবনে কোনও দিন জননীর বুকের তলার তপ্ত স্থানটুকু পাননি ব'লেই একখানি বুকের কাছে একান্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এঁর প্রাণ আকু-পাঁকু করছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অপরের হাতে সঁপে দিয়ে সেই পরকে আপন ক'রে পাবার তৃষ্ণায় এঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বললাম, "ভ্যাঙ্চাতে যাব কেন আপনাকে। নিজের দিকটাই শুধু দেখছেন। আমার কথাটা একবার ভাবুন ত। কে আছে আমার ত্রিজগতে?

আপনার দুঃখ-সুখের ভাগ নেবার জন্যে তবুও ত রয়েছেন একজন। তিনি হয়ত—"

দাবড়ি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন সাহেব।

"থামুন, থামুন! ঢের হয়েছে! কি জানেন আপনি? কতটুকু জানেন তাঁর সম্বন্ধে? খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার এই সব চারপেয়ে আসবাব কতকগুলো ত ঘর ভর্তি রয়েছে আমার। উনিও তেমনি একটি দু'পেয়ে আসবাব ভিন্ন আর কিছু নন।"

অতএব থামলাম! বলবারই বা আমার আছে কি। নিজের কথাই বলতে এসেছেন ইনি। শুনতে আসেন নি কিছু। কাজেই চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার মনিব আবার মুখ খুললেন। তখন বেরুল তাঁর মুখ দিয়ে তাঁরই ঘরের আর মনের কথা। সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম যে, শ্রীমতী শর্মা বলে যাকে জানি, তিনি আমারই মত সাহেবের কাছ থেকে মাইনে নেন মাসে মাসে। তবে তাঁর পদটি বড়, পদবীটিও বড়, মাইনেও অনেক বেশী পান আমার চেয়ে। তা ভিন্ন তাঁর চাকরিও অনেক দিনের। দশ বছরেরও বেশী তিনি চাকরি করছেন। সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে বার-দুই সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছেন। মাসে মাসে টাকা জমছে তাঁর। জমে জমে সেই টাকার অঙ্ক বোধ হয় দশ-বারো হাজারেরও ওপর উঠেছে। যেদিন খুশী যেদিকে খুশী তিনি চলে যেতে পারেন—তাঁর জমানো টাকা নিয়ে। গিয়ে বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবেন। কোনও অজুহাতই তখন তাঁকে বাধা দেবার উপায় নেই।

মনিব সাহেব দু'হাত নেড়ে বললেন—"তা ভিন্ন ওঁর যে কি জাত আর ওঁর বাপ-মায়ের পরিচয়ই বা কি—তা তিনি নিজেই জানেন না। আমার মত খৃষ্টান মিশনারিদের কাছে তিনি মানুষ হয়েছেন। আমার মা-বাপের পরিচয়টুকু ছিল—ওঁর তাও নেই। ফাদার উইলসন যখন ওঁকে আমার কাছে দেন, তখন বলেছিলেন—'শর্মা, এই মেয়েটির মা হ'ল ধরিত্রী আর বাপ স্বয়ং পরম

পিতা ঈশ্বর। এর বেশী কোনও পরিচয় আমার জানা নেই। মনে রেখো যে এমন ভাবে একে আমি গড়ে তুলেছি যে, এ মেয়ে ধরিত্রীর মত সবই সহ্য করবে—শুধু এর আত্মার অপমান ছাড়া। তোমার কাছে একে দিচ্ছি, কারণ তোমাকেও আমি মানুষ করেছি। এ বিশ্বাস আমার আছে যে তুমি এর আত্মার অবমাননা করবে না।' সেই থেকে এই এতগুলো বছর উনি কাটালেন আমার সঙ্গে। সর্বদাই আমি তটস্থ পাছে ওঁর আত্মায় গায়ে চোট লাগে। এই সব আত্মা-টাত্মা মশাই আমি বুঝিও না, আর ও আপদ বোধ হয় আমার নেইও। থাকলেও কবে শুকিয়ে একেবারে রসকষ-শূন্য ছিবড়ে হয়ে গেছে।"

শঙ্করীপ্রসাদ বলতে লাগলেন, "অমন একগুঁয়ে জেদী লোক দুনিয়ায় দুটি আছে কিনা সন্দেহ। একবার টাইফয়েড হয় আমার। একমাস পরে পথ্য ক'রে চাকর বাকরদের কাছে জানতে পারলাম যে মেমসাহেব একমাস সকালে বিকালে দু কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খান নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টাও আমার মাথার কাছ থেকে ওঠেন নি। তার ফলও ভোগ করতে হ'ল তাঁকে। আমি ত সেরে উঠলাম, তিনি বিছানা নিলেন। তার জের চলল সমানে ছ'মাস। কোথায় মুসৌরী, কোথায় ওয়ালটেয়ার ক'রে ক'রে তবে খাড়া করি তাঁকে।"

এতক্ষণ পরে সাহেব বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বলেও ফেললেন বেশ গর্বের সঙ্গে—"টাকা দিলেই কি ভাল লোক পাওয়া যায় মশায়? ভাল লোক পাওয়াও ভাগ্যের কথা। টাকা দিচ্ছি বা খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি সেটা কিছু বড় কথা নয়। স্ত্রী থাকলে তাঁর নামেও টাকা জমত। আজ এঁর হাতে মাস গেলে একখানা চেক দিচ্ছি, বিয়ে করলে বউকেই ত আমার লাইফ ইনসিওর-গুলোর নমিনি করতাম। ও একই কথা। এখন এঁর নামে টাকা জমছে তখন তাঁর নামে জমত। কিন্তু এত বিশ্বাসী লোক কোন-কিছুর বদলেই মিলবে না। আমার ভাল-মন্দ সুনাম দুর্নাম-সব কিছু ঢেকে ঢুকে সামলে সুমলে চলেছেন উনি এই দশবছর। কারও স্ত্রী বোধ হয় এতটা করেন না।"

ডক্টর সাহেব দু-একটা ছোট-খাট কাহিনী ব'লে বোঝালেন আমায় যে খাস বিলেতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেখানে খুব বিশ্বাসী সেক্রেটারী কেউ কেউ নিজের জান-প্রাণ বিপন্ন করেও মনিবের জান-প্রাণ রক্ষা করে।

তবুও—তবুও একটা জায়গায় থেকে যাচ্ছে একটা মস্ত বড় হাঁ—মানে ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে ঢুকছে তীব্র হিমেল হাওয়া। ঢুকে ছুঁচ ফোটাচ্ছে তাঁর হাড়ে-পাঁজরায়। মিশনারি হোমের মেয়ের আর যে ক্ষমতাই থাক সেই ফাঁকটুকু জুড়ে দেবার সামর্থ্য নেই। সে না হয় বড় জোর তাঁর জন্যে জীবনটাই দিতে পারে।

শঙ্করীপ্রসাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই ত ছুটে এলাম আপনার কাছে। সব কথা ত আর সবাইকে বলা যায় না।"

"কিন্তু বলছেন কই আপনার নিজের কথা। এতক্ষণ ত বাজে কথাতেই কাটল।"

আরও একটু কাছে সরে এলেন তিনি। সামনের দিকে ঝুঁকে একরকম ফিসফিসিয়ে আরম্ভ করলেন—"তাই ত বলছি—ঐ সব বশীকরণ সম্মোহন ব্যাপারগুলো সম্বন্ধেই ত জানতে চাচ্ছি। এসব কি সত্যিই সম্ভব?"

সাবধান হলাম। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে এবার সাপ বেরুচ্ছে। বললাম, "সম্ভব কি না পরীক্ষা ক'রেই দেখুন। হাতে হাতে ফল পেলেই বুঝবেন। এখনই গিয়ে শ্রীমতী অরুণাকে ধরে নিয়ে এসে আপনার সামনে বসিয়ে এমন বশীকরণ ক'রে দেব যে তখন -"

সাহেব মারমুখো হয়ে উঠলেন, "আবার আরম্ভ হ'ল ত ভ্যাংচানো।"

চমকে উঠলাম। সত্যিই আমার গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। সেক্রেটারী অরুণার কথা বলতে আসেন নি ইনি এত কষ্ট ক'রে দুপুর রোদে। এটুকু আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এ হচ্ছে আর একজনের কথা। আঠার বছর বয়সে দেরাদুন থেকে কাশীতে ফিরে এসে যাঁর কাছে শঙ্করীপ্রসাদ আশ্রয় পান, যিনি তাঁকে নিজের ছেলের

মত দেখতেন, যিনি তাঁকে বিলেত পাঠান উপযুক্ত হয়ে আসবার জন্যে, যিনি আশা করেছিলেন যে, বিলেত থেকে ফিরে এসে শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর ছেলের স্থানটুকু পূরণ করবেন, এ হচ্ছে সেই এলাহাবাদের বিখ্যাত আইনজীবী মিষ্টার চৌধুরীর কথা। না শুধু তাঁর কথা নয়—সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার কথাও জড়ানো রয়েছে।

মিষ্টার চৌধুরী ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদের দাদামশায়ের শিষ্য। আপনার বলতে এ জগতে ডক্টর শর্মার কেউ ছিল না যখন, তখন চৌধুরী সাহেব তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন। তিনিই আশা দেন যে, মামলা ক'রে মঠ আর কালী উদ্ধার করা যাবে। শৈব-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, শৈব-বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই যে সম্পত্তির আইন-সম্মত মালিক, এ কথা তিনিই প্রথম বলেন। বছর দুই এলাহাবাদে তাঁর কাছে ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর চলে গেলেন বিলেতে। তাঁর মায়ের দেওয়া প্রচুর টাকা ছিল তাঁর নামে। মিষ্টার চৌধুরী বিশ বছরের শঙ্করীপ্রসাদকে বিলেত পাঠালেন উপযুক্ত হয়ে ফিরে আসবার জন্যে। তাঁর একমাত্র কন্যার উপযুক্ত স্বামী হয়ে আসতে হবে বিলেত থেকে।

বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশ বছরের ছেলে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে বাপ আর পাশে তাঁর মেয়ে। ছেলেটি ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে দু'হাতে জাহাজের রেলিং, দু'চোখের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেয়ে আছে বাপ আর মেয়ের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না, বোধহয় নিঃশ্বাসও পড়ছে না। জাহাজ পিছু হটে সরে যাচ্ছে।

ছাপ পড়ে গেল। বুকের মধ্যে একটি ছবি ফুটে উঠল ছেলেটির। একটি মেয়ের ছবি, মেয়েটি এক হাতে তার দামী শাড়ীর আঁচল মোচড়াচ্ছে, আর এক হাতে বাপের একখানা হাত আঁকড়ে ধরে আছে, নাকের ডগা লাল হয়ে উঠেছে তাঁর, চোখের পলক পড়ছে না, দম বন্ধ ক'রে চেয়ে আছে মেয়েটি জাহাজের ওপর

দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে। শঙ্করীপ্রসাদের বুকের নিভৃততম প্রকোষ্ঠে সেই ছবি আজও অম্লান, আজও সজীব, আজও জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে।

সাগর-পারের দেশে চার-চারটে বছরের সব ক-টা দিন আর রাতগুলো শঙ্করীপ্রসাদ কাটিয়েছেন নিজেকে সর্বরকমের আমোদ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত রেখে। রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন পুঁথি পড়ে, দিনের পর দিন লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে বইয়ের পোকার মত ঘুরে ঘুরে। তাঁকে যে উপযুক্ত হ'তেই হবে, দেশে ফিরে একজনের বরমাল্য পাবার জন্যে।

সবই হ'ল। ঠিক সময় দেশে ফিরলেন শঙ্করীপ্রসাদ। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মিষ্টার চৌধুরী মারা গেছেন। তাঁর এক দজ্জাল বোন ছিল কাশীতে। তিনি মেয়েকে নিয়ে এসে এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। পিসীর সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি দশ কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন। শঙ্করীপ্রসাদের জাত-জন্মেরই ঠিক ঠিকানা নেই, কোন্ সাহসে সে আসে তাঁর ভায়ের মেয়েকে বিয়ে করতে?

এই পর্যন্ত ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে শেষে এই ক-টি কথা উচ্চারণ করলেন আমার মনিব, "সেই থেকে আজ পর্যন্ত একবার তাকে চোখের দেখাও দেখতে পাইনি।" কথা ক-টি যেন তাঁর বুক খালি ক'রে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে আমি চোখ বুজে ফেলেছি। সেই অবস্থাতেই বললাম, "এখন বলুন ত সেই মেয়ের নাম কল্যাণী কিনা?"

খপ করে আমার দু'হাত চেপে ধরলেন ডক্টর সাহেব। থরথর ক'রে তাঁর হাত কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

আবার যখন কথা ফুটল তাঁর মুখে, তখন বললেন বাকিটুকু নিজেই। কল্যাণী এখন কাশীতেই রয়েছে। বিধবা হয়েছে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। তাঁর সেক্রেটারী অরুণাকে তিনি লাগিয়েছিলেন, কোনও ফল হয় নি। কে এক মালদহের রাণী হচ্ছে কল্যাণীর ননদ। তিনিও বিধবা। তাঁর সঙ্গে

পরিচয় হয়েছে অরুণার। সেই রাণীর কাছ থেকে শুনে এসেছে অরুণা যে, কল্যাণীর ঘাড়ে মীরাবাইয়ের ভূত ভর করেছে। এখন সে 'হা মেরে নন্দদুলাল' করছে। দিনরাত ঠাকুর নিয়েই আছে। সেই কালো পাথরের পুতুলকে নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো আর গান শোনানো এই নিয়েই আছে সব সময়। দুনিয়ার কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে না।

"আরে আসুন আসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল। বাঁচবেন বহুদিন আপনি।"

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাহেবের সেক্রেটারী তাঁর মনিবের দিকে চেয়ে।

বললাম, "কি দেখছেন অমন ক'রে?"

"বাঃ, একেবারে চেনাই যায় না! বেশ মানিয়েছে কিন্তু।"

"কৈ, আপনি ত শক্ড্ হয়ে ভিরমি গেলেন না?"

"ভিরমি যাব কোন্ দুঃখে। বরং ইচ্ছে করছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি ওঁর দু-পায়ে।"

হেঁকে উঠলেন সাহেব, "তাহলে আমিই ভিরমি যাব যে। সবাই মিলে ওরকম করে আমায় ক্ষেপালে—"

"ক্ষেপতে আর বাকি আছে কতটুকু? আমাকে একটা খবর না দিয়েই পালিয়ে এলে যে বড়?"

ভাবলাম, এবার উঠল বুঝি ঝড়। না ঠিক তার উল্টোটি হ'ল। সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটলেন পাশের ঘরে রক্তবস্ত্র পাল্টে আসতে। বলতে বলতে গেলেন—"আরে না না। পালিয়ে আসব কেন। এমনিই মনটা ভাল লাগল না, তাই—বুঝলে কি না, তুমি হয়ত তখন ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে বিরক্ত না ক'রেই—"

বললাম, "বসুন।"

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। আধ মিনিট মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি

আন্দাজ করলেন। বোধ হয় সারা দুপুর তাঁর মনিবের সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে তার কিছুটা ঠাওরালেন মনে মনে। শেষে এক ফালি ম্লান হাসি হেসে বললেন, "দেখলেন ত ব্যাপারটা! কলেজ থেকে লোক এল ডাকতে। আকাশ থেকে পড়লাম। সে কি! কলেজে নেই! তবে গেলেন কোথায়? কি দুর্ভাবনায় যে পড়ে গেলাম। তারপর ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

"কি ক'রে সন্দেহ করলেন যে এখানেই এসেছেন।"

দু-মিনিট চুপচাপ। মাটির দিকে চেয়ে আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। তারপর একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "আমি ত আপনার অনেক ছোট। আমাকে দয়া করে তুমি বলতে পারেন না!"

বললাম, "বয়সে ছোট হ'লে কি হবে। মাইনে বেশী পান, চাকরিও আপনার আমার চেয়ে অনেক দিনের পুরোনো, তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসী আপনি মনিবের।"

মাটির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিশে গেল। শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল দুটি কথা—"তাই বটে।"

বললাম, "দুঃখ করছেন না কি? আমাদের আলাদা সুখ দুঃখ থাকতে নেই। মনিবের মান অপমান সুখ দুঃখই আমাদের সব।"

আবার দু'চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। চক্ষু দুটি জলে টলটল করছে।

বললাম, "ওটাও সামলে রাখুন। পরে অনেক কাজে লাগতে পারে। কিন্তু আমাদের আজকের এই আলাপের বিন্দু-বিসর্গও যেন সাহেব জানতে না পারেন।" তিনি মাথা নাড়লেন। ডক্টর ঘরে ঢুকলেন নেকটাই বাঁধতে বাঁধতে, "তাহলে এবার চলি। আজ আপনার দুপুরের বিশ্রামটাই মাটি হয়ে গেল। জানলে অরুণা, একরাশ শাস্ত্রচর্চা করা গেল সারা দুপুর। বই-টই পড়ে ছাই বুঝি আমরা, ওঁদের মত নাড়াচাড়া না করলে ও সব তন্ত্র-মন্ত্রের কোনও মানেই বোঝা যায় না। বাপ্‌স্, লোকটি সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। এখানে বসেই সব দেখতে শুনতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আসি তাহলে আজ, নমস্কার।"

সাহেবের সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারীও বেরিয়ে গেলেন। আর যাবার আগে আজ পর্যন্ত যা কোনও দিন করেন নি তাই ক'রে গেলেন, হঠাৎ ঢিপ ক'রে আমার পায়ের ওপর মাথা ঠুকে এক প্রণাম।

•

সন্ধ্যারতির পর মনোহরকে দেখতে পেলাম না সেদিন। নিত্য হাজির থাকে, আরতির পর পঞ্চপ্রদীপের শিখায় দু'হাত তাতিয়ে মুখে মাথায় বুলোয়। আজ সে নেই। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল। রাশি রাশি মিথ্যে কথা আজ আর শুনতে হবে না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

ভোররাতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে। সারা বাড়ীটায় যে যেখানে ছিল সবাই চেঁচাচ্ছে। তখনও অন্ধকার, কালীময় মঙ্গল আরতির ঘণ্টাটা তখনও বেজে চলেছে ঢং ঢং ক'রে থেমে থেমে। পথ দিয়ে স্নানার্থীরা চলেছে সুর ক'রে স্তব পাঠ করতে করতে। গোলমালটা এগিয়ে এসে আমার ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হ'ল। তারপর দরজায় ধাক্কা।

এত ভোরে আবার হ'ল কি! চুরি-ফুরি হ'ল নাকি বাড়ীতে!

দরজা খুলে দেখি বাড়ীসুদ্ধ সবাই উপস্থিত।

এক সঙ্গে সকলে কথা বলছেন। কিছুই মাথায় ঢুকল না। মিনুর মা একটি বউকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

"দেখুন বাবা দেখুন—সর্বনেশেটা কি ক'রে গেছে দেখুন একবার।"

দেখলাম। সামনে দাঁড়িয়ে মনোহরের বউ। শাড়ীখানা রক্তে রাঙা। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। ডান দিকের ভুরুর ওপর থেকে এক খাবলা মাংস উঠে গেছে।

শুনলামও। কাল সন্ধ্যার পর মনোহর ঘরের টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি সমস্ত নিয়ে যখন রওনা হচ্ছে সেই সময় বউ বাধা দিতে যায়। ফলে বউ-এর এই

অবস্থা। বাবাজী সব গুছিয়ে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও দেখা নেই। সারা রাত কোনও রকমে কাটিয়ে অন্ধকার থাকতেই বউটা ছুটে এসেছে আমার কাছে।

সে কাহিনী শুনছি, এমন সময় যেন আগুন লাগল নিচে।

"ওগো—আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো।" হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে কে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

গাঙ্গুলী গিন্নী !

কাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর ভাইঝিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

দুই আর দুই যোগ করলে কি হয় ?

নিমেষের মধ্যে ঠিক ক'রে ফেললাম যোগ-ফল। তৎক্ষণাৎ ওঁদের সকলকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিচে নেমে গেলাম। এখনই একটা লোক পাঠাতে হবে শঙ্করীপ্রসাদের কাছে।

রাস্তার ধারের ঘরটায় চাকর ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তোলবার জন্তে তার দরজায় ঘা দিচ্ছি—নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো বাড়ীর সামনে এক জাগুয়ার।

গাড়ীর সামনের দরজা খুলে নেমে পড়ল পাগড়ি-পরা তকমা-আঁটা একজন। নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়াল।

লাফিয়ে গিয়ে গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "নেমে কাজ নেই আর এখানে, দয়া ক'রে এখুনই আমায় নিয়ে চলুন হিন্দু ইউনিভারসিটি। গাড়ীতে সব বলছি আপনাকে।"

সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই তাঁর পাশে উঠে বসলাম। নিজেই বললাম চালককে, "চালাও হিন্দু ইউনিভারসিটি।"

তিনি শুধু বললেন, "তাই চল।" গাড়ী ছুটল নিঃশব্দে।

চাপা গলায় তখন বললাম তাঁকে—"কাল সন্ধ্যার পর থেকে আপনার ভাইয়ের বউ কল্যাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া—তিনি আঁতকে উঠলেন, "এঁ্যা—"

"হ্যাঁ—আরও একটু সুসংবাদ আছে। মনোহর কাল সন্ধ্যায় তার বউকে মেরে-ধরে গয়না-গাঁটি সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে।"

আর কোনও আওয়াজ বেরুল না তাঁর গলা দিয়ে। ঘোমটা খুলে দু'চোখ মেলে বোকার মত চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

"আপনার কাছে একটি কথা জানতে চাই। শেষবার কখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে মনোহরের? সে সময় সে কি ব'লে গেছে আপনাকে?"

একটি ঢোঁক গিলে তিনি বললেন—"তবে যে সে কাল সকালে নিয়ে গেল টাকা—দেনা-টেনা শোধ দেবে ব'লে। মানে আজ রাতের গাড়ীতেই ত আমাদের মালদহ যাবার কথা।" আর কিছু তাঁর গলা দিয়ে বার হ'ল না।

"কত টাকা দিয়েছেন তাঁকে।"

রাণী চুপ ক'রে রইলেন—সন্থ-ওঠা রক্তবর্ণ সূর্যের দিকে চেয়ে। দৃঢ়স্বরে বললাম, "মনোহর আর মালদা যাবে না আপনার সঙ্গে। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আপনার ভাইএর বউকে বাঁচানো। চরম সর্বনাশ হয়ে যাবার আগে তাদের ধরতে হবে।"

রাণী সোজা হয়ে বসলেন এবং আবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। দেখলাম তাঁর চোখ জ্বলছে। বললেন—"ঠিক তাই। হয়ত এখনও তাদের ধরা যাবে। বৃন্দাবন ভিন্ন অন্য কোথাও তারা যায়নি। 'বৃন্দাবনে নিয়ে যাব' —একথা না বললে কল্যাণীকে এক পা-ও নড়ানো যাবে না। প্রথমেই বৃন্দাবনে না নিয়ে গেলে সে এমন গোলমাল শুরু করবে যে, তখন তাকে সামলাতেই পারবে না। কোনও লোভেই কল্যাণীকে কেউ সহজে ভোলাতে পারবে না। আমি তাকে ভাল ক'রে চিনি। তার সর্বনাশ করা এত সহজ নয়। একবার যদি ধরতে পারি সেই ছোঁড়াকে তবে—"

দাঁতে দাঁত ঘষবার শব্দ পেলাম পাশ থেকে। রাণী নিজেকে সামলে নিলেন। আর জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"এই যে এসে গেছি। দাঁড় করাও গাড়ী, সামনের ঐ বাঁ-দিকের বাঙলোর সামনে।"

রাণীকে বললাম, "নাম আপনি জানেন—শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা। যাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ আর আপনি—আপনারা দুজন ছাড়া কল্যাণীর একান্ত আপনার জন আর কেউ নেই। তাই এঁর কাছে ছুটে এসেছি। কল্যাণীকে খুঁজে পাবার জন্যে ইনি নরকেও ধাওয়া করবেন এখুনই। চলুন নামি।"

শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। তারপর ছুটলেন তাঁর গাড়ী নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। সেই ভদ্রলোক একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। বলে গেলেন যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন তিনি। তখন বোধহয় আমরা শুনতে পাব—কোন্ পথে কখন কাশী ছেড়ে গেছে ওরা। আর যদি এখনও কাশীতেই থাকে তবে—

যাবার সময় সাহেব একখানা উচ্চশ্রেণীর চাবুক নিয়ে গেলেন।

রাণী আমায় মঠে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁকে বললাম—তৈরী থাকবার জন্যে। হয়ত আজ রাতেই আমাদের বৃন্দাবন রওনা হ'তে হবে। কাশীতে এখনও তারা আছে এ বিশ্বাস করা কঠিন। রাণী সংক্ষেপে জানালেন যে এখনই গাড়ী রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করছেন তিনি। যদি বৃন্দাবনে না-ও যেতে হয় তবু ব্যবস্থা ক'রে রাখা ভাল।

বেলা দশটার মধ্যে শঙ্করীপ্রসাদ সংবাদ নিয়ে ফিরলেন—সেই পুলিশ অফিসারের সাহায্যে। কাল সন্ধ্যার পর আগ্রার প্রথম শ্রেণীর দু'খানা টিকিট পাওয়ার জন্যে কে একজন হাড়হদ্দ চেষ্টা করে ষ্টেশনে। শেষে চাওয়া হয় দ্বিতীয় শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব কটা বার্থ রিজার্ভ থাকায় তাও তারা পায়নি। লোকটি ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা ক'রে পীড়াপীড়ি করে দু'খানা টিকিটের জন্যে। ষ্টেশন মাষ্টার তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন নি। অত তাঁর খেয়াল নেই। তবে তার বয়স যে বেশী নয় এটুকু তাঁর মনে আছে।

রাণী বৃন্দাবনে তাঁর পাণ্ডার কাছে টেলিগ্রাম করলেন যে সেইদিন রাতের গাড়ীতেই তিনি কাশী থেকে রওনা হচ্ছেন। টাকায় কি না হয়। রাণীর কর্মচারীরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী রিজার্ভ করা হয়ে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদকে বললাম শ্রীমতী অরুণাও সঙ্গে যাবেন। তিনি প্রবল আপত্তি তুললেন—"না না, সে আবার সেখানে গিয়ে করবে কি ?"

বললাম, "তাহলে আমারই বা গিয়ে কাজ কি সেখানে ? আপনি একলাই চলে যান। নিশ্চয়ই তাদের খুঁজে পাবেন বৃন্দাবনে। তখন খপ ক'রে কল্যাণীকে ধরে নিয়ে ফিরে আসবেন। আমি অরুণা আমরা দুজনেই আপনার কর্মচারী। বরং এক্ষেত্রে তাঁরই আপনার সঙ্গে থাকা বেশী দরকার। তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারী আপনার—আমি ত শুধু মাইনে-করা পুরুত।"

আমার দিকে একবার রক্ত-চক্ষুতে চেয়ে আর কথা বাড়ালেন না সাহেব।

গাড়ীতে উঠলাম আমরা ছ'জন। রাণী, তাঁর একজন দাসী আর তাঁর ম্যানেজার—আর আমরাও তিনজন, সাহেব, তাঁর সেক্রেটারী আর আমি। আমরা সবাই সেই 'বৃন্দাবন-পথযাত্রী'।

বৃন্দাবনে পৌছে সবাই এক সঙ্গে উঠলাম এক ধর্মশালায়। রাণীর পাণ্ডারা তৈরী হয়েই ছিল। এবার রাণী তাঁর প্রভাব আর প্রতিপত্তি দেখালেন। মথুরায় আর বৃন্দাবনে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হোক—কোথাও এই রকমের দুজনকে পাওয়া যায় কিনা! দুই গুষ্টি পাণ্ডা নামল কোমর বেঁধে। রাণীর শ্বশুরকুল আর বাপের কুল—দুই বংশের দুই পাণ্ডা-বংশ হন্যে হয়ে লেগে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদ এনেছিলেন এখানকার পুলিশের কর্মকর্তাদের নামে চিঠি। রাণী হাত জোড় ক'রে তাঁকে নিবারণ করলেন। তাঁর ভাইয়ের বউ কল্যাণী, তাঁর পিতৃবংশের মাথা কাটা যাবে যদি কথাটা পাঁচ কান হয়। অন্ততঃ একটা দিন তিনি সময় চান। তার মধ্যে যদি কল্যাণীকে না পাওয়া যায়, তখন যা ইচ্ছে করতে পারেন শঙ্করীপ্রসাদ।

সুতরাং সাহেব শুধু ঘর-বার করতে লাগলেন ঘণ্টা দুয়েক। তারপর সংবাদ এল।

বৃন্দাবনেই এক ধর্মশালায় দরজা বন্ধ ক'রে বসে আছে একটি বউ। কিছুতেই দরজা খুলছে না সে। যে লোকটি তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল, প্রথম দিন সন্ধ্যার পরই জোর ক'রে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে বউটি, এখনও পর্যন্ত সে দরজা কেউ খোলাতে পারেনি। বাইরে থেকে যত রকমের চেষ্টা করা হয়েছে—তার কোনটাই ফল দেয় নি। ঘরের ভেতর থেকে একই উত্তর আসছে—"না, তোমায় আমি কিছুতেই দরজা খুলে দেব না। তুমি আমার সে শ্যাম নও। আমার কৃষ্ণ-কিশোরকে এনে দাও, তবেই দরজা খুলব।"

ঘরের ভেতর কখনও শোনা যাচ্ছে ভজন, কখনও হাসি, কখনও কান্না। ধর্মশালার কর্মচারীরা ভেবে পাচ্ছে না—কি করা উচিত। এটুকু তারা বুঝেছে যে মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক, ঘরের মধ্যে যিনি দরজা বন্ধ ক'রে রয়েছেন, তিনি ঘরোয়ানা ঘরের বউ। কিন্তু উপোস ক'রে কতক্ষণ বাঁচবে বউটি?

যমুনা নদীর ধারে বেশ নির্জন জায়গায় ধর্মশালাটি। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন বিস্তর লোক জমা হয়েছে সেখানে। চোখ রাঙিয়ে পাণ্ডারা সকলকে সরিয়ে দিলে। দোতালার একখানা দরজা-বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর কে কাঁদছে সুর ক'রে। কান্না নয়—ভজন গাইছে। গাইছে কাঁদতে কাঁদতেই—"ওগো নিঠুর, এতেও তোমার দয়া হ'ল না! দাসীর দুঃখ তুমি বুঝলে না! তোমায় পাবার উপযুক্ত প্রেম যে আমার বুকে নেই। তাই শুধু একবিন্দু প্রেম ভিক্ষা চাচ্ছি আমি তোমার কাছে। ওগো পাষাণ—লোকে যে তোমায় প্রেমময় বলে। দাসীকে একবিন্দু প্রেমও কি তুমি ভিক্ষা দিতে পারো না?"

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। আছড়ে গিয়ে পড়লেন তিনি [illegible] দরজার গায়ে। দু'হাত চাপড়াতে লাগলেন দরজার ওপর—"কল্যাণী,

কল্যাণী, দরজা খোল, দরজা খোল আগে। আমি, আমি এসেছি কলী।" আর কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে, শুধু দুমদাম ঘা দিতে লাগলেন দরজার গায়ে।

গান বন্ধ হ'ল। দরজার ঠিক পেছন থেকে প্রশ্ন হ'ল প্রায় চুপি চুপি—

"তুমি কে—কে তুমি?"

শঙ্করীপ্রসাদ নিজের দেহ মুখ মাথা সর্বাঙ্গ দরজার গায়ে চেপে ধরেছেন। আমরা যে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, এ জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই। তিনি চুপি চুপি বলতে লাগলেন দরজার গায়ে মুখ চেপে—"আমি আমি কলা, আমি তোমার ভুলুদা। আগে দরজা খোল কলী—নয়ত মাথা খুঁড়ব এই দরজার গায়ে। খোল, খোল বলছি দরজা—এই আমি মাথা খুঁড়ছি।" সত্যিই মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করলেন দরজার গায়ে ডক্টর সাহেব।

ভেতর থেকে ধমকের স্বর শোনা গেল—"আঃ, কি করছ ভুলুদা। বাব্বা বাব্বা—কি মানুষ বাপু তুমি। এতদিন পরে মনে পড়ল। এই খুলছি, খুলছি আমি দরজা, কিন্তু তুমি ঠেলে থাকলে খুলব কেমন ক'রে!"

ভেতরের খিল আছড়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। টাল সামলাতে পারলেন না শঙ্করীপ্রসাদ। গিয়ে পড়লেন কল্যাণীর গায়ের ওপর। দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরলেন। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত—

রাণী গিয়ে ধরলেন কল্যাণীর কাঁধ চেপে। "বউ, ও বউ", বলতে বলতে দুই ঝাঁকানি দিলেন তার কাঁধ ধরে। চমকে উঠে কল্যাণী ছেড়ে দিলে শঙ্করীপ্রসাদকে। যেন সদ্য ঘুম ভাঙ্গল তার। তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের চাদর খুলে তার আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলেন রাণী। চোখ দিয়ে কি ইসারা করলেন তাঁর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার নিচু গলায় কি বললেন পাণ্ডাদের। পাণ্ডারা ওঁদের ঘিরে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

আমরাও নেমে এলাম। কিন্তু আমরা ধর্মশালা থেকে বার হয়ে আর তাঁদের ধরতে পারলাম না। পাণ্ডাদের একখানা মোটর গাড়ীতে ক'রে উধাও

হয়ে গেলেন তাঁরা। আস্তানায় ফিরে এসে আমরা দেখলাম যে রাণী, কল্যাণী বা ম্যানেজার কেউ ফেরেন নি। আবার ঘর-বার করতে লাগলেন ডক্টর সাহেব। গেলেন কোথায় তাঁরা? অবশেষে তাও জানা গেল। একঘণ্টা পরে রাণীর চিঠি নিয়ে ম্যানেজার উপস্থিত হলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

রাণী এক সঙ্গে আমাদের তিনজনকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন যে, আপাতত তাঁরা বৃন্দাবনে থাকবেন ঠিক করেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না ব'লে দুঃখ জানিয়েছেন। এটুকুও দয়া করে লিখেছেন যে, আবার যখন কাশীতে যাবেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের স্মরণ করবেন তিনি। আমাদের কাশী ফিরে যাবার গাড়ীভাড়া তিনশ' টাকাও পাঠিয়েছেন তাঁর ম্যানেজারের হাতে।

লাল হয়ে উঠল সাহেবের মুখ। অপমানের এত বড় ধাক্কা সত্যিই তাঁর পক্ষে সামলানো শক্ত। ম্যানেজার বাবুকে বললাম—টিকিট ইতিমধ্যেই আমাদের কাটা হয়ে গেছে। সুতরাং টাকা নিতে পারলাম না ব'লে আমরা দুঃখিত।

তৎক্ষণাৎ স্টেশন।

আগ্রায় পৌঁছে হোটেলে শঙ্করীপ্রসাদ মুখ খুললেন—"চলুন তাজ দেখে আসি। আজ আর ফেরবার গাড়ী নেই।"

তাজের কাছে পৌঁছতে সন্ধ্যা হ'ল। মাত্র এক আনা আন্দাজ ক্ষয়ে যাওয়া মস্ত একখানা চাঁদ তাজের মাথার ওপর এসে দাঁড়াল সেই সময়। আমাদের তাজ প্রদক্ষিণ সুরু হ'ল। তিন জনেই নির্বাক। চরম অপমান মানুষকে মূক ক'রে ফেলে। সত্যিই ত রাণী তাঁর ভাইয়ের বউকে সামলাবেন —এ-ত একান্ত স্বাভাবিক! ঐ তিনশ টাকা দিতে আসাটাও এমন কিছু নয়। সামর্থ্য থাকতে কেন তিনি দেবেন না আমাদের ফেরবার গাড়ীভাড়া! আমরা নিছক পর বই ত নয়! না হয় এসেছি তাঁর সঙ্গে তাঁর একটু বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল ব'লে। তাও তাঁর টাকায় রিজার্ভ করা গাড়ীতে এসেছি। তা

ব'লে ফিরে যাবার ভাড়াটা যদি তিনি না দেন—তবে সেটা যে তাঁর সম্মানে লাগে। সুতরাং—

সুতরাং কিছুমাত্র অন্যায় তিনি করেন নি। তবু তাঁর এই একান্ত ন্যায্য কর্মটি এমন এক নিরীহ জাতের থাপ্পড় লাগিয়েছে আমাদের মুখের ওপর যে, তার জ্বালাটুকু সহজে ভোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। কথা কইতে গেলে পাছে সেই জলুনির কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে—এজন্যে তিনজনই মৌনব্রত অবলম্বন করেছি।

তাজ থেকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ একটি প্রশ্ন করলাম আমার মনিবকে।

"আচ্ছা বলুন ত—স্ত্রীর কাছ থেকে কি পেলে তবে পাওয়াটা সার্থক হল ব'লে বিবেচনা করা যায়?"

আচমকা এই প্রশ্নে ওঁরা দুজনেই চাইলেন আমার দিকে। তখন আবার আরম্ভ করলাম—"একটানা দশ বছর ধরে সেবা দিয়ে সাহচর্য দিয়ে এমন কি নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ভুলে গিয়ে যে নারী ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে মুখ টিপে ঘুরে মরেছে—সে হ'ল মাইনে নেওয়া চাকরাণী। হায় রে, আলেয়ার পেছনে ছুটে মরা আর কাকে বলে!"

আমার আর অরুণার মাঝখানে হাঁটছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। গেটের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। রূপালী আলোয় তাজের পাষাণে হয়ত আজও প্রাণ আছে। কিন্তু আমাদের মনের যে দগদগে অবস্থা তাতে প্রলেপ দিতে পারলে না প্রাণময়ী পাষাণী তাজ। তাই আমরা পালাচ্ছি তাজের কাছ থেকে।

শঙ্করীপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সেক্রেটারীকে।—

"অরুণা, আজ কত তারিখ?"

"উনিশ, উনিশে ফেব্রুয়ারী।"

"ঠিক এতক্ষণ খেয়াল করতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা মনে পড়ে তোমার অরুণা সেদিনটার তারিখ, যেদিন ফাদার উইলসন তোমাকে আমার হাতে তুলে দেন?"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হল—"তেসরা মার্চ বোধ হয়।"

বহুদূর থেকে যেন বলছেন শঙ্করীপ্রসাদ—"তেসরা মার্চই বটে। সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ সাল। আজ হচ্ছে উনিশ শ' সাঁইত্রিশ"—

বেশ কয়েক পা আমরা এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে। যেন নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন ডক্টর সাহেব—"যে ভুল করেছি তা আর কিছুতে শোধরাবার নয়। এগারটা বছর অনর্থক গড়িয়ে চলে গেছে। এতবড় লোকসান অরুণা ভুলতে পারবে না কিছুতেই।"

ঝপ্ ক'রে ব'লে ফেললাম, "খুব পারবেন।"

"কিন্তু কেন? কিসের জন্যে সব জেনে শুনে আমার মত একটা অপদার্থকে স্বামী ব'লে নিতে যাবে অরুণা?"

আমিই উত্তর দিলাম, "কেন বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনি? আজ পর্যন্ত ক-টা ব্যাপারে আপনি তাঁর সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন? মুখ বুজে নির্বিচারে আপনার ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ সব আদেশ সব আব্দার যদি দশ বছর ধরে সহ্য করতে পেরে থাকেন, তাহ'লে আজও পারবেন। আপনি আপনার দাবীটা করুন না চোখ-কান বুজে। তারপর আমি আছি কি করতে? একটা শক্ত গোছের বশীকরণ ক'রে দোব।"

একান্ত সংকোচের সঙ্গে সন্তর্পণে তাঁর সেক্রেটারীর একখানি হাত তুলে নিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। সেক্রেটারীর মুখখানি তখন প্রায় বুকের কাছে এসে ঠেকেছে। সাক্ষী রইল দুজন—তাজমহলের প্রাণ যে নারী, সেই নারী আর মাথার ওপরে প্রায় ষোল আনা পূর্ণ একখানা চাঁদ। আর আমি—সাহেবের মাইনে করা পুরুত। বিবাহের মন্ত্রটা আগে শিখিনি। শেখা থাকলে দু-একটা আওড়ে কিছু ফালতু দক্ষিণাও পাওয়া যেত বোধ হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল, একখানি মাত্র টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে আগে চড়ে বসলাম তার পিছন দিকে। গাড়োয়ানকে বললাম, "জলদি হাঁকাও শেখ সাহেব, বহুত জলদি। ট্রেন পাকড়ানে হোগা।"

ওরা দু'জনেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠলেন। অরুণা মানে শ্রীমতী শর্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সে কি, আমরা যাব না?"

"আপনারা পরে আসুন। আরও গাড়ী পাবেন, এই ত সবে সন্ধ্যে। আমার তাড়া আছে। আধঘণ্টা পরে একখানা ট্রেন আছে। সেটা ধরতে পারলে কাল সকালেই দিল্লী পৌছতে পারব?"

ডক্টর আঁতকে উঠলেন—"দিল্লী! দিল্লী কেন?"

শ্রীমতী শর্মা প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "তার মানে, আপনি কাশী যাবেন না আমাদের সঙ্গে?"

গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম—"কি ক'রে ফিরি বলুন কাশী? হতভাগা মনোহরটাকে নিয়ে না ফিরলে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সেই একরত্তি বউটার সামনে? আপনি দয়া ক'রে তাকে রক্ষা করবেন, তার আর কেউ নেই।"

আকুল হয়ে ব'লে উঠলেন আমার মনিব সাহেব—"আমাদেরও যে আর আপনার বলতে কেউ রইল না এ জগতে—' শেষটুকু কান্নার মত শোনাল।

তাঁর কথার শেষ উত্তর দেবার আর অবকাশ পেলাম না।

টাঙ্গার ঘোড়াটি আদত পক্ষীরাজ জাতের। রাশীকৃত ধুলো উড়ে ওঁদের দুজনকে আড়াল ক'রে ফেললে।

৪

ফক্কড়—লক্কড়—টিক্কড়।

লক্কড় হচ্ছে চেলা কাঠ। তিনখানা জুটলেই যথেষ্ট। আরও জোটাতে হবে পোয়া-দেড়েক আটা। কৌপীনের ওপর যে ন্যাকড়ার ফালিটুকু কোমরে জড়ানো থাকে সেখানি কোমর থেকে খুলে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর জল দিয়ে মাখতে হবে আটাটুকু, বানাতে হবে দুটো থ্যাবড়া থ্যাবড়া চাকার

মত জিনিষ। এইবার লক্কড় তিনখানিতে আগুন জ্বেলে তাতে সেঁকে নাও সেই আটার চাকতি দুটো। হ'য়ে গেল টিক্কড় বানানো। রামরস সহযোগে সেই টিক্কড় চিবিয়ে ফক্কড় বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার দায়ে দিনান্তে দেড় পোয়া আটা আর তিনখানি চেলা কাঠ মাত্র দাবী করে ফক্কড়। তার বেশী সে চায়ও না, পায়ও না।

ফক্কড়-তন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন ফক্কড় কখনও ঝপ্পড় বাঁধবে না। ঝপ্পড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজে বসলে তার ফক্কড়ত্ব নষ্ট হ'য়ে যাবে। ফক্কড় আমৃত্যু অনিকেত। 'চলতা পানি রমতা ফকির'। জলের স্রোতের মত ফকিরও গড়িয়ে চলবে। যে পাথর অনবরত গড়ায় তার গায়ে শেওলা ধরার ভয় নেই।

শেওলা ধরা দূরে থাক, মশা মাছি পিঁপড়েও বসে না ফক্কড়ের শরীরে। রসকষ-শূন্য পোড়া কাঠের ওপর কিসের লোভে বসবে তারা? এক ফালি ন্যাকড়া জড়ানো কোমরে, বড় জোর আর এক ফালি আছে কাঁধের ওপর, সর্বাঙ্গে ছাই-ভস্ম মাখা, লাল সাদা হলদে নানা রঙের তিলক ফোঁটা আঁকা কপালে, এক মাথা রুক্ষ জট-পাকানো চুল এই রকমের মূর্তির ওপর মশা মাছি বসে না, রোগ ব্যাধি দূরে সরে থাকে, সাপ-বিছেরাও ভয় পায় এদের কাছে ঘেঁষতে।

এই হতচ্ছাড়া বীভৎস জীবেরা নিজেরা নিজেদের বলে ফক্কড়। এদের দিকে তাকিয়ে বৈরাগ্যের বিপুল মহিমা লজ্জায় অধোবদন করে। আত্মবঞ্চনার আত্মপ্রসাদে মশগুল হ'য়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষার জয়ধ্বজা কাঁধে নিয়ে এই সর্ব-হারার দল ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করে।

যোগে যাগে মেলায় তীর্থস্থানে হামেশা নজরে পড়ে ফক্কড়। তীর্থময় এই দেশের যেখান দিয়ে যে ট্রেনখানিই ছুটুক তাতে অন্ততঃ সিকি ভাগ যাত্রী যে তীর্থ দর্শনে চলেছেন—এ কথা চোখ বুজে বলা যায়। তেমনি অন্ততঃ কুড়ি-দুরেক ফক্কড়ও যে লুকিয়ে চলেছে সেই গাড়ীতে এও একেবারে স্বতঃসিদ্ধ।

রেলের লোক টিকিট দেখতে গাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই পায়খানার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখবে কোনও ফক্কড় সেখানে বসে আছে কি না। তারপর সব ক-টা বেঞ্চির নিচে পা চালাবে। যদি কিছু ঠেকে তখন পায়ে তা'হলে বুট-সুদ্ধ পা দিয়ে গুঁতিয়ে দেখবে কিছু নড়ল কি না। নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে একজনের পর আর একজন বেরিয়ে আসবে তখন লোকচক্ষুর সামনে।

সামনের স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালে ধাক্কা গুঁতো দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হবে তাদের। হয়ত তখন অর্ধেক রাত্রি, ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে, সেই স্টেশনের দশ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নেই। কিংবা স্টেশনটি মরুভূমির মাঝখানে, তেষ্টায় ছাতি-ফেটে মরে গেলে একবিন্দু জল মিলবে না। হয়ত বিশাল জঙ্গল আর পাহাড়ের ভেতর স্টেশন, স্টেশন থেকে বার হ'লেই পড়তে হবে বাঘের কবলে। তা হোক, তাতে কিছুই যায়-আসে না ফক্কড়ের।.

ফক্কড় কখনও টিকিট কাটে না। যে বস্তুর বদলে টিকিট মেলে সে বস্তু সভয়ে ফক্কড়কে এড়িয়ে চলে। টিকিট না কেটে চার ধাম আর চৌষট্টি আড্ডা ঘুরছে ফক্কড়। একবার দু'বার তিনবার—যতবার খুশি ঘুরছে—আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। যে যতবার ঘুরেছে চার ধাম আর চৌষট্টি আড্ডা ফক্কড় সমাজে তার সম্মান তত বেশী।

বড় বড় ধর্মমেলায় ফক্কড়েরা গিয়ে না জুটলে মেলাই জমবে না। তীর্থস্থানে গিয়ে ফক্কড় না দেখতে পেলে লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা তেমন আসেনি ব'লে সকলে মুখ বাঁকায়। পাপক্ষয়ের জন্যে তীর্থে যাওয়া, আবার কিছু পুণ্যার্জনের জন্যে তীর্থে দান ধ্যান করা। ঘরে বসে রাস্তার ভিখারীকে কিছু দিলে যেটুকু পুণ্য ক্রয় করা যায়—তার চেয়ে ঢের বেশী মুনাফা হয় তীর্থে গিয়ে সাধু সন্ন্যাসীর দিকে পয়সা ছুঁড়লে। কিন্তু সেই সাধু সন্ন্যাসীদেরই দর্শন যদি না মেলে তীর্থস্থানে বা কুম্ভস্নানে গিয়ে—তা'হলে লোকে দান ধ্যান করবে কাকে! কাজেই মেলায় ভিড় জমবার জন্যে রেলের কর্তারা ফক্কড়ের ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন লটকান।

প্রকাণ্ড মেলার মাঝখানে সকলের চোখের সামনে রাশীকৃত বেল-কাঁটার ওপর শুয়ে যিনি তপস্যা করছেন, চাকা লাগানো একখানা কাঠে ছুঁচোলো মাথা একশ' গণ্ডা লোহা পুঁতে তার ওপর মহা আরামে শুয়ে যিনি ধ্যান লাগিয়েছেন, যে রাস্তায় জনতা সব চেয়ে বেশী সেই রাস্তার পাশে গাছের ডালে পা বেঁধে হেঁট মুণ্ডে ঝুলে যিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করছেন কিংবা সারা শরীর মাটির তলায় পুঁতে মাত্র একখানি হাত বার ক'রে যিনি অনায়াসে বেঁচে রয়েছেন সেই সব মহাপুরুষদের চাক্ষুষ দর্শন লাভের জন্যেই তীর্থে যাওয়া, যোগে যাগে মেলায় ভিড় করা। কাজেই ফক্কড় না জুটলে মেলার মেলাত্বই মাঠে মারা যায় যে।

কিন্তু কোনও মেলায় এদের জন্যে কেউ মাথা ঘামায় না। হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না ফক্কড়দের। ধর্মশালায় এদের প্রবেশ নিষেধ। গৃহস্থের সুখ-সুবিধা আরামের জন্যে গৃহস্থ ধর্মশালা বানায়, ফক্কড় কোথাও ধর্মশালা বসায় নি। ফক্কড় থাকবে কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব—ধর্মের ষাঁড়েরা তীর্থস্থানে বা ধর্মমেলায় কোথায় থাকে? ফক্কড় থাকবে গাছতলায়, তাও যদি না জোটে, থাকবে খোলা আকাশের তলায়। আর যাত্রীর ভিড়ে যদি কোথাও এতটুকু স্থান না থাকে, তখন ওদের মেলার বাইরে বার ক'রে দেওয়া হবে।

এইভাবে ফক্কড়ের দিন কাটে, রাত কাবার হয়, পেট ভরে, তৃষ্ণা মেটে। তারপর একদিন ফক্কড় মিলিয়ে যায়, বেমালুম 'হাওয়া' হয়ে যায়। কারণ ফক্কড় মরে না কখনও, ও কর্মটি সম্পাদন করবার জন্যে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শয়নের স্থান আবশ্যক। অতবড় বিলাসিতা ফক্কড়ের কপালে আকাশকুসুম তুল্য। ফক্কড়ের বরাতে মরাও ঘটে ওঠে না। ওরা একদিন রাম পেয়ে যায়। ওদের ভাষায় "রাম মিল গিয়া।" ব্যাস, আর কিছু না।

এই হচ্ছে পেশাদার ফক্কড়ের স্বরূপ।

অ-পেশাদার ফক্কড় চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বা বিয়ে না করা পর্যন্ত পাড়ার রকে ব'সে, সভায় গিয়ে, খেলার মাঠে জুটে বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ফাঁদ

পেতে ঘরের খেয়ে ঘরের পরে' ফক্কুড়ি চালিয়ে যান। তারপর যখন সংসারে ঢুকে ফক্কুড়ি পরিত্যাগ করেন তখন তাঁদের অনুবর্তীগণকে দেখে ব্যাজার হন। চোখ পাকিয়ে ব'লে বসেন—"ফক্কুড়ি করবার আর জায়গা পাওনি না হা ছোকরা।"

ফক্কড়-তন্ত্রের আর একটি নিয়ম হ'ল, যে ছোকরাটি সবে মাত্র এই পথে পা দিলে, তাকে হাতে ধরে সব কিছু শেখাবেন ঝানু ফক্কড়। নিজের দুখানা টিক্কড়ের একখানা অম্লানবদনে নবদীক্ষিতের মুখে তুলে দেন পাকা ফক্কড়। অনেক সময় নতুন ফক্কড়ের অর্জিত লাঞ্ছনা গালাগালি বা প্রহারটুকু পর্যন্ত পিঠ পেতে নিয়ে তিনি তাকে রেহাই দেন। এই সমস্ত দেখে সন্দেহ হয় যে ফক্কড়েরও হৃদয় বলে একটা কিছু বালাই আছে। কে জানে! কিন্তু হৃদয় থাকুক না থাকুক ফক্কড়ের জীবনেও যে অনেক সময় অনেক রকমের মজা জোটে তার একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী আমি। কারণ বেশ কিছুদিন আমি পেশাদার ফক্কড় ছিলাম।

কেন ফক্কড় হ'তে গিয়েছিলাম, কি লোভে ফক্কড় হয়ে কি লাভ হয়েছে আমার—এ সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব না কিছুতেই। লাভ কিছু না হোক, লোকসান যে কিছুই হয় নি আমার, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। ঘুরেছি দেখেছি আর দেখেছি ঘুরেছি। সে বড় মজার দেখা দেখেছি এই দুনিয়াটাকে, ফক্কড়ের চোখ দিয়ে। মরে যাবার পর মরা-চোখের দৃষ্টি দিয়ে এতদিনের চেনা-জানা এই দুনিয়াটাকে কেমন দেখতে লাগবে, মানুষের গড়া সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা আর সংস্কৃতি তখন কোন্ রঙে রঙীন দেখব তা জ্যান্ত অবস্থাতেই ফক্কড় হয়ে দেখা হয়ে গেছে আমার। যাঁরা জ্ঞানী আর হিসেবী মানুষ তাঁরা বলবেন—"তাতে কার মাথাটি কিনেছ বাপু তুমি? মূল্যবান সময়টুকু ওভাবে অযথা অপব্যয় না ক'রে দু' পয়সা উপরি উপার্জন আছে এমন একটি চাকরি জুটিয়ে কিছু কামিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে

পারতে।" মূল্যবান হক্ কথা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু করবার মত কিছু না জোটার দরুনই যে ফক্কড় হ'তে গিয়েছিলাম। আর ফক্কড় হয়ে কপালে যা জুটল তাতে এমনই মজে গেলাম যে তখন ভবিষ্যতের চিন্তাটি একবারও মনের কোণে উদয় হ'ল না। ফক্কড় জীবনের মজাই হচ্ছে ঐটুকু। মানুষ যখন ফক্কড় হয় তখন আর তার ভবিষ্যৎ থাকে না। দৈহিক আয়াস আরামের কথা বাদ দিলে সেইটুকুই হচ্ছে ফক্কড়ের আসল সান্ত্বনা। বেঁচে থাকার আনন্দ সজ্ঞানে ষোল আনা উপভোগ করতে হ'লে ভবিষ্যৎ ভোলা চাই। ভবিষ্যৎ ভূতের ভয় বুকে নিয়ে মজা লোটা অসম্ভব।

সকলেই খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে রোজগারের চিন্তা করছে কিংবা অপরে কেন তার মনের মত হয়ে চলছে না এই নিয়ে হা হুতাশ করছে। কিন্তু নিজে যে বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে এই সামান্য কথাটি দিনে-রাতে ক'বার মনে পড়ছে কার! গৃহিনী যখন উনুন ধরাতে গিয়ে ঘুঁটের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই করে দেন তখন একবার বেঁচে থাকার কথাটা স্মরণ হয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ব'লে চিৎকার ক'রে উঠি 'দম আটকে মারা গেলাম যে'। নয়ত বদ্যি এসে নাড়ী ধরে ঘাড় না নাড়া পর্যন্ত বেঁচে যে ছিলাম বা সমানে অনবরত নিঃশ্বাস যে নিচ্ছিলাম এ কথাটি মনের কোণেও একবার উদয় হয় না।

কিন্তু আমার সেই ফক্কড় জীবনে প্রতি মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছে যে সশরীরে বেঁচে আছি। বেঁচে থেকে মৃত্যুকে চাখা বা মরে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করাই ফক্কড়ত্বের আসল লাভ। এই লাভটুকু কি সত্যই তুচ্ছ করবার মত বস্তু!

এখন আর আমি ফক্কড় নই। একদা যাঁরা আমার পরমাত্মীয় ছিলেন সেই সারা ভারতের অসংখ্য ফক্কড়রা এখন আর আমায় চিনতেও পারেন না। সামনা-সামনি পড়ে গেলে পাশ কাটান। আমার আর তাঁদের মাঝে সন্দেহ অবিশ্বাসের উঁচু পাঁচিলটা মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ফক্কড়-তন্ত্রের সর্বপ্রধান অনুশাসনটি অমান্য ক'রে ঝপ্পড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজেছি যে

এখন। ভাল করেছি না মন্দ করেছি এ প্রশ্ন না তুলে এ কথা মানতে বাধ্য যে ঝপ্পড়ের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট যা জুটেছে তার তুলনায় সেই কৌপীন-সম্বল ফক্কড়ের জীবনে আনন্দ ছিল। সুখ না থাকুক স্বস্তি ছিল তখন। এখন সুখের মুখ ত দেখতেই পাই না, ঝামেলার উৎপাতে প্রাণ যাবার দাখিল হয়েছে। পদে পদে বাইরে ও ভেতরে বেধড়ক ঠক্কর খাচ্ছি। কিন্তু আর একবার সেই ফক্কড় জীবনে ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না যে!

যায় না, তার কারণ আমি বাঙালী। ফক্কড় হবার জন্যে সর্বাগ্রে যে কর্মটি করা প্রয়োজন তা শুধু ঝপ্পড় ছাড়া নয়, একেবারে বাঙলা দেশ জন্মের মত ত্যাগ করা। বাঙলা ভাষা ভুলেও না মুখে আনা, বাঙালীর খাদ্য ভাত মুখে তোলার দুরাশা মন থেকে মুছে ফেলা। অসংখ্য মঠ আখড়া আশ্রম আছে বাঙলায়, সেই সব আস্তানায় সাধু সন্ন্যাসী মোহন্ত বাবাজীরা পরম শান্তিতে ভাত রাঁধছেন, ভোগ লাগাচ্ছেন। ভাত রান্না করতে স্থান চাই, তোড়জোড় চাই। টিক্কড় পুড়িয়ে খেয়ে বা ছাতু মেখে গিলে বাঙালী বাঁচে না। সেই জন্যেই ঘর ছেড়ে বাঙালী আশ্রম আখড়া বানায়। আর যাদের ভাতের পরোয়া নেই তারা ঘর ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় আশ্রয় নেয়। তাই ফক্কড় কথাটির সঙ্গে টিক্কড় আর লক্কড় বেশ খাপ খায়। ওর একটিকে ত্যাগ করলে অপর দুটির কোনও মানেই হয় না। তাই অবাঙালী ঝট ক'রে ফক্কড় হতে পারে, কিন্তু বাঙালী তা পারে না।

যদিও কেউ পারে তার প্রাণ কাঁদে বাঙলার জন্যে। পুঁই শাক আর সজনে-ডাঁটার জন্যে জিভে জল না এলেও বাঙলার জন্যে বাঙালীর প্রাণ কাঁদবেই, বাঙলা ভাষায় দুটো কথা বলবার জন্যে মনটা ছটফট্ করবেই। তাও বোধ হয় আসল কথা নয়, আসলে যে বস্তুর জন্যে বাঙলার ছেলের প্রাণ কাঁদে তা হচ্ছে এক জাতের গন্ধ, যা শুধু বাঙলা দেশের বাতাসেই মেলে। বর্ধমান না পৌছলে সে গন্ধ পাওয়া যায় না, আর ওধারে সিলেট ছাড়িয়ে শিলং পাহাড়ে পা দিলেই সে গন্ধ হারিয়ে যায়। ঐ গন্ধটুকুই হচ্ছে বাঙালীর জীবন।

থাকুক সেই গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে সব রকমের মারাত্মক রোগের বীজাণু, তবু সেই গন্ধের লোভেই বার বার ছুটে এসেছি বাঙলায়। ভাদ্র মাসের পনেরো বিশ দিন পার হ'লে কেমন যেন একটা আকুলি-বিকুলি উঠত প্রাণের ভেতর। সুদূর কাথিওয়াড়ে বা কন্যাকুমারীতে বসে থাকলেও মন ছুটে আসত বাঙলা দেশে। আর কাছাকাছি গয়া কাশীতে থাকলে ত আর কোনও কথাই নেই। ফক্কড়-তন্ত্রমতে অদৃশ্যভাবে ট্রেনের কামরায় আশ্রয় গ্রহণ। তারপর নামতে উঠতে আর উঠতে নামতে যেটুকু সময় ব্যয় হ'ত, একদিন হঠাৎ দেখতাম বর্ধমানের এধারে পৌঁছে গেছি। তখন পা দুখানা আছে কিসের জন্যে?

আর একটি পথ ছিল বাঙলায় ঢোকার। এলাহাবাদ থেকে ছোট রেলে চেপে লালমনি, লালমনি থেকে সেই গাড়ীতেই আমিনগাঁও। তারপর কামাখ্যা দর্শন ক'রে গৌহাটীতে গাড়ীতে উঠে ভায়া লামডিং বদরপুর—সোজা চন্দ্রনাথ। তখন ছিল আসাম-বেঙ্গল রেল। মাত্র পাঁচ টাকার একখানি টিকিট কেটে একবার গাড়ীতে উঠে কোথাও যাত্রাবিরতি না ক'রে ওই লাইনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছনো যেত।

পাণ্ডুঘাটের স্টেশন-মাস্টারমশাই দু'টাকা উপার্জন করতেন। তিনি কিনে দিলেন একখানি পাঁচ টাকার টিকিট। ঝাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টার ওপর একটানা গাড়ীতে বসে থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে নামলাম।

আকাশে বাতাসে বাজছে মায়ের বোধনের সুর। রক্ত নেচে উঠল ফক্কড়ের পোড়া-কাঠ দেহের মধ্যে, বাঙলার দুর্গাপূজা যে মিশে রয়েছে রক্তের সঙ্গে। প্রায় দশ বছর তখন কেটে গেছে বাঙলার বাইরে। ঠিক করলাম, যে ভাবে হোক এবার থাকবই বাঙলা দেশে বিজয়া দশমী পর্যন্ত।

সারা শহর চষে বেড়ালাম জুতসই একটি আস্তানার খোঁজে। মঠ মন্দির আশ্রম সঙ্ঘ কত যে রয়েছে শহরময় তা গুনে শেষ করা যায় না। ফক্কড় দেখে দূর থেকেই হুঁশিয়ার হয় সকলে। মুখে হিন্দী ছোটে—"যাও, যাও, চলা

যাও—হিঁয়াসে, কুছ নেই মিলেগা।” আবার বিশেষ দয়াল কেউ একটি পয়সা ছুঁড়ে দেন। অর্থাৎ শহর-সুদ্ধ ইতর-ভদ্র সকলের ধারণা হয়েছে যে আমি একটি উড়ে বা মেড়ো। বহুদিন পরে এক পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মূর্তিখানি দর্শন করলাম। বুঝলাম, কাউকে দোষ দেওয়াও যায় না। চুল, দাড়ি, পোড়া কাঠের মত রঙ, চোয়াড়ের মত হনু-উঁচু মুখ, তার ওপর যে চমৎকার বেশভূষা ধারণ ক'রে আছি শ্রীঅঙ্গে—তা দেখে আমায় বাঙালী সন্তান ধারণা করার সাধ্য বোধহয় স্বয়ং বাবা চন্দ্রনাথেরও হবে না।

তখন হঠাৎ একটি উচ্চশ্রেণীর ফন্দি উদয় হ'ল চিত্তে। মা দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে বাঙলা দেশে এসে তিন-চার দিন কাটিয়ে যান প্রতি বছর। খাওয়া-দাওয়া করেন, কাপড়চোপড় বারবার বদলান, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ক'রে স্নানটানও করান দেখেছি, কিন্তু কেউ একটি বারের জন্যে একটিও কথা কন না ত! কেন?

কারণ এ দেশে মুখে ফড়ফড় করাকেই ফাজলামি করা বলে। ফাজলামি যে করে তার নাম ফক্কড়। মুখ চালানো বন্ধ করলে ফক্কড় আর তখন ফক্কড় থাকে না, ভবিষ্যুক্ত লায়েক ব'লে গণ্য হয়। মা দুর্গা ছেলেমেয়ে-কটিকে শাসিয়ে নিয়ে আসেন—“খবরদার কেউ মুখ খুলিস নি আমার বাপের বাড়ীর দেশে, তা'হলে নিন্দে হবে সেখানে। লোকে ফক্কড় বলবে।” কাজেই ছেলে-মেয়েরা থাকে মুখ বুজে, সেই সঙ্গে মা-ও চুপ করে থাকেন।

বাঙলায় এসে কথা বলার ফাঁকও পান না তাঁরা। মূল সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, সম্পাদক, সাধারণ সভ্য ও অসাধারণ অসভ্য তার সঙ্গে ঢাক ঢোল সানাই আর “সবার উপরে যে মাইক সত্য” সেই মাইক—এই সমস্ত মিলিয়ে এত রকমের এত কথা আওড়ানো হয় এক একটি সর্বজনীন-পূজায় যে, মা'র বা তাঁর ছেলে-মেয়ে-ক'টির আর কিছু বলবার দরকারই করে না।

ঠিক করলাম মুখ বন্ধ ক'রে থাকব। নিশ্চিন্তে পূজার ক-টি দিন বাঙলায় কাটাবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মা দুর্গা আর তাঁর ছেলে-মেয়েদের মত মৌনব্রত,

ধারণ ক'রে থাকা। মৌনীবাবার দেদার স্থবিধে। বেঁচে থাকা আর কথা বলা এ দুটি কর্ম এমন ভাবে এক সঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে যে কেউ বেঁচে থেকেও মুখ চালাচ্ছে না, এই রকমের ব্যাপার দেখলে সকলে তাজ্জব বনে যায়। অতি সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল মৌনব্রত নেওয়া. মৌনীবাবা কত দরের সাধু ত' কেউ যাচাই করতে আসে না। স্রেফ ফাঁকি দিয়ে চুপ ক'রে ভগবান বস্তুটিকে হাতের মুঠোয় পোরার উপায় কি, সে প্রশ্ন করার পথ নেই মৌনীবাবার কাছে। যার মুখ বন্ধ তার কাছে লটারি বা রেসে টাকা জেতবার মন্ত্র জানতে চাওয়াও নিরর্থক। ভবিষ্যৎ বাত্‌লাবার আব্দার ক'রে তার নাকের ডগায় হাতের চেটো মেলে ধরাও নেহাত বিড়ম্বনা।

সকলের মাঝে থেকেও মৌনী সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এ যেন নিজেকে সিন্দুকে পুরে ফেলার সামিল। নির্জন স্থান খুঁজতে গভীর জঙ্গলে ঢুকে বাঘ সাপ মশার খপ্পরে পড়বার দরকার কি, ঘরে বসে মৌনব্রত নিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়। দেখবার মত চোখ আর শোনবার মত কান যদি থাকে তা'হলে চারিদিকের হালচাল দেখে শুনে হাজার রকমের মজা পাওয়া যায়। অচেনা অজানা জায়গায় মৌনব্রতীর আর একটি বিশেষ স্থবিধেও আছে। গায়ে ত আর কারও লেখা থাকে না যে সে কোন্ মুল্লুকের মানুষ। মুখ দিয়ে কোনও ভাষা না বার হ'লে কারও ধরার সাধ্য নেই যে মানুষটা বাঙালী মাদ্রাজী না উড়িষ্যাবাসী। উড়ে মেড়ো পাগল বা ভিখারী এই ধরণের কিছু একটা ধারণা হ'লে বাঙালী তখন অবাধে তার সামনে প্রাণের কথা আলোচনা করে। এই সব স্থযোগ-স্থবিধে বিবেচনা ক'রে বাঙলা ভাষায় কথা কইবার লোভ সংবরণ করলাম।

চট্টগ্রাম হচ্ছে তিন তলা শহর। ছোট ছোট টিলার ওপর কাঠ টিন আর ছেঁচা-বাঁশের তৈরী ছবির মত সুন্দর নানা রঙের বাঙলোগুলি হচ্ছে ওপর তলা। ওসব উঁচু জায়গায় দেশী বিলেতী সাহেব মেমসাহেব লোক উঁচুদরের আভিজাত্য বজায় রাখেন। ধারে-কাছে ঘেঁষতে গেলে দামী কুকুরে তাড়া করবে ক্ষড়কে।

তার পরের তলায় বাস করেন বাবুরা, যাঁরা নিজেদের কালচারড্ অর্থাৎ কৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞান করেন। সেই সব পাড়াতেই পূজার ধূমধাম। কিন্তু ফক্কড় দেখলে ওঁরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেন! ওসব পাড়ায় যাওয়া আসা করেন সিল্কের গেরুয়া লুটিয়ে শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রী শ্রীমৎ স্বামী তৎপুরুষানন্দ পরমহংস মহারাজরা। নজর উঁচু বাবু পাড়ার, কানও উঁচু-পর্দায় বাঁধা। বাণী শুনতে না পেলে মন ওঠে না কারও। মৌনব্রত ফক্কড়ের কোনও আশা নেই সেখানে।

মগপাড়া বুদ্ধপাড়া মুসলমানপাড়া হচ্ছে সব চেয়ে নিচের তলা। পচা পাঁকের দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য ক'রে সে সব পাড়ায় গিয়েও কোনও লাভ নেই। নিজেদের জান বাঁচাতেই তাদের জানান্ত, পরের দিকে নজর দেবার ফুরসত কোথায়?

বাকী থাকে বাজার। কয়েক ঘর কাঁইয়া অর্থাৎ মাড়োয়ারী মহাজন যদি থাকেন বাজারে তা'হলে দু'দশটা ফক্কড়ের টিক্কড় লক্কড় অনায়াসে জুটবে কিছু দিন। মৌনীবাবার কদর আছে সেখানে, না মাঙলেও সব কিছু মিলবে। সুতরাং বাজারের দিকেই পা বাড়ালাম। যথেষ্ট মাড়োয়ারী রয়েছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে রণছোড়জীর মন্দিরের পাশে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে এক পাট গুদামের ছায়ায় কাঁধ থেকে ছেঁড়া কম্বলের টুকরাখানি নামালাম। পাট গুদামের ওপাশে নদী, নদীর নাম কর্ণফুলী।

বেশ গিন্নীবান্নী গোছের চেহারা কর্ণফুলীর, নিজের ঘর গৃহস্থালি নিয়ে মহাব্যস্ত। বড় বড় জাহাজ আসছে যাচ্ছে, ঠাসাঠাসি করে রয়েছে অসংখ্য সাম্পান। সেই সব সাম্পানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সব কিছু সমাপন করছে চীনা বর্মী আরাকানী আর চট্টগ্রামী মগ। দিবারাত্র ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ, হৈ হল্লা চলছেই কর্ণফুলীর সংসারে।

বহু বড় বড় পাট-গুদাম নদীর পাড়ে। বিনা আড়ম্বরে দরোয়ানজীরা টিক্কড় বানাবার আটা রামরস আর লক্কড় জুগিয়ে মৌনী বাবার সেবা শুরু ক'রে দিলে। কমিটি বানালে না, প্রস্তাব পাশ করলে না, চাঁদা তুললে না। বা একজন লোককে খেতে দিচ্ছি এই সংবাদটি ছাপাবার জন্যে সংবাদ-পত্রের দ্বারস্থ হ'ল

না। বাবুপাড়ায় আশ্রয় মিললে এতক্ষণে চুলোচুলি লেগে যেত সেখানে। যে সাধু পুলিশ-সাহেবের বাড়ী এসেছেন তিনি ডেপুটি বাবুর শ্বশুর মহাশয়ের আমদানী সাধুর চেয়ে নামে ও দামে ডাঁটো না খাটো—এই নিয়ে গণ্ডা-কতক বিচার-সভা বসে যেত। যে বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় মিলত তিনি সাধুর অলৌকিক মহিমা প্রচার করতে এমন ভাবে কোমর বেঁধে লেগে যেতেন যে তাঁর মুখ-রক্ষার জন্যে দিনে ছত্রিশবার চোখ উল্‌টে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সমাধিমগ্ন হ'তে হ'ত সাধুকে!

পাট-গুদামের ছায়ায় বসে সে সব ভিট্‌কিলিমির কোনও প্রয়োজনই হ'ল না। দরোয়ানজীরা সহজ মানুষ, তাদের সোজা কারবার। যে কেউ একবার আধ সের আটা আর খানকয়েক লকড়ি নামিয়ে দিয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে ফুরসৎ মিললে এসে সামনে বসে ছিলিম টানে। বাড়াবাড়ির ধার ধারে না তারা। নিশ্চিন্তে বসে রইলাম গ্যাঁট হয়ে।

মহালয়া—।

ভোরের আলোয় আগমনীর সুর। বাতাসে পূজো পূজো গন্ধ। নতুন শিশিরে গায়ে-দেওয়া ন্যাকড়াখানি ভিজে গেছে। আকাশ বাতাস আলো শিশির যেন ব্যঙ্গ করছে আমার সঙ্গে। ফক্কড় এখানে বড় অসহায় বড়ো বেমানান।

আকাশের আলো মনে করিয়ে দেয় বহুকাল আগের পূজার দিনগুলি। তখনকার মহালয়ার প্রভাতে যে হাসি খেলা করত আকাশের চোখে, আজও সেই হাসি খেলা করছে। কিন্তু বদলে গেছি আমি, সে আমি কবে মরে গেছি। কেন আবার ফিরে এলাম এই লক্ষ্মীছাড়া বিতিকিচ্ছি চেহারা নিয়ে বাঙলার পূজার আকাশ বাতাস ঘুলিয়ে তুলতে। ফক্কড় এখানে আপদের সামিল ব্যাপার। যে মন নিয়ে বাঙালী মায়ের পূজা করে—সে মনের সুর কেটে যাবে ফক্কড়ের উপস্থিতিতে। কেন মরতে এলাম এই হাড়হাভাতে মূর্ত্তি নিয়ে বাঙলার শিশির ভেজা মন-আকাশে কালি লেপে দিতে!

দূরে আছি, দূরেই থাকব। তফাৎ থেকে পরের মত আর একটিবার শুধু দু'চোখ মেলে দেখে যাব বাঙলার মাতৃ-আরাধনা। তার বেশী আর কিছু আশা করার স্পর্দ্ধা নেই ফক্কড়ের, থাকা অনুচিত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহর ঘুরছি। কোথায় কখানি প্রতিমায় রঙ দেওয়া হচ্ছে তাই দেখে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে হৈ হৈ লেগে গেছে, শহর সুদ্ধ মানুষ বেচা কেনায় ব্যস্ত। বড় বড় প্যাণ্ডেল সাজানো হচ্ছে। লাল সালুর ওপর তুলো দিয়ে বা সোনালী রুপালী ফিতে দিয়ে লেখা সর্বজনীন দুর্গোৎসব। কয়েকখানি ঠাকুর দালানের প্রতিমাও সাজানো হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর-দালানের পূজা যেন বড় প্রাণহীন ক্যাকাশে গোছের ব্যাপার। প্যাণ্ডেলের পূজার প্রদীপ্ত সমারোহের আঘাতে ঠাকুর-দালানের পূজা বড়ই ঝিমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে চেয়ে থাকি আর লোভ হয়। আমায় যদি ওরা ডাকত! কাজ কর্ম করবার জন্যে কত লোকেরই ত দরকার। যে কোনও কাজে আমায় লাগিয়ে দিলে বাঁচতাম। ওদেরই একজন হয়ে যেতাম। বহুকাল পরে আবার মেতে উঠতাম পূজার কাজে। মা কি মুখ তুলে চাইবেন আমার দিকে!

শেষ পর্যন্ত মা চাইলেন মুখ তুলে।

পঞ্চমীর সন্ধ্যা। এক পূজা মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মণ্ডপে বাতি জ্বালাবার তোড়জোড় চলেছে। একটু পরেই উদ্বোধক প্রধান অতিথি ইত্যাদি মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণের শুভাগমন হবে। সকলেই ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। কারণ বাতি জ্বলছে না। সমস্ত বাতিগুলো একবার জ্বলেই আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে। বার পাঁচ ছয় এ রকম হ'ল। হৈ-হট্টগোল বেধে গেল চারিদিকে। অন্ততঃ হাজার-দুয়েক স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত মণ্ডপের মধ্যে। উদ্বোধক প্রধান অতিথি এলেন ব'লে। এধারে আলো ত জ্বলে না কিছুতেই। এ কি—কম আপসোসের কথা!

দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। যখন সাধু ছিলাম না তখন ইলেক্‌ট্রিকের কাজে হাত পাকিয়েছিলাম। সেই অ-সাধু জ্ঞানটি এতদিন পরে কাজে লেগে গেল।

কোথায় গোলমাল হচ্ছে দূর থেকেই তা বেশ বুঝতে পারছি, আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি এতগুলি মানুষের মধ্যে কারও মাথায়—ঐ সামান্য ব্যাপারটুকু ঢুকছে না কেন! শেষে আর চুপচাপ থাকতে না পেরে এগিয়ে গেলাম। ঘড়াঞ্চি ঘাড়ে করে যাঁরা হিমশিম খাচ্ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে জোড় হাতে ইসারা করলাম—আমায় একবার ঘড়াঞ্চিটা দেওয়া হোক। থতমত খেয়ে গেলেন সকলে। এ ব্যাটা ভিখিরী না পাগল এল এই সময় জ্বালাতে! একে ঢুকতেই বা দিলে কে প্যাণ্ডেলে! দু'জন তেড়ে এলেন—দাও ব্যাটাকে প্যাণ্ডেল থেকে বার ক'রে।

আমিও নাছোড়বান্দা, বার বার ওঁদের জোড়হাতে বোঝাবার চেষ্টা করছি, আমাকে একবার ঘড়াঞ্চিটা দাও, এখনই ঠিক ক'রে দিচ্ছি আলো।

শেষে এক ভদ্রলোক তেড়ে উঠলেন—"দাও না হে লোকটাকে একবার ঘড়াঞ্চিখানা। দেখাই যাক না ও কি করে। তোমাদের কেরামতি ত সেই বেলা চারটে থেকে চলছে, এ ধারে রাত্ত ত অর্ধেক কাবার হ'তে চলল।"

চারিদিকে নানারকম টিপ্পনী কাটা শুরু হ'ল।

তবেই হয়েছে, ও ব্যাটা সারবে লাইন! আজ আর উদ্বোধন হচ্ছে না হে। না হয় আনাও তাড়াতাড়ি গোটাকতক হ্যাজাগ। আরে লোকটা সত্যিই যে উঠল ঘড়াঞ্চিতে! প'ড়ে না মরে, তাহলেই কেলেঙ্কারি। কোন দেশের হ্যা লোকটা? নিশ্চয়ই মাদ্রাজী। না হে না, লোকটা খাটি উড়ে। বোধ হয় ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী ছিল আগে, এখন ভেক নিয়ে ভিক্ষে করছে।

শুনতে শুনতে যেটুকু করবার ক'রে ফেললাম। দুটো তার আলাদা ক'রে দিলাম। যেখানে গোলমাল হচ্ছিল সেখানটা কেটে বাদ দিয়ে অন্য তার জুড়ে দিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হ'ল, আলো জ্বলতে লাগল নির্বিঘ্নে।

সম্পাদক মশাই তখন এগিয়ে এসে হিন্দীতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর কথা বুঝতে পারছি কি না। ডান হাতের তর্জনীর মাথায় বুড়ো আঙুলটি

ঠেকিয়ে তাঁর সামনে ধরে দাঁত বার ক'রে বারবার ঘাড় নাড়তে লাগলাম। অর্থাৎ একটু একটু বুঝতে পারছি।

কথা বলছ না কেন?

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে হাঁ করলাম। সেই সঙ্গে তর্জনীটি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে মাথা নাড়লাম কয়েকবার। অর্থাৎ বোবা, কথা বলার শক্তি নেই।

কোথাকার লোক তুমি?

ডান হাত মাথার ওপর ঘুরিয়ে দিলাম। মানে যা খুশি বুঝে নাও।

তখন ওঁদের ভেতর পরামর্শ শুরু হ'ল। পূজোর ক'দিন লোকটাকে আটকে রাখলে কেমন হয়! দুটো খেতে দিলে এটা সেটা করিয়েও নেওয়া যাবে। আবার যদি ইলেকট্রিক বেগড়ায় তখন লোকটা কাজে লাগবে। পূজোর বাজারে একজন মিস্ত্রী ডাকতে গেলে লাগবে অন্ততঃ নগদ আড়াইটি টাকা। আর সময়-মত মিস্ত্রী খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়। সুতরাং আমাকে আটকে রাখাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। তবে সকলেই খাস চট্টগ্রামী ভাষায় বলাবলি করলেন যে কড়া নজর রাখা উচিত লোকটার ওপর। বলা ত যায় না, যদি সটকায় কিছু নিয়ে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সামনে এসে তাঁর নিজস্ব হিন্দীতে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন—"এই ব্যাটা জংলী ভূত, কেন ভিক্ষে ক'রে মরবি পূজোর ক'দিন। থাক আমাদের এখানে, জলটল তুলবি, এটা সেটা করবি, খেতে পাবি। তবে কিছু নিয়ে যেন গা-ঢাকা দিসনি। আমাদের পাড়ার ছেলেরা ধরতে পারলে পিঠের ছাল তুলে ছাড়বে।"

উদ্বোধন হয়ে গেল।

প্রতিমার সামনের পর্দা টানতে যে মহামান্য ব্যক্তিটিকে সসম্মানে আনা হয়েছিল, কি জানি কেন তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগলেন আর রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন। বক্তৃতাটি শোনাই গেল না। তা হোক, সকলেই কিন্তু মনে প্রাণে বুঝলেন যে উদ্বোধন ক্রিয়াটি সার্থকভাবে

সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মায়ের নামে যাঁর চোখে জল আসে তাঁকে ধরে এনে উদ্বোধন করানো গেল এজন্যে প্রত্যেকেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। উদ্বোধনের জয় গান গাইতে গাইতে সকলে খুশী হয়ে ঘরে ফিরলেন।

তখন বসল তাঁদের ঘরোয়া সভা, দুর্গোৎসব কমিটির নিজস্ব বৈঠক। মহানবমীর দিন যে কাঙ্গালী-ভোজন করানো হবে তাই নিয়ে আলোচনা চলল। এক পাশে বাঁশ ঠেসান দিয়ে মাটিতে বসে সব শুনলাম। ওঁরা কেউ নজর দিলেন না আমার দিকে। বাঙ্‌লা ভাষা যখন বুঝতে পারবে না তখন থাকুক বসে।

বৈঠকের আলোচনা শুনে জানলাম এই পূজা কমিটির প্রাণ হচ্ছেন ওঁদের সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশ্বরবাবু চট্টগ্রাম কলেজের তরুণ অধ্যাপক। তিনি সম্পাদক হবার পর থেকে এই সর্বজনীন পূজার সুনাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানে আজকাল যে ভাবে কাঙ্গালী-ভোজন করানে হয় তা আর অন্য কোথাও হয় না। শুধু দু'হাতা খিচুড়ি দিয়ে বিদেয় করা হয় না কাউকে, বসিয়ে পাতা গেলাস দিয়ে ডাল ভাত তরকারি চাটনি আর বোঁদে খাওয়ানো হয়। আগে যে খরচ হ'ত তার চেয়ে এমন কিছু বেশী খরচ হয় না এখন তৃপ্ত ক'রে কাঙ্গালীদের খাওয়ান সম্পাদক মশাই। তিনি বলেন—'কেন ওরা কি মানুষ নয় নাকি—তোমাদের মত ওরাও খেতে জানে। গরীব ছোটলোক ব'লে তারা যেন মানুষ নয়।" হক কথা শুনে সকলে চুপ ক'রে থাকে।

আগে কাঙ্গালী-ভোজনের জিনিষ-পত্রে টান পড়ত। যত লোকের আয়োজন করা হ'ত তার অর্ধেক লোক খেতে বসলেই খাবার জিনিষ যেত ফুরিয়ে। কাঙ্গালী জাতটাই হাড় নচ্ছার কি না। খেতে না পারলেও চেয়ে চেয়ে নেবে, তারপর পাত সুদ্ধ আঁচলে বেঁধে নিয়ে উঠে চলে যাবে। এখন আর সে সব হবার উপায় নেই। অর্থবিদ্যার অধ্যাপক সুরেশ্বর বাবু একা একশ' জন হ'য়ে স্বয়ং পরিবেশন করেন। যে যতটুকু খেতে পারবে তার বেশী ছিটেফোঁটা ওঁর হাত গলে পড়বে না। কাঙ্গালীরা জব্দ থাকে ওঁর কাছে।

শহরের গণ্যমান্য সকলে দাঁড়িয়ে দেখেন কাঙ্গালী-ভোজন করানো। আর এক-বাক্যে সুখ্যাতি করেন সম্পাদক মশায়ের।

চাল-ডালের হিসেব শেষ করতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। বৈঠক শেষ হ'ল কখন তা বলতে পারব না। ওরা কেউই কিছু বলছেন না আমায় তখন আর কি করব! ফিরে চললাম নিজের আস্তানায়। দিনান্তে একবার কিছু না পোড়ালে পোড়া পেট যে প্রবোধ মানে না।

যে মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে বড় সড়ক পর্যন্ত একটি সোজা চওড়া রাস্তাও বানানো হ'য়েছে মাটি ফেলে। দুটি তোরণ বাঁধা হয়েছে সেই পথটির দু-মুখে। অন্য দিকে আর একটি সরু গলি আছে, যা দিয়ে গেলে বাজারে পৌছানো যায়—অনেক কম সময়ে। রাস্তা কমাবার জন্যে সেই গলির মধ্যেই ঢুকলাম। গলির ভেতর বেশ অন্ধকার। তাতে কিছু যায় আসে না। অন্ধকারে ফক্কড়ের চোখ জ্বলে। হনহন ক'রে পা চালালাম।

একটা বাঁক ঘুরতেই কানে এল—"ঐ যে আসছে।"

নজর ক'রে দেখলাম ডান ধারে একটা বারান্দার ওপর দুটি প্রাণী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

"আ—মরণ—আবার এগিয়ে চলল যে লো।"

একজন নেমে এল বারান্দা থেকে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমার পিছনে।

"বলি রাগ ক'রে চললে কোথায় নাগর?"

একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন, গায়ে হাত দেয় আর কি। আঁতকে উঠল—"ওমা এ কে লো! এ একটা ভিখিরী—এ মড়া এখন মরতে এল কেন এখানে।"

দুম দুম ক'রে ছুটে গেল। হাসির আওয়াজ শুনলাম পিছনে। মাথা নীচু ক'রে ভাবতে ভাবতে জোরে পা চালালাম। ভাবনার কি আর কূল-কিনারা আছে।

কঙ্কড়। কঙ্কড়ের মাংস শকুনেও ছোঁয় না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। তারাগুলোও আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ভয়ানক রাগ হ'ল—বোধ করি নিজেরই ওপর।

অহেতুক সেই রাগের জ্বালায় তখন ছুটতে লাগলাম নির্জন গলিটা পার হবার জন্যে।

ষষ্ঠী—

ভোরবেলা স্নানটান শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি চললাম সেই পূজা-মণ্ডপে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই পৌঁছতেই পড়ে গেলাম স্বয়ং সম্পাদক মশায়ের নজরে। চিনতে পারলেন, হাত নেড়ে কাছে ডেকে হিন্দীতে হুকুম করলেন—"যাও কাজে লেগে যাও। সাধুগিরি ফলিয়ে চুপ করে ব'সে থাকলে কিছুই মিলবে না এখানে। জলের ড্রামগুলো ভরতি ক'রে ফেল।"

নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমায়—সামনের বাড়ীর ছাতের ওপর। কাঙালী-ভোজনের রান্না সেই ছাতের ওপরেই হবে। বড় বড় তিনটে ড্রাম বসানো রয়েছে সেখানে। আমার হাতে একটা মস্ত পেতলের কলসী দিয়ে নিচের উঠানে একটা টিউব-ওয়েল দেখিয়ে দিলেন। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সামান্য একটু বক্তৃতা দিয়ে অন্য কাজে চলে গেলেন তিনি। তবে যাবার সময় সেই বাড়ীর কর্তাকে ব'লে যেতে ভুললেন না একটি কথা। কথাটি হচ্ছে—লোকটার ওপর নজর রাখবেন, কলসী নিয়ে যেন গা-ঢাকা না দেয়।

সুতরাং শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বেলা ন'টা পর্যন্ত সমানে নিচে থেকে ওপরে জল তুললাম। আরও দু'জন লাগল জল তুলতে। ওরা আমার মত শুধু শুধু শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করতে আসে নি। দস্তুরমত মজুরি নেবে।

জল তোলা শেষ হতে দেখি ঘাড়ে আর হাতে ব্যথা হয়ে গেছে। ভাবলাম —দূর ছাই, এবার চলে যাই। কিন্তু চ'লে যাওয়া সম্ভবই হ'ল না। একটা হ্যাংলা বেহায়াপনা পেয়ে বসেছে তখন আমাকে। নিজেকে নিজে বোঝালাম—

না, পালালে চলবে না, আবার কবে বাঙলায় আসা ঘটে উঠবে তার ঠিক কি। এ জীবনে দুর্গা পূজার সময় বাঙলায় আসা আর না-ও ঘটতে পারে। এই রকম পূজার কাজ-কর্ম করার সুযোগ আর কখনও ফক্কড়ের বরাতে না-ও জুটতে পারে।

আবার ফিরে গেলাম প্যাণ্ডেলে। সেখানে সকলেই মহাব্যস্ত, কারও কোনও দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই। সকলে সকলকে হুকুম করছেন। প্যাণ্ডেল সাজানো, মাইক ফিট করা, বিকেলে যে ফাংশন হবে তার ব্যবস্থা করা—এই সমস্ত নিয়ে সকলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই কয়েকবার সম্পাদক মশায়ের চোখে পড়ে গেলাম। তিনি হুকুম করলেন সামনের বাড়ি থেকে শতরঞ্চি বয়ে আনতে। সে কাজটি শেষ করতেই আবার হুকুম হ'ল চেয়ার সাজাতে। বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ যে যার বাড়ী চলে গেলেন নেয়ে খেয়ে আসতে। গরু ছাগল প্যাণ্ডেলে না ঢোকে—এ জন্যে একজন লোক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং আমার ওপরেই সে কাজের ভার পড়ল।

আমারও কোনও আপত্তি নেই তাতে। সন্ধ্যার পর আস্তানায় ফিরে টিক্কড় পোড়াব, এখন এতটা পথ গিয়ে ফিরে আসা পোষাবে না। এঁদের ফাংশনটি না দেখে ফিরছি না আজ। কিন্তু তেষ্টা পেয়ে গেছে তখন, জল তুলে আর শতরঞ্চি ব'য়ে বেশ ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। আমার সামনেই কর্মকর্তারা বার বার চা-টা খেলেন, সে সবের ব্যবস্থাও রয়েছে তাঁদের জন্যে। কিন্তু এত ব্যস্ত ওঁরা যে আমার কথাটা কারও বোধ হয় মনেই পড়ল না। কি আর করি—সেই টিউব ওয়েল থেকে এক পেট জল খেয়ে এসে ব'সে রইলাম গেটের পাশে গরু ছাগল তাড়াতে।

কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হৈ চৈ ক'রে খেলা করছে মণ্ডপের ভেতর। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে একটি বুড়ো লোক সামনে একটা তোবড়ানো টিনের বাটি পেতে সেই সকাল থেকে ব'সে আছে। মাথা নীচু ক'রে সুর ক'রে একঘেয়ে সুরে সে চেঁচাচ্ছে। তার বক্তব্য হচ্ছে—সে অন্ধ নাচার

কোনও কিছু ক'রে খাবার উপায় নেই তার, তাকে এক পয়সা দান করলে দাতা রাজা হবেন এবং অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবেন। এই ক'টি কথাই অনবরত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে সে ঘ্যানঘ্যান ক'রে। যেন একটা কথা-বলা কল, দম দিয়ে কে বসিয়ে রেখে গেছে, দম না ফুরোলে কিছুতেই থামবে না। কি যে বলছে সে দিকে ওর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। বলতে বলতে অভ্যাস হ'য়ে গেছে, নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মত বার হচ্ছেই সেই সুর ওর ভেতর থেকে। এক মাথা পাকা চুল সুদ্ধ মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ব'সে আছে লোকটি, ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কথাগুলো যেন ওর মাথা দিয়ে বা সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হচ্ছে, মুখ দিয়ে নয়।

উঠে গেলাম লোকটির সামনে। কেউ ত নেই এখন, এ সময় একটু থামুক না। অনর্থক এখন চেঁচিয়ে মরছে কেন।

ওর সামনের টিনের বাটিতে পড়ে আছে মাত্র তিনটি পয়সা। ভুলে গেলাম যে বোবা মানুষ আমি। নীচু হ'য়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"শুনছ কর্তা—এখন আর চেঁচিও না। এখন সবাই চলে গেছে এখান থেকে। কে শুনছে তোমার কথা!"

ও মাথা তুললে। চোখ পিটপিট করছে—যেন সত্যিই অন্ধ। জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় গেল সব?"

বললাম, "এখন খাওয়া-দাওয়া করতে বাড়ী গেছেন সকলে।"

ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে উঠল বুড়ো। আকু-পাকু করে টিনের বাটি থেকে পয়সা তিনটে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে ফেললে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গজ গজ ক'রে কি সব বলতে লাগল যার একবর্ণও আমি বুঝলাম না।

হাউমাউ ক'রে উঠল কে আমার পেছনে। একটি স্ত্রীলোক আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়োর বাটির ওপর। পরমুহূর্তেই একটি কান-ফাটা চীৎকার। খাটি চাটগাঁইয়া ভাষায় চেঁচাচ্ছে আর ধেই ধেই ক'রে নাচছে স্ত্রীলোকটি। কি যে হ'ল বুঝতে না পেরে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটে এল লোকজন, ভিড় জমে গেল আমাদের চারিদিকে। স্ত্রীলোকটি চেঁচাচ্ছে,—নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে আর আমাকে দেখিয়ে কি সব ব'লে যাচ্ছে যার কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। কিন্তু আমি না বুঝলে কি হবে, যারা বোঝবার তারা সবই বুঝলে। ফলে তৎক্ষণাৎ সবাই মারমুখো হ'য়ে উঠল আমার ওপর। একটি তরুণ এগিয়ে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরলে।

"শালা চোর, বার কর্ কি নিয়েছিস বুড়োর বাটি থেকে।"

ভিড় ঠেলে সামনে এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে চিনতে পারলাম, সামনের বাড়ীর কর্তা। সকালে জল তোলবার সময় কলসী নিয়ে না পালাই আমি, সেজন্য আমার ওপর নজর রাখবার ভার দেওয়া হয়েছিল যাঁকে। যে ছোকরা আমার হাত ধ'রে ঝাঁকাচ্ছে—বুড়োর পয়সা ফেরত পাবার জন্যে সে বোধ হয় এর ছেলে। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধমক দিলেন ছেলেকে—"ছেড়ে দে—ছেড়ে দে শিগগির হাত।"

তখন অনেকের হাত নিশপিশ করছে। যার যা মুখে আসছে বলছে—"দে দু'ঘা লাগিয়ে ব্যাটাকে, খুঁজে দেখ ওর কাছে কি আছে, হারামজাদা পাকা বদমাইস, চুল দাড়ি গজিয়ে ভস্ম মেখে সাধু সেজে মানুষের গলায় চাকু চালায়।"

যিনি আমার হাত ছাড়ালেন তিনি প্রচণ্ড ধমক দিলেন সকলকে। গোলমাল কমল একটু। তখন তিনি এগিয়ে গেলেন চোখ পিটিপিটি অন্ধ বুড়োর দিকে।

"তোমার বাটি থেকে পয়সা নিয়েছে কেউ ?"

স্ত্রীলোকটি কি বলতে গিয়ে এক দাবড়ি খেলে। বুড়ো গোঁ গোঁ ক'রে কি জবাব দিলে। তখন তার কাছে যা আছে সব বার করতে হ'ল। গোনা হ'ল বার আনা তিন পয়সা।

আমার কোমরে জড়ানো ন্যাকড়ার টুকরোটা খুলে ঝেড়ে দেখা হ'ল, হাঁ-করিয়ে মুখের ভেতর দেখা হ'ল, কৌপীনও খুলতে হ'ল আমাকে, মাথার চুলের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল। না, একটি কানা কড়িও নেই কোথাও।

তখন আর একচোট সকলে মার মার ক'রে উঠল স্ত্রীলোকটির ওপর। সে মুখ নীচু ক'রে বুড়োর হাত ধরে চলে গেল।

এমন সময় স্বয়ং সম্পাদক মশাই পান চিবোতে চিবোতে উপস্থিত হলেন। সামনের বাড়ীর কর্তা মশাই পড়লেন তাঁকে নিয়ে।

"বলি ব্যাপার কি হে সুরেশ্বর, এই লোকটা যে সকাল থেকে খাটছে এর খাবার ব্যবস্থা কোথাও করেছ ?"

আর যাবে কোথা, বিরাট হৈ চৈ লেগে গেল। সম্পাদক মশায় হম্বিতম্বি জুড়ে দিলেন সহ-সম্পাদকের ওপর। তিনি গর্জন ক'রে ডাকতে লাগলেন স্বেচ্ছাসেবকদের কাপ্তেনকে। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে কোষাধ্যক্ষকেই ধরে আনলে কারা। তিনি এসে রুখে উঠলেন—"আমার কি দায় পড়েছে কে খেলে না খেলে তার হিসেব রাখবার। পূজোর পর আমার কাছ থেকে টাকার হিসেব বুঝে নিও। এক পয়সা এধার ওধার যদি হয় ত দশ ঘা জুতো মেরো আমায়।"

গোলমালের মাঝখান থেকে আমি টুপ ক'রে সরে পড়লাম।

তখন দুপুর বেলা, রাস্তায় লোকজন কম। হনহন ক'রে হাঁটছি আর মনে মনে হাসছি। হাসছি ফক্কড়ের বরাতের কথা ভেবে। ফক্কড়ের কপালখানি ত সঙ্গেই এসেছে বাঙলায়। সেই কপাল সুদ্ধ এখানকার পূজা উৎসব ফাংশন ইত্যাদিতে নাক গলাতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলব। দূরে থাকাই ভাল, আর কখনও কাছে এগোনো নয়। সে লোভ সংবরণ ক'রে তফাৎ থেকে বাঙলার মাতৃ-আরাধনা দেখে সরে পড়ি। কি প্রয়োজন শুধু শুধু জল ঘোলা ক'রে !

অনেকটা দূর পার হয়ে গেলাম আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন মাঝে মাঝে ডাক দিচ্ছে পিছন থেকে। পিছন ফিরে দেখি সেই স্ত্রীলোকটি, এক রকম দৌড়চ্ছে সে তখন। হাত নেড়ে আমায় দাঁড়াবার জন্যে ইসারা করলে।

ও আবার পিছু নিলে কেন! আরও জোরে পা চালালাম। এবার সত্যিই সে ছুটতে লাগল, আর কি যেন বলতে লাগল ব্যাকুল হয়ে। দাঁড়াতে হ'ল। কি চায় ও আমার কাছে?

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাচ্ছ এখন গোঁসাই?"

হাঁ ক'রে মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ঘাড় নাড়লাম। যেন জলে উঠল স্ত্রীলোকটি—"মিথ্যে কথা, তখন ত বেশ কথা বলছিলে বুড়োর সঙ্গে" ব'লে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগল।

ভাল ক'রে দেখলাম তাকে। বয়স কত তা বোঝা শক্ত। ছাব্বিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। শুকনো শরীর। চোখের কোলে বড় বেশী কালি জমেছে, উঁচু হয়ে আছে গলার কণ্ঠা, তিন ফের তুলসীর মালা জড়ানো রয়েছে গলায়। একটা শেমিজ আর একখানা শত জায়গায়-সেলাই-করা শাড়ি পরে আছে। জামাকাপড়ের আদি বর্ণ যে কি ছিল তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ওর নিজের রঙ খুব ময়লা বলা চলে না। অত্যধিক তেল মেখে, কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে, নাকের ওপর সাদা তিলক এঁকে, পান চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতগুলোকে বিশ্রী কালো ক'রে ফেলে এমন অবস্থা ক'রে তুলেছে নিজের যে, ওর দিকে চেয়ে থাকলে গা ঘিনঘিন করে। ওই সমস্ত বাদ দিয়ে একখানা ফর্সা শাড়ি পরলে নেহাৎ অতটা বিদঘুটে দেখাত না বোধ হয় ওকে। হয়ত তখন ওর কোটরে-বসা চক্ষুদুটির দিকে চেয়ে মন এতটা চড়ে যেত না আমার।

মুখ বুজে ওর আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ব'লে সে আরও চটে গেল। "আহা ঢঙ দেখ না মিন্‌সের। আমার সঙ্গে কথা কইলে ওঁর কারবারটি মাটি হয়ে যাবে। আমি যেন লোককে ব'লে বেড়াতে যাচ্ছি যে উনি বোবা নন। এখন যাচ্ছ কোন্ চুলোয়, তাই বলো না।"

ওর নির্ভেজাল নিজস্ব ভাষার শব্দটুকু না বুঝলেও ওর চোখের দিকে চেয়ে

মনের ভাবটুকু বেশ পড়ে নেওয়া যায়। কোটরে-বসা চক্ষু দুটিতে যথেষ্ট আগুন রয়েছে, ঠোঁট দু'খানির তেরছা ভঙ্গিমায় রয়েছে বিস্তর ইঙ্গিত। অর্থাৎ নারী তখনও বেশ বেঁচে রয়েছে তার হাড় ক'খানির অন্তরালে। কিন্তু নিয়তির নিষ্করুণ নিপীড়নে একেবারে তেতো বিস্বাদ হয়ে গেছে সেই নারী।

কিন্তু ওর মতলব যে কি তা ঠিক ঠাহর করতে না পেরে আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। সেও ছুটতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে—"আ মরণ, কথা শোনে না যে গো, দেখ শুনছ—তোমায় সঙ্গে নিয়ে না গেলে খোয়ারের চূড়ান্ত হবে আমার, মেরে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বুড়োটা।" তার গলা ভেঙে পড়ল।

আর কান দিলাম না ওর কথায়। আরও জোরে পা চালালাম। সেও প্যানপ্যান করতে করতে পিছনে ছুটল। একটু পরেই খেয়াল হ'ল, এভাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে আস্তানায় পৌছলে সেখানকার তারাই বা ভাববে কি! এদিকে তখন রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের দিকে। দেখবার কথাই, কিম্ভূতকিমাকার একটা পুরুষের পেছনে লক্ষীছাড়া একটা মেয়ে মানুষ ছুটছে কেন!

আবার ভিড় জমবার ভয়ে মরীয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। বেশ জোরে ধমক দিলাম তাকে—"কি চাও আমার কাছে?"

থতমত খেয়ে সেও দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। বোবা পশুর নিরুপায় চাহনি তার চোখ দুটিতে, আর অনেকটা জলও টল টল করছে।

আক্কারা খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড় ঘুরে বাবুপাড়াকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে মণিপুরীদের গৌরাঙ্গ মন্দিরের পেছন দিকে প্রাণ হাতে ক'রে এক বাঁশের সাঁকো পার হলাম। তারপর মাঠ, মাঠের মধ্যে একটা ছোট পল্লীতে গিয়ে পৌছলাম তার সঙ্গে। যেতেই হ'ল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে না ফিরলে নাকি বুড়ো আর বুড়োর ছেলে ওর হাড় গুঁড়িয়ে ফেলবে! বুড়োর ধারণা হয়েছে

আমি একটি মহাপুরুষ। পাপীতাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে শ্রীধাম থেকে সোজা উপস্থিত হয়েছি চাটগাঁ শহরে। মহাপুরুষের নিয়ম মাফিক—ছদ্মবেশ ধরে বুড়োর সামনে আবির্ভূত হয়ে ঠিক যখন তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম সেই সময় এই হতভাগী বাধা দিয়েছে। কাজেই বুড়োর উদ্ধার না হবার হেতু হচ্ছে এই পাপিষ্ঠা। অতএব বুড়ো হুকুম দিয়েছে, যেখান থেকে হোক আমায় খুঁজে বার ক'রে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। এতক্ষণে বাড়ী ফিরে বুড়ো তার বেটাকেও বলেছে সব কথা। আমি যদি সঙ্গে না যাই তা'হলে আজ ওর রক্ষে থাকবে না। দু'জনে গায়ের চামড়া তুলে নেবে।

আরও অনেক কথা জানতে পারলাম এক সঙ্গে পথ চলতে চলতে। এখানকার মানুষ নয় ওরা। নোয়াখালি থেকে আকালের বছর পালিয়ে এসেছে। কোন্ এক বাবাজী সম্প্রদায়ের লোক ওরা। যখন ওর বয়স ছিল কাঁচা তখন ওর মা ত্রিশ টাকার বদলে মেয়েকে দিয়ে দেয় এক বাবাজীর হাতে। কয়েক বছর পরে সেই বাবাজীও তার মূলধন উসুল ক'রে নেয় আর একজনের কাছ থেকে। এইভাবে বার পাঁচেক ও হাত-বদল হয়েছে। তার বর্তমান মালিক বুড়োর ছেলে ঘরে বসে গামছা বোনে তাঁতে। বুড়োকে পথের ধারে কোথাও বসিয়ে দিয়ে সে সারা শহর ভিক্ষা করে বেড়ায়। কিন্তু এখন তাকে দেখে কেউ ভিক্ষাও দেয় না। সে বয়স নেই, সে রসও নেই। কাজেই কিছুতেই কিছু হয় না। শুধু হাতে ঘরে ফিরে রোজ মার খেতে হয়।

হাসি পেল ঘর কথাটি শুনে। হঠাৎ বলে ফেললাম, "কার ঘর? যাও কেন ওদের ঘরে? পালাতে পারো না ওদের কাছ থেকে?"

কোনও উত্তর দিলে না। আবার সেই বোবা পশুর বোবা চাহনি দেখা দিলে ওর চোখে। সেই দৃষ্টি বলতে চায় কোথায় পালাব? কার কাছে পালাব? যেখানেই যাব ঐ বুড়োর ছেলে গিয়ে ঠিক ধরে আনবে। এক কুড়ি নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে ওরা, সেই টাকা কটা দিয়ে অন্য কেউ যদি কিনে নিত তাকে! কিন্তু সেদিন কি আর ওর আছে!

পৌঁছলাম ওদের বাড়ীতে। বাড়ী নয় আখড়া। পল্লীর সব কখানি বাড়ীই আখড়া। মালা-চন্দনের বেড়াজালে আটক পড়েছে কতকগুলি মানব-মানবী। জাল ছিঁড়ে পালাবার না আছে সাহস না আছে সামর্থ্য। পচা ঘোলা জলে পচে মরছে। মরা পর্যন্ত রেহাই পাবে না কেউ।

ছিটে বেড়ার একখানি মাত্র ঘর আর ছোট একটি উঠান। উঠানের এক কোণে তুলসী-মঞ্চ। উঠানখানি নিকোনো। ঘরের দাওয়াও নিখুঁত ভাবে নিকোনো। দাওয়ায় বসে সেই বুড়ো খল-মুড়িতে কি মাড়ছে। ঘরের মধ্যে খটাখট শব্দ হচ্ছে তাঁতের। আমাদের সাড়া পেয়ে তাঁত বন্ধ হ'ল। মিশকালো একটি লোক ঘর থেকে বেরিয়ে সটান হয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দণ্ডবৎ সম্পন্ন ক'রে উঠে বসতে বুঝলাম, লোকটি ভক্ত বটে। ভক্ত যে কত পাকা তা ওর সর্বাঙ্গে লেখা রয়েছে। কপালে নাকে বুকে পিঠে অষ্টাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তিলক কেটেছে। মাথাটি নেড়া, চৈতনের গোছাটি এতই সুপুষ্ট যে ওর খেংরা কাঠির মত মূর্তির সঙ্গে একদম বেমানান দেখাচ্ছে। রক্তজবার মত লাল চোখ দুটি, শুধু নামামৃত পানে অতটা লাল হয় নি নিশ্চয়ই। অন্য কোনও পার্থিব বস্তু পেটে পড়েছে। হাঁটু মুড়ে জোড় হাতে বসে রইল আমার সামনে মুখটা যতদূর সম্ভব কাঁচুমাচু করে।

লাঠি ধরে বুড়ো নেমে এল দাওয়া থেকে। এসে সেও উপুড় হয়ে পড়ল পায়ের ওপর। ততক্ষণে আরও কয়েকজন মেয়ে পুরুষ জমা হয়ে গেল। চেহারা তিলক মালা চৈতন সকলেরই এক রকম। ভক্তি যথেষ্ট সকলের। জানতে পারলাম বিখ্যাত সোনাচাঁদ বাবাজীর দলভুক্ত বোষ্টুম ওরা। বাবাজী বহুকাল আগে গোলকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর দল আর মত বেঁচে রয়েছে। সেই সঙ্গে যা জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে তা স্পষ্ট লেখা রয়েছে এই মেয়ে-পুরুষ-কটির সর্বাঙ্গে।

অর্থাৎ কিছুই ওদের আটকায় না। সহজ ভাবের ভজন কি না ওদের, কাজেই ওদের কাছে সবই সোজা। ভজনের সময় বাছবিচার নেই কিছু। মন যাকে চায় তাকে নিয়েই ভজন করা চলে।

বুড়ো আর তার ছেলে দু'জনে আমার কাছে দুটি বর চাইলে। বুড়ো বললে—হারামজাদীর জন্যে সে মহাপুরুষের কৃপা হতে বঞ্চিত হতে বসেছিল। "আহা সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর মত গলা আর নিতায়ের মত দেখতে। জয় প্রভু নিত্যানন্দ, এবার কৃপা ক'রে এই অন্ধের চোখে আলো দান করো বাবা।"

পুত্ররত্নটির কামনা আরও সহজ ও সরল। এই পাপ পৃথিবী থেকে তাকে শুধু উদ্ধার ক'রে দিতে হবে।

সকলেরই ঐ এক প্রার্থনা—উদ্ধার ক'রে দাও। উদ্ধার না হ'য়ে কেউ ছাড়বে না আমায়। অন্ততঃ একটা রাত ধ'রে রাখবে। বয়স কম দুটি মেয়ে এল তেলের বাটি নিয়ে অঙ্গ-সেবা করতে। সহজ ভাবের অঙ্গ সেবা, অঙ্গ সেবাই প্রধান সেবা।

কিন্তু আমার ত থাকবার উপায় নেই। প্রভুপাদ গুরুর কৃপায় আমাকে যে তখন অন্য এক প্রকার ভজন করতে হচ্ছে। সে বড় উঁচু রসের ব্যাপার। তাতে অঙ্গ-সেবা নিষিদ্ধ আর নির্জনে থাকা প্রয়োজন। তাঁর আদেশেই মৌনব্রত নিয়ে আছি। শুধু বুড়ো একজন উঁচুদরের ভক্ত বলেই তার সঙ্গে কথা না ব'লে পারিনি।

সুতরাং এবার সকলে বুড়োকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। আমাকে কথা দিতে হ'ল যে ব্রজরাণীর ইচ্ছা হ'লে আবার দেখা হবে তাদের সঙ্গে। রাসমণির কৃপায় বুড়ো ফিরে পাবে দৃষ্টিশক্তি, শুধু দৃষ্টিশক্তি কেন অন্তর্দৃষ্টি পাবে সে এবার। আর উদ্ধার? উদ্ধার ত হয়েই গেছে সবাই। আহা এত ভক্তি যাদের, তাদের আর উদ্ধার হ'তে আটকাচ্ছে কোথায়!

সেবার জন্যে কিছু দিতে এল ওরা। কিন্তু কিছুই ছুঁই না যে, বারণ আছে গুরুর। গুরু হে, তুমিই সত্য। চোখ বুজে কপালে জোড়-হাত ঠেকালাম। আরও একবার ওদের ভক্তি দেখানো শেষ হ'লে বিদায় নিলাম। সাঁকো পর্যন্ত এল সকলে সঙ্গে সঙ্গে। সাঁকোর ওপর উঠে হাত নেড়ে ওদের আর এগোতে মানা ক'রে একলা এপারে নেমে এলাম। আরও দেরি হ'লেই হয়েছিল আর

কি। অন্ধকারে সাঁকো পার হ'তে না পেরে ঐ নরকে পচে মরতাম সারা রাত। এবার সত্যিই একটি ধন্যবাদ দিলাম আমার বরাতকে।

দিয়েই চমকে উঠলাম। ও আবার কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে! আবছা আলোয় চিনতে কষ্ট হ'ল না। আবার কি চায় ও!

সরে এল কাছে। ভাঙা গলায় বললে, "চলুন গোঁসাই এগিয়ে দি আপনাকে।"

সভয়ে বললাম, "তার দরকার নেই। তুমি ফিরে যাও, নয় ত ভাববে কি ওরা!"

ফোঁস ক'রে উঠল, "ভাবুক যার যা খুশি। আর পারি না আমি, আমার মরণও নেই। সারাদিন পথে পথে ঘুরে কিছুই পাইনি আজ। ওদের নেশার যোগাড় না নিয়ে গেলে সারারাত দুই বাপ-বেটায় ছিঁড়ে খাবে আমায়। নেশা করিয়ে ওদের ফেলে রাখতে পারলে তবে সে রাতটা রক্ষা পাই আমি। ঐ বুড়ো মড়ার বেশী হ্যাংলামো। বুড়োর কথায় রাজী না হ'লে ওর ছেলে বুকে চেপে বসবে আমার, আর বাপটা রক্ত চুষে খাবে। নেশার লোভে পাড়ার কুত্তা-কুত্তীগুলোকেও ডেকে আনে, তখন খোল খত্তাল বাজিয়ে আরম্ভ হয় চাটাচাটির মচ্ছব। লাথি মারি ওদের ভজনের মুখে।"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে মারলে এক লাথি রাস্তার ওপরেই। শরৎ-আকাশের ষষ্ঠীর চাঁদ ওর মুখের ওপর আলো ফেলেছে। চোখ দুটো যেন জলছে ওর। ধারালো লম্বা একখানা ইস্পাতের মত দেখাচ্ছে ওকে। সদ্য ঘুম ভেঙেছে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর, এবার চিবিয়ে খাবে সব, অপমান নিপীড়ন প্রবঞ্চনা সব গ্রাস ক'রে ফেলবে।

বললাম, "আমার সঙ্গে গিয়ে কি ওদের নেশার যোগাড় করতে পারবে!"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "যতক্ষণ পারি থাকি বাইরে। হয়ত আট আনা চার আনা পেয়েও যেতে পারি।"

অনাবশ্যক বোধে পাবার উপায় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলাম না, শুধু ব'লে ফেললাম, "পালাও না কেন ওদের কাছ থেকে?"

নারী আর জবাব দিলে না আমার কথার। মাথা হেঁট ক'রে চলতে লাগল পাশে পাশে। কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট শুনলাম ও কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

আরও অনেকটা পথ পার হলাম এক সঙ্গে পা ফেলে। ডান দিকে নদীর ধারে যাবার রাস্তা। আর ওকে নিয়ে এগোনো যায় না। একটা কিছু ব'লে তখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। বললাম—"চট্টেশ্বরীর বাড়ীর দরজার পাশে কাল দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে থেকো। আমি যাবো, দেখা যাক্—কি করতে পারি।"

রাস্তার ওপরেই ও আমার পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে আর কোনও কথা না ব'লে চলে গেল বাঁ-হাতি রাস্তায়।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। সারা শহর ঢাক-ঢোলের শব্দে কাঁপছে। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সাজগোজ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়েছে। সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে একান্ত অশোভন ফক্কড়, বিশ্রী বেখাপ বেমক্কা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাঙলার আকাশের তলায় ফক্কড়ের উপস্থিতি। নিজেকে নিয়ে কোথায় লুকোব তাই ভেবে অস্থির হ'য়ে উঠলাম।

কিন্তু এই ধরণের মানসিক অবস্থা কখনও হয় না বাঙলার বাইরে কোথাও। বাঙালী যেখানে নেই সেখানেও মানুষ ভাল জামা-কাপড় পরে উৎসব করতে বার হয় পথে। কই, তাদের সামনে ফক্কড়ের ঘোরাফেরা করতে বাধে না ত কখনও! এত তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাতে হয় না, লজ্জা সঙ্কোচের ধার ধারতে হয় না। এ আমার হ'ল কি! কেন মরতে এলাম এ সময় বাঙলা দেশে!

পথের মানুষের চোখ এড়াবার জন্যে—পথ ছেড়ে বিপথ ধরে সোজা চললাম নদীর কিনারায়। আগে জলে নামব, স্নান ক'রে তবে গিয়ে উঠব ফক্কড়ের আসনে। যেখান থেকে ঘুরে আসছি সেখানকার দুর্গন্ধ ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতে হবে কর্ণফুলীতে ডুব দিয়ে।

কিন্তু কর্ণফুলী পারলে না ফক্কড়ের অঙ্গ থেকে দুর্গন্ধ দূর করতে। সে জিনিস ভেতরে বাসা বেঁধেছে তখন ভাল করে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এক হতভাগী

কি আশা বুকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে মরতে লাগল! কোথায় কতটুকু প্রভেদ আছে তার আর আমার মধ্যে! দু'জনেই পথের কুকুর, বেঁচে থাকার নির্লজ্জ লালসায় দু'জনেই পথের ধূলায় গড়িয়ে মরছি। কোথায় এমন কি বস্তু আমার আছে যা তার নেই, অথবা তার যা আছে আমার তা নেই—এমন কিছুর নাম মনে আনবার জন্য মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজতে লাগলাম।

নিজের ওপর নিদারুণ বিতৃষ্ণায় দম বন্ধ হ'য়ে এল। এই মুহূর্তে যদি এই খোলসটা বদলে ফেলতে পারতাম! চুল দাড়ি সুদ্ধ এই শতধা বিদীর্ণ চামড়া ঢাকা 'আমি'টিকে ছেঁড়া জুতোর মত টান মেরে ফেলে দিয়ে যদি কোথাও পালাতে পারতাম! নাঃ, এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ আর কখনও জন্মায়নি নিজের ওপর।

ফক্কড়—কখনও কারও ছিটেফোঁটা উপকারে লাগে না ফক্কড়। বেঁচে থেকেও মরে ভূত হয়ে গিয়ে লক্কড় জেলে টিক্কড় পুড়িয়ে খেয়ে খোলসটাকে বজায় রাখার অবিরাম চেষ্টা করার কি সার্থকতা! হ্যাংলা কুত্তার মত দুনিয়াটার দিকে চেয়ে জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে আর নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি—এ ভাবে দিন গুজরান করার অর্থ কি?

অর্থ খুঁজতে খুঁজতে অন্যমনস্ক হ'য়ে নদী থেকে উঠে কখন আস্তানার দিকে চলতে আরম্ভ করেছি। কানে এল খচ-খচ-খচ-খং। ভক্তরা ঢোল আর করতাল নিয়ে খচ-খং জুড়ে দিয়েছে। খচ-খং আবার ফক্কড়ের রক্তে দোলা লাগিয়ে দিলে। জোরে পা চালালাম।

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আরও উদ্দাম হ'য়ে উঠল খচ-খং খচ-খং। একে একে উঠে এসে গোড় পাকড়ালে সকলে। মাঝখানের উঁচু আসনটি আমার জন্যে। সামনে এক গোছা ধূপ জ্বলছে। একখানা থালায় সাজিয়েছে পেঁড়া আর ফল। পাশে আর একখানা থালায় সাজানো রয়েছে পুরি কচুরি মিঠাই। মনে পড়ে গেল, আজ ভোরে যখন যাই তখন এরা বলেছিল বটে যে কোন এক শেঠজী আজ ভোজন দেবেন আমায়। একটু বেলাবেলি ফিরতে অনুরোধ করেছিল এরা। সবই ভুলে মেরে দিয়েছি।

এও এক জাতের মদ। এদের ভক্তি, সাধু হিসেবে ভিন্ন রকম মর্যাদা দেওয়া বেশ কড়া-জাতের উগ্র মদ একরকম। নিজেকে নিজে ফিরে পেলাম এতক্ষণে।

স্মরণ হ'ল জাত ফক্কড়ের বাণী একটি।

"আরে দুনিয়া যার পায়ের তলায় লোটায় সে ফক্কড়, সে রাজার রাজা।"

শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে উঁচু আসনে চোখ বুজে বসে রইলাম। পাঁচগুণ জোরালো হ'য়ে উঠল ওদের উৎসাহ।

"শ্রীরামভকত শ্রীবজরঙ্গবালী মাহারাজকো জয়।"

শাঁখ বাজছে।

একসঙ্গে অসংখ্য শাঁখ বাজছে। তার সঙ্গে উঠছে সহস্র কণ্ঠের উলুধ্বনি। শঙ্খ আর উলুধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙল ফক্কড়ের।

উলুধ্বনি—এই ধ্বনি শোনা যায় শুধু বাঙলায় আর যেখানে বাঙলার মেয়েরা যায় সেখানে। বাঙলার মেয়ের কণ্ঠের এই বিচিত্র ধ্বনির বিশেষ তাৎপর্য কি—তা বলতে পারব না। কিন্তু এই ধ্বনি কানে গেলে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়—মনের তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে ঝনঝন করে। একটু বেশী রকম ছুটোছুটি ক'রে শরীরের রক্ত। বাঙলার ছেলেরই এই সব উপসর্গ দেখা যায় উলুধ্বনি কানে গেলে—আঁতুড়-ঘরে নাড়ী কাটার আগেই এই ধ্বনি কানে যায় কিনা বাঙালীর।

তারপর বেজে উঠল ঢাক ঢোল কাঁসি চারিদিকে।

মহাসপ্তমী।

জেগে উঠেছে বাঙলা দেশ। ঊষার আবির্ভাবের আগে বাঙলা আবাহন জানাচ্ছে মহাসপ্তমী তিথিকে। জগৎজননীর আবির্ভাব-তিথিকে বরণ করছে বাঙলা। এই মাহেন্দ্রক্ষণে যে বাঙালী তার মনে প্রাণে সমগ্র সত্তায় ঘুম-ভাঙানী গান শুনতে পায় না সে যেন নিজেকে বাঙলার সন্তান ব'লে পরিচয় না দেয়।

সে দিন সূর্যোদয়ের অনেক আগে কর্ণফুলীর তীরে পাট-গুদামের আড়ালে

রণছোড়জীর মন্দিরের পাশে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে ছেঁড়া কম্বলের ওপর শোয়া ফক্কড়ও উঠে বসল।

আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ আকাশের গায়ে ফুটে উঠল একখানি মুখ। স্পষ্ট চিনতে পারলাম মুখখানি। তীব্র একটা মোচড় দিলে বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম।

এ সেই মুখখানি আর সেই আঁখি দুটি। মায়ের বুকের মূক অভিমান মুখর হয়ে উঠেছে আঁখি দুটিতে, উথলে উঠেছে মাতৃ-হৃদয়ের অমৃতের উৎস। ঘর-পালানো হতভাগা সন্তানের জন্যে নিরুদ্ধ বেদনায় কাঁপছে মায়ের ঠোঁট-দুখানি মৃদু মৃদু। বহুকাল পরে শুনতে পেলাম মায়ের আকুল আহ্বান।

"ফিরে এলি বাবা—ফিরে এলি নিজের ঘরে! মিছিমিছি কেন এত কান্না কাঁদালি আমায়! মাকে আর জ্বালা দিস্‌নে বাবা—আর পালাস নে ঘর ছেড়ে। এবার ঘরের ছেলে ঘরে থাক।"

কর্ণফুলীর অপর তীরে আকাশের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছে। আলোর হাসি—আমার জননীর মুখের মধুর হাসি ঝলমল করছে পূব আকাশে।

বসে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

বহুকাল আগে, মনে হয় যেন এ জন্মের আগের জন্মে একে একে অনেকগুলি মহাসপ্তমীর প্রভাত উদয় হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই মায়ের সঙ্গে গঙ্গা-স্নান ক'রে ফিরে আসতাম। তারপর আবার যেতাম গঙ্গায় লাল চেলী প'রে কলাবৌ স্নান করাতে। দুধে-গরদের জোড় প'রে দু'হাতে বুকের কাছে মস্ত তামার ঘট ধরে বাবা যেতেন পুরুত মশায়ের পাশে পাশে। পুরুত মশাই নিতেন কলাবৌ। ওঁদের সামনে থাকতাম আমি ধুনুচি হাতে, ধুনো গুগগুল চন্দনকাঠের গুঁড়ো পোড়াতে পোড়াতে যেতে হ'ত আমায়। তিনখানা ঢাক, পাঁচটা ঢোল, কাঁসি সানাই থাকত আমার সামনে। বাজনার তালে তালে রক্তে লাগত প্রচণ্ড দোলা।

সেদিন প্রভাতে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো ফক্কড়ের রক্তে সেই

জাতের দোলা লাগল। সামলাবার জন্তে হু'হাতে বুকটা চেপে ধরলাম, জানতেও পারলাম না পেশাদার ফক্কড়ের চিরশুষ্ক দুই চোখ দিয়ে কখন অবিরল ধারায় জল গড়াতে শুরু করেছে।

দূর থেকে কথার আওয়াজ কানে এল। এত ভোরে কারা আসছে এদিকে! এ সময় আবার কার কোন্ প্রয়োজন হ'ল আমার কাছে আসবার! নাঃ, এতটুকু শান্তি নেই কোনও চুলোয়, একান্তে বসে নিজস্ব ক'রে এতটুকু সময় পাবার উপায় নেই। সদা-সন্ত্রস্ত ফক্কড়ের জীবন সর্বজীবের সামনে সদা সর্বদা উলঙ্গ উন্মুক্ত বে-আবরু। ব্যক্তিত্বই যার নেই তার আবার ব্যক্তিগত গোপনীয় —এসব বালাই থাকবে কেন।

যাঁরা আসছিলেন তাঁরা এসে পড়লেন কাছে। সস্ত্রীক এক শেঠজী আর তাঁর দরোয়ান। দরোয়ানজীকে চিনলাম, সন্ধ্যার সময় আমার কাছে বসে ছিলিম টানেন। কিন্তু এই সাত-সকালে মনিব সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হবার হেতুটি কি!

শেঠ-পত্নী চাল ঘি ডাল লবণ দিয়ে সাজানো একখানি থালি নামিয়ে দিলেন আমার সামনে। এক জোড়া সাদা ধুতি চাদর আর একখানি গামছা রাখলেন শেঠজী আমার কম্বলের ওপর। কয়েকটি চকচকে টাকা পায়ের ওপর রেখে দু'জনে প্রণাম করলেন।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। জোড় হাতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ওঁরা বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে চাপা-গলায় শেঠজী মন্তব্য করলেন—"বহুত প্রেমী হায় মৌনীবাবা, রোতা হায়।" তাঁর পত্নী মস্ত নথ নেড়ে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে ফিসফিস ক'রে বোধহয় নিজের মনস্কামনা জানাতে লাগলেন।

ওধারে পূব আকাশ আরও লাল হয়ে উঠল। দূর থেকে প্রভাতী হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দ—তার সঙ্গে মিশে শঙ্খ আর উলুধ্বনি। সামনে পড়ে রইল কাপড় চাদর টাকা চাল ডাল ঘি। জল গড়াতেই লাগল পোড়া-কাঠ ফক্কড়ের পোড়া চোখ থেকে।

'মহাসপ্তমীর ভোরে কার হাত দিয়ে তুই এ সমস্ত পাঠালি মা! এখনও তুই সত্যিই ভুলিস নি তোর এই দুষ্টু বজ্জাত ঘর-পালানো ছেলেকে! তোর ভাঁড়ারে এখনও তা'হলে আমার জন্যে সব কিছু সাজানো থাকে!

পূজা দেখতে বাঙলায় বাঙালীর কাছে হ্যাংলার মত ছুটে এসেছি। তারা ভুলে গেল সারা দিনে এক মুঠো খেতে দিতে। আর হাজার মাইল দূরের শেঠ-শেঠানীর হাত দিয়ে কিছুই যে দিতে বাকী রাখলিনি মা আমার!

চোখ বুজে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দু'খানি পা। যে পা দু'খানির ওপর মাথা রেখে এ জীবনের বহু জ্বালা জুড়িয়েছে, বহু আশ্বাস মিলেছে জীবনে যে চরণ দুখানি স্মরণ ক'রে।

ওঁরা উঠে গেলেন।

তার পরক্ষণেই পাট-গুদামের ওপাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল শতচ্ছিন্ন কাপড়-পরা এক কাঙালিনী। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার দিকে, আচমকা ওর অকল্পনীয় আবির্ভাবে আমার যেন বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

একটা কাল-সাপিনী হিসহিস ক'রে উঠল—"পালিয়ে এসেছি গোঁসাই, পালিয়ে এলাম তাদের কাছ থেকে।"

এ কি রকম গলার আওয়াজ ওর! পাট-গুদামের পাশ থেকে ভোরের লাল আলো তেরছা হয়ে পড়েছে ওর মুখের ওপর। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, সদ্য রক্ত-স্নান ক'রে এল নাকি?

"এবার বাঁচাও গোঁসাই, লুকিয়ে ফেল আমাকে। কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমায় ধরতে বার হবে। ধরতে পারলে কেটে ফেলবে আমায়। বলো গোঁসাই বলো কোথায় লুকোব আমি?"

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে, থরথর ক'রে কাঁপছে ওর সারা দেহ, সবটুক প্রাণ এসে জমা হয়েছে দুই চোখে।

স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। এ কি ফ্যাসাদ! কি ক'রে

ও জানলে আমার আস্তানা! কি দুষ্কার্য ক'রে এল ও? কোথায় ওকে লুকিয়ে রাখব আমি?

একান্ত অসহায় ভাবে ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম, "কোথায় যাবে এখন?"

আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল ও। "আমি তা কি ক'রে জানব গোঁসাই, কাল ত তুমি বললে ওদের কাছ থেকে পালাতে, তাই ত পালিয়ে এলাম তোমার কাছে।"

উন্মাদের মত হয়ে উঠল ওর মুখ-চোখের ভাব। হাড়িকাঠে ফেলবার পর কোপ দেবার পূর্ব-মুহূর্তে যে দৃষ্টি দেখা যায় পশুটার চোখে, সেই জাতের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর দুই চোখে। ওর বুকের মধ্যে যে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে তাও যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

টপ ক'রে কাপড় চাদর আর টাকা ক'টা তুলে নিলাম সামনে থেকে। নিয়ে জোর ক'রে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, "নাও পালাও এই নিয়ে। যদি পারো কিছু দিন লুকিয়ে থাকো গিয়ে চন্দ্রনাথে। কিংবা চলে যাও অন্য কোথাও। গতর খাটিয়ে খাওগে। ঝি রাঁধুনী যে কোনও কাজ পাও তাই নিয়ে বেঁচে থাক স্বাধীন ভাবে।"

চুপ ক'রে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। চোখের পাতা, ঠোঁট দুখানি, কাপড় চাদর ধরা হাত দু'খানিও থরথর ক'রে কাঁপছে। কি যেন বলতে গিয়েও পারলে না বলতে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, সেই সঙ্গে কাপড় চাদর সুদ্ধ দু'হাত বুকে চেপে ধরে পিছন ফিরে ছুটে চলে গেল।

ওর যাবার পথের দিকে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক্—বাঁচুক ও নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে। ওর বুকের মধ্যে নারীত্ব বলতে কোনও কিছু যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে সে জেগে উঠুক আজ এই মহাসপ্তমীর মহালগনে। তিলে তিলে দগ্ধে মরার হাত থেকে মুক্তি পাক্ ও—নবজন্ম লাভ করুক নতুন জগতের মাঝে।

নতুন প্রভাত। কর্ণফুলীর জলে টলটল করছে নতুন জীবন। উৎকট দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কর্ণফুলীর জলে। বহুক্ষণ ডুব দিলাম, ডুব দিয়ে দিয়ে নিঃশেষে ধুয়ে ফেলতে চাই অমঙ্গলের ছায়া মন থেকে। না, কিছুতেই কিছু হ'ল না। কোনও উপায়েই তাড়াতে পারলাম না তাকে বিস্মৃতির অন্তরালে। একটা অতি তুচ্ছ প্রশ্ন খচখচ করতে লাগল বুকের ভেতর।

কি যেন বলবার ছিল তার! কি যেন শোনানো বাকী রয়ে গেল তার আমাকে! শেষ কথাটি বলবার জন্যে কাঁপছিল তার ঠোঁট দু'খানি। হয়ত শোনার মত কথাই শোনাত সে, হয়ত বলার মত বলাই বলত আমায় কিছু! অত তাড়াহুড়ো ক'রে বিদেয় না করলেও চলত। অত ভয় যদি না পেতাম আমি। কিসের পরোয়া আমার? কার ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে বেহায়ার মত বিদেয় ক'রে দিলাম আমি তাকে? এমন কি সর্বনাশ হ'য়ে যেত আমার যদি সে আরও কিছুক্ষণ থাকত আমার কাছে? শোনা হ'ল না—তার শেষ কথাগুলি শোনা হ'ল না যে আমার। কি সেই কথা?

স্নান সেরে ফিরে এসে বসলাম আবার নিজের আসনে।

"গোড় লাগি বাবা, গোড় লাগি বাবা" একে একে পাঁড়ে চোবে মিশিরজীরা এসে চারিদিক ঘিরে বসতে লাগল। আগুন চড়ল ছিলিমে। সব ক'জনের মুখের ওপর খুঁজে দেখতে লাগলাম। কই—কারও মুখে ত দুশ্চিন্তার কালো ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না! সবাই সুখী, সকলেই মশগুল আপন আপন আনন্দে। শুধু আমি জলে পুড়ে মরছি—তুচ্ছ নোংরা একটা মেয়ে মানুষের কথা ভেবে ভেবে। জাত-জন্মের ঠিক-ঠিকানা নেই, নাম-গোত্রহীনা একটা আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা। খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু যার মাথায় ঢোকে নি সারা জীবনে, তার আবার কি বলবার থাকতে পারে আমাকে? সেই সব ছাই-ভস্ম শোনা হ'ল না বলে এত খুঁত খুঁত করছে কেন আমার বেয়াড়া মন? কেন?

ভেবে-বেগুনে জলে উঠলাম নিজের ওপর। আমি ফক্কড়, পাকা পোড়-

খাওয়া পেশাদার ফক্কড় আমি। এই মাত্র শেঠ-শেঠানীর শির লুটিয়ে পড়ল আমার চরণে। সেই আমি নোংরা বিশ্রী একটা যা তা ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে মরছি। ছিঃ।

বেশী ক'রে ভস্ম লেপে দিলাম কপালে আর সর্বাঙ্গে। তারপর যত্ন ক'রে লাগালাম এক মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে। কৌপীন এঁটে ন্যাকড়াখানি মেলে দিলাম রোদে। দু-মিনিট পরেই শুকিয়ে যাবে। তখন ওখানি জড়িয়ে পূজো দেখতে বার হবো শহরে।

শ্রীবজরঙ্গ মহারাজের স্নান আরম্ভ হ'ল তেল সিঁদুর মাখিয়ে। দূরে সহরময় ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম বহুবার শোনা মন্ত্রধ্বনি—অনেন গন্ধেন—অনয়া হরিপ্রিয়া—অনেন দধ্না। নিশ্চয়ই এতক্ষণে মহাস্নান আরম্ভ হয়েছে মায়ের। তন্ত্রধারক আর পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে মহাস্নানের মন্ত্র। গম গম করছে সব পূজা-মণ্ডপ। কিন্তু এদের ছেড়ে এখন উঠে যাওয়া যায় কি ক'রে?

ওধারে ফক্কড়ের বুকের মধ্যে যে যন্ত্রটা অবিরাম টিকটিক ক'রে চলে সেটা যেন বড্ড বেচালে বেতালে চলতে লাগল মহাসপ্তমীর মাহেন্দ্রক্ষণে। সেই আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার মুখ থেকে যা শোনা হ'ল না তার জন্যে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে লাগল মনের মধ্যে। অসহ্য রাগ হ'ল নিজের ওপর। কি বিশ্রী কৌতূহল! যাই এবার বেরিয়ে পড়ি, তুচ্ছ আপদের কথা নিয়ে ব'সে ব'সে মাথা ঘামিয়ে এমন দিনটি মাটি ক'রে কি লাভ!

কোনও লাভই নেই। অথচ লাভ যাতে হয় তেমন একটি কারবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল সামনে। ইনি সেই দরোয়ানজী—যিনি সকালে শেঠ-শেঠানীর সঙ্গে এসেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আমাকে যেতে হবে শেঠজীর বাড়ী দরোয়ানজীর সঙ্গে। শেঠজীর গদি দু কদম তফাতে। কৃপা ক'রে যেতেই হবে তৎক্ষণাৎ। যেতেই হবে—দরোয়ানজী গোড় পাকড়াতে তেড়ে এলেন।

কেন যেতে হবে? কি এমন ঘটল সেখানে যে তৎক্ষণাৎ যেতে হবে?

মুখ বন্ধ মৌনীবাবার, কাজেই প্রশ্ন করার উপায় নেই। অতএব উঠলাম এবং রওয়ানা হ'লাম। আর তখনই প্রথম খেয়াল হ'ল দরোয়ানজীর—একি! সেই ধুতি চাদর গেল কোথায়?

কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নাড়লাম।

"কেয়া! চোরি হো গিয়া?"

মাটির দিকে চেয়ে একান্ত বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সঙ্গে সকলে হৈ হৈ ক'রে উঠল। কত বড় স্পর্ধা চোর ব্যাটার! এখান থেকে সাক্ষাৎ বজরঙ্গলালের সামনে থেকে মৌনীবাবার কাপড় চাদর নিয়ে চম্পট দিলে! কখন হ'ল চুরি? নিশ্চয়ই যখন আমি নদীতে স্নান করতে গেছি সেই ফাঁকে নিয়েছে। চোবে পাঁড়ে মিশিরজীরা ক্ষেপে উঠলেন। শালা ডাকুকো পাকড়াতে পারলে একদম 'জানসে খতম' ক'রে দেওয়া হবে। আস্ফালন চরমে পৌঁছল। আমি আর কি করব—দরোয়ানজীর পিছু পিছু শেঠজীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'লাম।

শেঠ ব্রজকিষণলাল হরসুখরাম দাসের গদিতে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। শেঠজী স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ওপর। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে এলেন। রাস্তার ওপরেই আমার দু'পায়ে তাঁর দু'হাত ঠেকালেন। দরজার সামনে চাকর-দরোয়ান, অন্য সব কর্মচারীরা তটস্থ হ'য়ে আছেন চাপা উত্তেজনা থমথম করছে সকলের চোখে মুখে। ব্যাপার কি!

শেঠজী হাত জোড় ক'রেই আছেন, জোড় হাত ক'রেই সকলের মাঝখান দিয়ে নিয়ে চললেন আমাকে। গদি ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলাম, সাজসজ্জা দেখে মালুম হ'ল মালিকের ধন-দৌলতের বহর। বিশ হাত লম্বা আর হাত পনেরো চওড়া ঘরখানার চার দেওয়ালের মাথা জুড়ে পাশাপাশি টাঙানো হয়েছে বড় বড় ছবি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও ঘটনা বাদ নেই। তার সঙ্গে কিষণ ভগবানের রাসলীলা কয়েকখানি। ঘর জুড়ে এক হাত উঁচু গদি পাতা, যার ওপর ব'সে এঁরা ধর্ম আস্বাদন করতে করতে ব্যবসা করেন ব ব্যবসা করতে করতে ধর্ম আস্বাদন করেন। সেই গদির মাঝখানে কার্পেটের

আসন বিছানো হ'য়েছে। আমার কাদা-মাখা আটফাটা শ্রীচরণ দু'খানি নিয়ে দুধের মত সাদা গদি মাড়িয়ে গিয়ে বসতে হবে সেই কার্পেটের আসনে।

ফক্কড়োচিত বেপরোয়া ভাবটুকু বজায় রেখে তাই করলাম, বসলাম গিয়ে কার্পেটের আসনে। অনেক দূরে গদির সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে সকলে প্রণাম করতে লাগল। এক ধারে দাঁড়িয়ে শেঠজী চাপা গলায় একে ওকে তাকে হুকুম দিচ্ছেন। বেশ বড় গোছের একটা কিছু আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু কি সেটি!

নির্বিকার ভাবটি ষোল আনা বজায় রেখে চোখ বন্ধ ক'রে সোজা হ'য়ে বসে রইলাম গদির মাঝখানে। জানবার জন্যে যতই মন ছটফট করুক, বাইরে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেই সব মাটি। নির্লিপ্ত অনাসক্ত নিষ্কাম মুক্তপুরুষ হচ্ছে জাত ফক্কড়, সেই গুণগুলি বজায় রাখতেই হবে। নয় ত এত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় এসবের কোনও মূল্যই থাকে না যে। সময় যখন হবে তখন সবই জানা যাবে এই ব'লে মনকে দাবড়ি দিলাম।

এই রকমই হয়। এই ভাবে অসংখ্যবার ফক্কড়ের ভাগ্য ফক্কুড়ি করে। আচমকা বানায় রাজার-রাজা, আবার চক্ষু না পালটাতেই আছাড় মাড়ে পথের ধূলায়। ভাগ্যের এই ফাজলামিটুকু যতদিনে না ঠিক মুখস্থ আর ধাতস্থ হ'য়ে যায়—ততদিনে মানুষ কুলীন ফক্কড় হ'তে পারে না।

একখানি দুখানি ক'রে অনেকগুলি গাড়ী এসে জমা হ'ল বাড়ীর সামনে। শেঠজীরা নেমে এসে আমার চার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। মস্ত ঘোমটা টেনে শেঠানীরা চলে গেলেন বাড়ীর ভেতর। গুজগুজ ফুসফুসে বাতাস ভারী হ'য়ে উঠল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই মৌনীবাবার।

অবশেষে কমলা রঙের কাপড় হাতে ব্রজকিষণবাবু উপস্থিত হলেন। আমায় বস্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। হাতে নিয়ে দেখি সিল্কের তৈরী মহামূল্যবান বার্মিজ লুঙ্গি দুখানি। ওই জাতের কাপড়ের মূল্য জানা ছিল। অন্তত দশ টাকা দাম হবে, সেই হাত-ছয়েক ক'রে লম্বা দুখানি কাপড়ের। তা হোক, তাতেও যাবড়ালে চলবে না।

একান্ত তাচ্ছিল্য ভরে অত জোড়া চোখের সামনে কাপড় চাদর অঙ্গে ধারণ ক'রে ফেললাম। অন্তর্ধান করলে ফক্কড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়া।

তখন এল সুগন্ধি তেল আর আতর। দু'জন চাকর আমার ফাটা ঠ্যাং দু'খানিতে তেল মাখাতে বসল। রুক্ষ জট পাকানো চুলে অনেকটা আতর ঢেলে দিলেন স্বয়ং শেঠজী। হলুদ রঙের চন্দন থাবড়ানো হ'ল কপালে। নির্বিকার ভাবে সহ্য করতে হ'ল সমস্ত আদর—মহাপুরুষ যে।

তখন শেঠজীরা একে একে উঠে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন। এক গাদা নোট টাকা জমে উঠল সামনে। কিন্তু সেদিকেও ফক্কড় নজর দেবে না।

শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাড়ীর ভেতর। এবার শেঠানীরা ভক্তি দেখাবেন। সুতরাং দু'চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইলাম। আর একবার মাথায় আতর ঢালা হ'ল, কপালে হলুদ রঙের চন্দন দেওয়া হ'ল, পায়ের ওপর প্রণামী রেখে সকলের প্রণাম করা হ'ল।

দম প্রায় ফাটবার উপক্রম তখন। এঁদের এই হিমালয়ের মত ভক্তির ঢেউটা হঠাৎ ঠেলে ওঠবার হেতুটি কি! হাবুডুবু খেয়ে মারা যাব যে ভক্তির অতল সাগরে! কি এমন হ'ল যার দরুন এঁরা পাগল হ'য়ে উঠলেন?

ওধারে তখন স্বয়ং শেঠজী আবার উপস্থিত হয়েছেন একখানি রুপার থালা হাতে নিয়ে। থালাখানি সামনে নামাতে দেখি তার ওপর এক ছড়া সোনার হার। ব্রজকিষণ-পত্নী এগিয়ে এসে হারটি আমার পায়ের ওপর রাখলেন। শেঠজী তুলে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলেন আমার। তারপর এল প্রকাণ্ড এক থালা সন্দেশ। একখানি সন্দেশের কোণ ভেঙে মুখে ফেললাম। শেঠ-পত্নী থালাখানি মাথায় তুলে নিয়ে চলে গেলেন প্রসাদ বিতরণ করতে।

তখন ফাঁকা হ'য়ে গেল ঘর। দরজা বন্ধ ক'রে শেঠজী এসে বসলেন আমার সামনে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

একবার ওপর দিকে তাকিয়ে একবার ঘাড় চুলকে নিয়ে তারপর ডান হাতের হীরে বসানো আংটিটি নিরীক্ষণ করতে করতে বিনীতভাবে বললেন

শেঠজী—"মহারাজ দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাব কি ?"

তাঁকে একদম স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে আমি পাল্‌টা একটি প্রশ্ন করে বসলাম—"আমাকে নিয়ে এত সমারোহ লাগিয়েছ কেন শেঠ ?"

মৌনীবাবা এত স্পষ্ট ক'রে হঠাৎ কথা ব'লে ফেলবেন তা শেঠজীর ধারণায় ছিল না। আমতা-আমতা ক'রে বললেন—"সবই ত আপনি জানেন মহারাজ। আজ ভোরে আমার স্ত্রী মনে মনে আপনার কাছে মানত ক'রে এসেছিলেন, যদি আমরা আমাদের হারানো ছেলের সংবাদ পাই, তা'হলে আপনাকে পূজা করব। এক ঘণ্টার মধ্যে দেশ থেকে 'তার' পেলাম যে ছেলে বাড়ী ফিরেছে। পাঁচ বছর তার কোন পাত্তা ছিল না। হাজার হাজার রূপেয়া খরচা হ'য়ে গেল কিন্তু এতটুকু সংবাদ পর্যন্ত আমরা পাইনি তার। আপনি কৃপা করলেন, আমার গুদামের সামনে ধুনি লাগালেন, কি খেয়াল হ'ল শেঠানীর, সে গিয়ে আপনার কাছে মানত ক'রে এল আর আমরা হারানো ছেলে ফিরে পেলাম। এ সবই আপনার কৃপা, সাক্ষাৎ অবতার আপনি। কৃপা করে যখন অধমের ঘরে পদার্পণ করেছেন তখন দু'একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেবককে কৃতার্থ করুন।"

হাত তুলে তাঁকে থামালাম। বললাম—"শেঠ, তুমি ভক্ত, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রশ্ন যে কি তাও আমার মালুম আছে। আজ উত্তর পাবে না, যা জানতে চাও তিন দিন পরে জানতে পারবে। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বললাম, তোমায় কৃপা করলাম এ তুমি কাউকে বোল না—সাবধান।"

হাত জোড় ক'রে বললেন শেঠজী—"নিশ্চয়ই, কেউ কোনও কথা জানতে পারবে না মহারাজ। কিন্তু আমার এক ভিক্ষা আছে—আপনি আর পায়ে হেঁটে শহর ঘুরতে পারবেন না। আমাকে যখন কৃপা করেছেন তখন আমার এ আব্দারটুকু আপনাকে রাখতেই হবে। একখানা গাড়ী আপনার জন্যে রাত দিন হাজির থাকবে। যখন যেখানে যাবেন সেই গাড়ীতেই যাবেন। আমার চাকর দরোয়ান সঙ্গে যাবে আপনার। যে ক'দিন এই শহরে দয়া ক'রে থাকবেন

সে ক'দিন সেবকের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।"

মনে মনে হাসলাম। আমার ওপর পাহারা বসাতে চায় বেনিয়া। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে না যায় পাখী—তাই এত সাবধানতা। কিছু ক্ষতি নেই, প্রয়োজন হ'লে বেমালুম হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে ফক্কড়।

আধ ঘণ্টা পরে সোনার হার গলায় দিয়ে কমলা রঙের বাস্মিজ কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে শেঠ ব্রজকিষণলালের চকচকে মোটরে গিয়ে উঠলাম। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল সকালের সেই দরোয়ানজী হাতে একটা লাল খেরোর থলি নিয়ে। ওটার মধ্যে নোট টাকা বোঝাই, দরাজ হাতে প্রণামী দিয়েছেন শেঠ-শেঠানীরা। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন শেঠজী—সহরের সব ক'খানি ঠাকুর দেখিয়ে আনতে হবে। গাড়ী ছুটল।

স্বপ্ন।

যে পথের ওপর দিয়ে তিন মিনিটে এক মাইল পার হ'য়ে চলেছি, কাল সন্ধ্যার পরে এই পথে যখন ফির'ছিলাম ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে তখন কি মনের কোণেও একবার উদয় হয়েছিল যে রাত পোহালে এই পথের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারব! কাল এই পথ ফুরতে চাচ্ছিল না কিছুতেই—আর আজ চক্ষের নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ যে কোণের বটগাছ-তলায় বসে বুড়িটা শাক-পাতা বেচছে, ঐ সেই চায়ের দোকানটা যার সামনে রাস্তায় ওপর দাঁড়িয়ে দু'দিন আমি চা কিনে খেয়েছিলাম আর ঐ সেই শুঁটকী মাছের দোকানটা। দোকানটার সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করতে পেটের নাড়ীভুঁড়ি উঠে আসবার যোগাড় হ'ত। হুস হুস ক'রে উল্টো দিকে ছুটে চলে গেল সব। স্বপ্ন, একেই বলা চলে নির্জলা স্বপ্ন। যা অন্য কারও বরাতে কখনও সত্য হয়ে ওঠে না, একমাত্র ফক্কড়ের বরাত ছাড়া।

প্যাণ্ডেলের সামনে থামল গাড়ী। দৌড়ে এল কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ভিড় সরিয়ে খাতির ক'রে এগিয়ে নিয়ে চলল প্রতিমার সামনে। কর্তা ব্যক্তিরা সামনে পিছনে ঘিরে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন মোটরে। খাতিরের চূড়ান্ত।

প্রতিমার সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলাম। দারোয়ানজী ঝোলাটা সামনে ধরলে। তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো টাকা বার ক'রে ছুঁড়ে দিলাম দেবীর সামনে। ঝনঝন ক'রে উঠল চারিদিক। ফিস ফিস ক'রে তখন দরোয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করছেন সকলে—কে ইনি? কে এই মহাপুরুষ?

"শেঠ ব্রজকিষণলাল হরসুখ রামদাস বাবুর গুরুজী মহারাজ।" চোখে মুখে ভক্তি নয়, একটা যেন আতঙ্ক ফুটে উঠল সকলের। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহসই হ'ল না কারও। বাপ্‌স্—কত বড় মানুষের গুরু! গুরু সম্বন্ধে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করাও হয়ত অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে।

একে একে তিনটি প্রতিমা দর্শন করে শেষে গাড়ী এসে দাঁড়াল সেই প্যাণ্ডেলের সামনে—কাল অনেক ঘড়া জল তুলে রেখে গেছি যেখানে সেই বাড়ীর দরজায়। ছুটে এলেন স্বয়ং সুরেশ্বর বাবু সম্পাদক মশাই। না জানি কোন্ মহামান্য অতিথি এলেন দয়া করে দেবী দর্শন করতে চক্‌চকে গাড়ী চেপে! ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে দরোয়ানজী পেছনের দরজা খুলে ধরলে। মাথা নিচু করে আমি নামলাম।

সামনেই সুরেশ্বর বাবু, হাসি হাসি মুখ ক'রে দু'হাত কচলাচ্ছেন। আমি মুখ তুলতেই ঝপ্ ক'রে তাঁর মুখের হাসি উবে গেল। গোল গোল চোখ দুটি কপালে উঠে গেল একেবারে। নিচেকার ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, হাঁ ক'রে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি। যে ছোকরাটি কাল আমার হাত চেপে ধরেছিল সেও ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। সামনা-সামনি পড়েই একটি উৎকট বিষম খেলে গলায়—আর সেই সঙ্গে এক বেসামাল হোঁচট পায়ে। কোনও রকমে হাসি চেপে ধীর পদক্ষেপে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পুজো আরম্ভ হয়েছে। পুরোহিত তন্ত্রধারক আপন আপন কর্মে ব্যস্ত। ডান পাশে বাঁশের ওধারে বসে আছেন কয়েকজন ভদ্র মহিলা। তাঁদের কাপড়ের খসখস শব্দ আর গহনার আওয়াজ কানে এল। আমার অঙ্গ-বস্ত্রের শব্দও কিছু কম হচ্ছে না। গলায় ঝোলানো সোনার হারটাও নিশ্চয়ই দেখছে

পাচ্ছে সকলে। বহুমূল্য আতরের গন্ধে ত প্যাণ্ডেল ভরে গেছে। হাঁটু গেড়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে প্রণাম করলাম। দারোয়ান থলিটা সামনে এগিয়ে ধরলে।

দু'হাত পুরে এক আঁজলা টাকা তুলে নিলাম। চোখ বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ বুকের কাছে ধরে রইলাম দু'হাত ভর্তি টাকা। তারপর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি এইভাবে জোড়-হাত মাথার ওপর তুলে ফেলে দিলাম টাকাগুলো বাঁশের ওধারে। এইভাবে বার বার তিনবার। টাকা পড়ার ঝনঝন শব্দে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল—না জানি মা দুর্গা কি ভাবছেন এখন মনে মনে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, মাও হাসছেন মুখ টিপে—আমার কাণ্ড দেখে। আবার নত হ'য়ে একটি প্রণাম করে উঠে ফিরে চললাম কোনও দিকে না চেয়ে। পিছনে চলল এক বিরাট ভিড়। বহুবার এক কথা বলতে হচ্ছে দরোয়ানজীকে—শেঠ ব্রজকিষণলালের গুরুজী মহারাজ।

গাড়ীতে ওঠবার আগে সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলেন। হুড়োহুড়ি লেগে গেল পায়ের ধুলোর জন্যে। ভ্রূক্ষেপ না করে মোটরে গিয়ে উঠলাম। মোটর চলতে আরম্ভ করল। হাসিতে তখন আমার পেট ফুলছে। ওঁরা এখন যা বলাবলি করছেন তা যদি শুনতে পেতাম! জল তুলিয়ে শতরঞ্চি বইয়ে যে মহাপরাধ ক'রে ফেলেছেন সুরেশ্বর তার জন্যে হয়ত এখন নিজের চুল ছিঁড়ছেন! নিশ্চয়ই সম্পাদক মশায়ের গোঁড়া ভক্তরা এতক্ষণে মারমুখো হ'য়ে উঠেছে তাঁর ওপর। হায়—সম্পাদক হবার কি চরম বিড়ম্বনা!

হঠাৎ গাড়ী থামল। সজোরে এক ঝাঁকানি খেলাম। চোখ তুলে দেখি গাড়ীর সামনে পড়েছে একটা মেয়ে মানুষ। রাস্তার দু'ধার থেকে অনেক লোক মার মার ক'রে তেড়ে আসছে তার দিকে। নজর পড়ল স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর। আঁতকে উঠলাম একেবারে।

দু'জন পুলিশ তার দু'হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তা সাফ্ ক'রে দিলে। বুক-কাটা আর্তনাদ করছে সে। গাড়ীর পাশ থেকে কে বলে উঠল

"খুনী মেয়ে মানুষ, খুন করে পালাচ্ছে। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। এইবার বাছা টের পাবে খুন করার মজা।"

গাড়ীর ভেতর এক কোণে মুখ লুকিয়ে ব'সে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে ঘা মারতে লাগল সেই অসহায় আর্তনাদ। আমার দেওয়া নতুন কাপড় চাদর প'রে আছে সে। একবার মাত্র দেখতে পেলাম তার চোখের দৃষ্টি। কি ভীষণ কি নিদারুণ অসহায় সেই দৃষ্টি, যেন দিশাহারা হয়ে কাকে খুঁজছে।

ভয়ে কুঁকড়িসুকড়ি মেরে ব'সে রইলাম গাড়ীর কোণে। কি সবনাশ—ঐ নতুন কাপড় চাদর কেন মরতে দিতে গেলাম ওকে! কাপড় চাদরের খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই পুলিশ সব জানতে পারবে। আমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ তা জানবার জন্যে তখন পুলিশ আসবে আমার কাছে। আমার নামে পুলিশের কাছে যে কি বলবে নচ্ছার মেয়েমানুষটা তাই বা কে জানে! পুলিশ আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, খামকা কি একটা জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম।

কিন্তু কাকে ও খুন ক'রে পালাচ্ছে? খুন সে করেছে নিশ্চয়ই। তার চেহারার অবস্থা দেখে আমারও সন্দেহ হয়েছিল যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ক'রে এসেছে সে। ওরকম মেয়ে মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। খুন জখম গলাকাটা কিছুই ওই জাতের স্ত্রীলোকের পক্ষে আটকায় না। চুলোয় যাক গে, যা খুশি ক'রে মরুক, কিন্তু এখন আমিও যে জড়িয়ে পড়ব সেই কাপড় চাদরের জন্যে। কেলেঙ্কারির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

সব চেয়ে মুখস্থ আছে যে উপায়টি, সেইটিই সর্বপ্রথম মগজে উদয় হ'ল। পাট-গুদামে যাবার রাস্তার মোড়ে গাড়ী থামাতে ইসারা করলাম দরোয়ানের পিঠে ঠেলা দিয়ে। এখন যত শীঘ্র পারা যায় মহাপুরুষকে মহাপ্রস্থান করতে হবে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

যেখানে পাতা ছিল আমার ছেঁড়া কম্বলের টুকরো সেখানে পৌঁছে আর চিনতেই পারলাম না জায়গাটাকে। ইতিমধ্যে আগাগোড়া ভোল ফিরে গেছে;

মস্ত একটা রঙীন চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে সেখানে। ধুনির জন্যে বড় বড় কাঠের কুঁদো এনে জমা করা হয়েছে। একখানা বেঁটে তক্তপোষ পেতে তার ওপর নতুন কম্বল আর কার্পেটের আসন বিছানো হয়েছে। আশপাশ সাফ্ ক'রে ফেলবার জন্যে ঝাড়ু কোদাল হাতে লেগে গেছে কয়েকজন। ব্রজকিষণবাবুর গুরুজী মহারাজ বেশ কিছু দিনের জন্যে ধুনি জে্বলে তিষ্ঠোবেন এখানে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সব তোড়জোড় চলেছে।

চলুক—আমার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই তাতে। কিন্তু আমাকে এখন খুঁজে বার করতে হবে ফক্কড়ের আদি ও অকৃত্রিম সুহৃদ সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া দুখানিকে। এই মহামূল্য চাদর কাপড় জড়িয়ে সরে পড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। রাস্তায় নামলে এই পোষাক অন্ধেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গলার হার ছড়াটার হাত থেকেও গলা বাঁচানো প্রয়োজন, নয়ত ওটার জন্যেই পড়তে হবে পুলিশের খপ্পরে।

সোজা গিয়ে ঢুকলাম শ্রীহনুমানজীর বেঁটে মন্দিরে। কাছা দিয়ে খাটো গামছা সেঁটে পরে আড়াইমনি পুরুত মশাই একখুরি তেল-সিঁদুর-গোলা নিয়ে প্রভুর অঙ্গ সেবা করছিলেন তখন। সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। গলা থেকে সোনার হারছড়া খুলে নিয়ে বজরঙ্গ মহারাজের গলায় পরিয়ে দিলাম। তারপর খুব ভক্তিভরে একটি প্রণাম করলাম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

"জয় ভগবান রামচন্দ্র ভকত বজরঙ্গ মহারাজ!"

আকাশ-ফাটা চিৎকার উঠল। পুরুতেরও চক্ষু তখন চড়ক-গাছে উঠেছে। সোনার হারছড়া ঠাকুরের গলায় চাপিয়ে দেব এতটা ভয়াবহ ভক্তি তিনি আশা করেন নি। তেল সিঁদুরের খুরি ফেলে সেই হাতেই তিনি আমার গোড় পাকড়ালেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকেও কৃপা ক'রে বসলাম। গা থেকে চাদরখানি খুলে তাঁর উর্দ্ধাঙ্গে জড়িয়ে দিলাম। মৌনীবাবা না হ'লে এই ব'লে তাঁকে আশীর্বাদ করতাম যে নিম্নাঙ্গে খাটো গামছা সেঁটে ঠাকুর-সেবা করার প্রবৃত্তি থেকে যেন তিনি মুক্ত হন। কারণ যত বড়ই বজরঙ্গ-ভক্ত হোক, তবু মানুষ মানুষই। সুতরাং সব কিছুর শালীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হঠাৎ আর একটি মতলব খেলে গেল মাথায়। এই পুরুত-পুঙ্গবই ত আমায় মুক্তি দিতে পারেন—আমার নিম্নাঙ্গের বামিজ লুঙ্গির বেষ্টন থেকে। শালীনতা গোল্লায় পাঠিয়ে এতটুকু দ্বিধা না ক'রে কোমর থেকে খুলে সেখানি পুরুতের কোমরে জড়িয়ে দিলাম। দিয়ে শুধু নেংটি পরা অবস্থায় বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। বিরাট হৈ-চৈ লেগে গেল। কেউ কি কখনও দেখেছে না কি এতবড় ত্যাগী মহাপুরুষ! তৎক্ষণাৎ শেঠজীর কাছে সংবাদ জানাতে লোক ছুটল—সর্বস্ব দান করে গুরুজী মহারাজ আবার যে কে সে-ই হয়ে বসে আছেন। এক দরোয়ানজীর কাঁধে ছিল একখানা গামছা, সেখানা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে আসনে গিয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি ভক্তরা কলকেয় আগুন চাপাতে লেগে গেল।

কিন্তু তারপর?

কপালে হাত দিয়ে ব'সে উপায় ঠাওরাতে লাগলাম। সহজ নয়, এত জোড়া চোখের সামনে থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। এতক্ষণে পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মানুষটিকে, যার কাছ থেকে খুনে মেয়েমানুষটা নতুন কাপড় চাদর পেয়েছে। যে জামা কাপড় পরে রাত্রে সে খুন করেছে সেগুলো ভোর বেলাই পালটে ফেলবার জন্যে নতুন কাপড় চাদর পেল কোথা থেকে সে? খুনের প্রমাণ রক্ত-মাখা কাপড়-জামা লোপাট ক'রে ফেলতে কে ওকে সাহায্য করলে? সেই লোকটির সঙ্গে খুনীর সম্বন্ধই বা কি? তারপর যখন জানতে পারবে, কাল আমি ওদের বাসায় গিয়েছিলাম আর আমিই ওকে পালিয়ে আসতে প্ররোচনা দিয়েছিলাম তখন আমাকে খুনের সঙ্গে জড়াতে পুলিশের এতটুকু দ্বিধা হবে না।

হয়ত এখন পুলিশ ব্রজকিষণবাবুর কাছে বসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছে আমার সম্বন্ধে। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই এখানে আসবে আমায় গ্রেপ্তার করতে। তখন কি কুৎসিত কাণ্ডই না হবে এখানে! এতগুলি সাদাসিধে মানুষের মনে কি আঘাতই না লাগবে! এক বেটা ভণ্ডকে নিয়ে ওরা মাতামাতি করছে, একটা খুনে মেয়েমানুষের সঙ্গে যার যোগাযোগ তার পায়ে ওরা

মাথা লুটিয়ে দিয়েছে, সাধু সেজে একটা ঝানু বদমাস ওদের ঠকাচ্ছিল এতদিন, এই সব বুঝতে পেরে রাগে ক্ষোভে অপমানে সেই লোকগুলির চোখ-মুখের অবস্থা যে কতদূর হিংস্র হয়ে উঠেছে তখন, তা কল্পনা ক'রে শিউরে উঠলাম।

বাইরে নির্বিকার ভাবটি বজায় রেখে কলকে হাতে নিয়ে প্রসাদ ক'রে দিলাম। এক লোটা ভাঙ-ঘোঁটা এসে নামল সামনে। লোটাটা উঁচু ক'রে তার ভেতরের পদার্থ খানিকটা গলায় ঢেলে ওদের ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একটা এসপার-ওসপার করবার জন্যে তৈরী হলাম। এক পাশে বসানো ছিল জল-ভর্তি আমার তোবড়ানো পেতলের লোটাটি, সেটি হাতে নিয়ে চললাম নদীর দিকে। একবার যদি নামতে পারি নদীতে, তারপর দেখা যাবে এরা আমার পাত্তা পায় কেমন ক'রে। যতক্ষণ পারব সাঁতরাবো, তারপর যা আছে কপালে। শাম্পান নৌকো জাহাজ যে কোনও একটায় আশ্রয় পাবই, তারপর আরাকান বর্মা বা আরও দূরে কোথাও গিয়ে পৌঁছব। নয়ত সোজা যমের বাড়ী গিয়ে উঠব। তবু এদের সামনে ধরা পড়ে' এদের মনে আঘাত দেব না কিছুতেই। আমার মত একটি আস্ত ঈশ্বরের অবতারকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাতে হ'ল বলে সবাই চিরকাল হায় হায় করতে থাকুক। এদের ভক্তি দেখানো সার্থক হ'ক।

গুরুজীকে লোটা হাতে নদী বা জঙ্গলের দিকে যেতে দেখলে ভক্তরা পিছু নেয় না। ভাগ্যে এই নিয়মটি এখনও চালু আছে জগতে। সুতরাং ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙের লোটা আর কল্কেতে মশগুল হয়ে রইল, আমি মহাপুরুষ-জনোচিত গুরু গম্ভীর চালে লোটা হাতে সরে পড়লাম। পাটগুদাম ঘুরে নদীর পাড়ে পৌঁছতে দু'মিনিটও লাগল না। একবার পিছন ফিরে দেখে নিলাম কেউ আসছে কি না পিছু পিছু। কেউ না, তরতর ক'রে নেমে গেলাম জলের ধারে। এইবার দুর্গা নাম নিয়ে একটি ঝম্প-প্রদান—ব্যাস।

সামনে থেকে কি একটা আওয়াজ আসছে না? ভট্‌ভট্‌ ফট্‌ ফট্‌ ক'রে একখানা মোটর বোট এসে থামল সামনে। এ সময় এখানে এ আপদ আবার

জুটল কোথা থেকে! আর কি জায়গা ছিল না কোথাও বোট ভিড়োবার? জনা তিনেক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা নামলেন। এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ওদের একজন বললেন, "এই ঘাটেই নামতে হবে, ভাল ক'রে জেনে এসেছ ত?" আর একজন জবাব দিলেন, "হাঁ হাঁ—এই ত সামনেই ব্রজকিষণবাবুর গুদাম। গুদামের ওপাশে সেই ছোট্ট হনুমানজীর মন্দিরের সামনে তাঁর আসন পড়েছে। সেই কথাই ত বলে দিলেন সুরেশ্বরবাবু।"

ভদ্রমহিলাটি বললেন—"বোটে না এসে গাড়ীতে এলেই হ'ত। শেঠজীর গদিতে খোঁজ নিয়ে আসা যেত।"

"আবার কে যায় অত ঘুরতে, সপ্তমী পূজোর দিন এতক্ষণে লোকের ভিড়ে গাড়ী চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে রাস্তায়। এই ভাল হ'ল, চট ক'রে পৌছে গেলাম।"

মহাপুরুষ দর্শন করতে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন আমার পাশ দিয়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের নাম খোদাইকরা পেতলের তকমাআঁটা একটি চাপরাসী বসে রইল বোটের সামনে। বন্দরের হোমরা-চোমরা কর্মচারীরা চলেছেন শেঠজীর গুরু দর্শন করতে। যান—ততক্ষণে এধারে গুরুজী অন্তর্ধান করুক কর্ণফুলীর জলে।

কিন্তু বোটের পাশে জলে নামা গেল না। আরও এগিয়ে চললাম ডান দিকে, চাপরাসীর নজর এড়িয়ে জলে নামতে হবে।

এগিয়ে যাচ্ছি আর পিছন ফিরে দেখছি। বোটের ওপর বসে লোকটি চেয়ে আছে আমার দিকে। কাজেই আরও অনেকটা এগিয়ে যেতে হ'ল। সেইখানে সামান্য ঘুরে গেছে নদী। ভালই হ'ল, বাঁকটা ঘুরে গিয়ে চাপরাসীর নজরের আড়াল হ'য়ে জলে নামব। জোরে পা চালালাম।

বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল জলের ধারে নামানো হচ্ছে একখানি দুর্গা প্রতিমা।

একি কাণ্ড! মহাসপ্তমীর দিন দুপুর বেলা দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে কেন?

ভুলে গেলাম নিজের বিপদের কথা, ভুলে গেলাম যে আমাকে তখনই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান মান বাঁচাতে হবে, ভুলে গেলাম যে আমি একটি মৌনীবাবা। দৌড়ে গেলাম প্রতিমার কাছে। দশ-পনেরো জন ভদ্রলোক এসেছেন প্রতিমার সঙ্গে। জনা-আষ্টেক মুটে প্রতিমা নামিয়ে হাঁপাচ্ছে। সামনে যাঁকে পেলাম তাঁরই হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "একি সর্বনাশ করছেন আপনারা! আজ বিসর্জন দিচ্ছেন কেন মাকে ?"

এক ঝটকায় তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুখে উঠলেন, "দিচ্ছি বেশ করছি— তাতে তোমার কি ?"

তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দয়া ক'রে বলুন না মশাই, আজ মহাসপ্তমীর দিন কেন প্রতিমা ভাসিয়ে দিতে এসেছেন ?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—"সে কথা শুনে কি লাভ হবে তোমার ? আমাদের দ্বারা মায়ের পূজো হ'ল না, তাই ভাসিয়ে দিচ্ছি।"

ওধার থেকে কে ভারী গলায় হুকুম দিলেন—"লেও আভি উঠাও ঠাকুর।"

দৌড়ে গিয়ে প্রতিমার কাঠামো আঁকড়ে ধরলাম—"না, কিছুতেই দেব না প্রতিমা তুলতে, আগে আপনাদের বলতেই হবে কেন বিসর্জন দিচ্ছেন আজ মাকে।"

তেড়ে এসে একজন আমার ঘাড় চেপে ধরলেন, আর দু'জনে ধরলেন দুই হাত। টানাটানি হেঁচড়াহিঁচড়ি সুরু হয়ে গেল। দু'-এক ঘা পড়লও আমার পিঠে। দূর থেকে কে হুকুম দিলেন—"মার বেটা পাগ্‌লাকে, আচ্ছা ক'রে বেটাকে শিখিয়ে দে, পাগলামী ছেড়ে যাক।" সবাই 'মার মার' ক'রে চেঁচাতে লাগলেন। এই সময়ে সকলের গলা ছাপিয়ে বাজখাই গলায় কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"আরে ক্যা হুয়া, ক্যা চল্ রহা উধার।"

কোনও রকমে মুখ তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার এক গর্জ্জন—"আরে গুরুজী মহারাজকো—" আর কিছু আমার কানে গেল না। কিল চড় ঘুষির শব্দে, পরিত্রাহি চিৎকারে নিমেষের মধ্যে নদীতীর কাঁপতে লাগল। রৈ রৈ

শব্দ উঠল পাট-গুদামের দিক থেকে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে হনুমানজীর চেলারা হুড়মুড় ক'রে নেমে এলেন। বিসর্জন দিতে এসেছিলেন যাঁরা, তাঁরা অন্তর্ধান করলেন, এক পাশে দাঁড়িয়ে মুটেরা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে তখন। আর বজরঙ্গবালীর সাক্ষাৎ বংশধরেরা আমাকে আর প্রতিমাকে ঘিরে প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন করছে—"জয় দুর্গা মাইকী জয়।"

ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন শেঠ ব্রজকিষণলাল, তাঁর পিছনে পিল পিল ক'রে নামতে লাগল মানুষ। মারোয়াড়ী-গুষ্টির যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় এসে গেলেন। চাকর দরোয়ান কর্মচারীদের মধ্যে কেউ বাকি রইল না আসতে। ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোমটা ফাঁক ক'রে মহিলারাও দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা।

খাকী-পরা বিশাল এক পুলিশ সাহেবও তাঁর অনুচরদের নিয়ে নামতে লাগলেন। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। হায়, কেন মরতে প্রতিমা ধরতে গেলাম! এখন উপায় কি? ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম হাজারখানেক মানুষ ঘিরে রয়েছে। এতটুকু সম্ভাবনা নেই আর কোনও চালাকি করবার। দাঁতে দাঁতে চেপে প্রতিমার কাঠামো ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মাটির দিকে চেয়ে।

চিৎকার ক'রে গোলমাল থামালেন ব্রজকিষণ বাবু। আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও বেশী চোট লেগেছে কি না। মাথা নাড়লাম।

তখন খোঁজ পড়ল প্রতিমাখানি কাদের, কারা এনেছে প্রতিমা বিসর্জন দিতে। মুটেরা বললে, সহরের কোন বারোয়ারি পূজার প্রতিমা এখানি। বাবুদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ায় সকালবেলা পূজা সুরু হয় নি। যখন কিছুতেই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হ'ল না তখন একদল বাবু ক্ষেপে গিয়ে প্রতিমা তুলে আনলে নদীতে ডুবিয়ে দিতে, পূজার লেঠা চুকিয়ে দিতে একেবারে।

শুনে হাসব না কাঁদব ঠিক করতে না পেরে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম মায়ের মুখের দিকে।

পুলিশ সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "ঐ বারোয়ারির ব্যাপারই ঐ রকম। প্রতিবারই কেলেঙ্কারি হয় ওখানে। এবার একেবারে চরমে দাঁড়িয়েছে।"

ব্রজকিষণ বাবু সাহেবের পরিচয় দিলেন আমায়। সাহেব হচ্ছেন ডি. এস পি, ব্রজকিষণ বাবুর বিশেষ বন্ধুলোক। বড় ভক্ত মানুষ, মহাপুরুষ দর্শন করতে এসেছেন। সাহেবের বাড়ী বেহারে। নাম তেওয়ারী সাহেব।

তখন তেওয়ারী সাহেব মাথায় টুপি খুলে পাশের লোকের হাতে দিয়ে কোনও রকমে নীচু হয়ে আমার পায়ে হাত ঠেকালেন। যাঁরা মোটর বোট থেকে নেমে ওপরে গিয়েছিলেন, তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তেওয়ারী সাহেবের পেছনে। তাঁরা বললেন, "বোট থেকে নেমেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি আমরা। ওঁকে চিনতাম না, আর তখন বুঝতেও পারি নি যে কেন উনি সে সময় নদীর ধারে একলা দাঁড়িয়েছিলেন।"

মহিলাটি বললেন, "অন্তর্যামী না হ'লে কি ক'রে উনি জানতে পারলেন যে এ সময় এখানে কেউ প্রতিমা নিয়ে আসছে।" পুলিশ সাহেবকে পাশ কাটিয়ে সামনে এসে তিনি আমার পায়ে মাথা ঠেকালেন।

তখন আর এক চোট রৈ-রৈ উঠল, "জয় গুরুজী মহারাজকো জয়"

শেঠ ব্রজকিষণলাল হুকুম দিলেন—"নিয়ে চলো প্রতিমা, আমরা পূজা করব। সাক্ষাৎ গুরুজী প্রতিমা কেড়ে নিয়েছেন। কাজেই পূজা করতেই হবে। দুর্গা মাই কৃপা ক'রে শেষে এসেছেন আমাদের কাছে।"

বার বার আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল জয়ধ্বনিতে। দুর্গা মাইকী জয়। তুলে আনা হ'ল প্রতিমা, এনে বসানো হ'ল সেই চাঁদোয়ার তলায়। পণ্ডিত পুরোহিত খুঁজে আনতে ছুটল গাড়ী নিয়ে কয়েকজন। যিনি এখনও উপবাস ক'রে আছেন তাকে আনতে হবে যে কোনও উপায়ে। পুলিশ লাইনে পূজা হচ্ছিল। তেওয়ারি সাহেব বললেন—"এতক্ষণে বোধ হয় সেখানকার পূজা শেষ হয়েছে। সপ্তমী আছে রাত ন'টা পর্যন্ত। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানকার পণ্ডিত দু'-জনকে। তাঁরা আজ এখানেও পূজা করুন। কাল অন্য ব্রাহ্মণ ঠিক করা যাবে।"

মোটের ওপর যে কোনও উপায়ে পূজা হওয়া চাই, এই হচ্ছে সকলের মত।

পয়সায় কি না হয়! ঢাক ঢোল কাঁসি সানাই আধঘণ্টার ভেতর পৌছে গেল। বহু লোক লেগে গেল বাঁশ পুঁততে। পাট গুদামের বড় বড় ত্রিপল ঢাকা দিয়ে মস্ত বড় প্যাণ্ডেল খাড়া হয়ে গেল। স্তূপাকার হ'ল পূজার উপচার। তিনজন উপবাসী ব্রাহ্মণ এসে বারবেলা বাদ দিয়ে সন্ধ্যার আগেই পূজা আরম্ভ করলেন। কেড়ে নেওয়া দুর্গার পূজা দেখতে সহরসুদ্ধ মানুষ ভেঙে পড়ল। মস্ত মস্ত বড় গেট বেঁধে তার মাথায় নহবত বাজতে লাগল।

এলেন সুরেশ্বর বাবু, এলেন তাঁদের পূজা-মণ্ডপের সবাই। বাঁশ পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে আমার আসন। কাছির বাইরে দাঁড়িয়ে সকলে মহাপুরুষ দর্শন ক'রে গেলেন। সহজ মহাপুরুষ নয়, সাক্ষাৎ মায়ের আদেশ পেয়ে প্রতিমা কেড়ে এনেছেন। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে যাবার অধিকার নেই কারও। এক ডজন পুলিশ আর এক কুড়ি দরোয়ান ঘিরে রয়েছে মহাপুরুষকে। নয়ত লোকের চাপে পিষে মারা যাবেন যে।

তা গেলেও বরং ছিল ভাল। কি ভয়ানক ফাঁদে পড়ে গেলাম! আজ হোক কাল হোক পুলিশ আসবেই, ধরে নিয়ে যাবেই আমাকে। কি ভয়ানক কাণ্ডই যে হবে তখন! হয়ত এরা মায়ের পূজাই দেবে বন্ধ ক'রে! একটা ঠক জোচ্চোর যে প্রতিমা বিসর্জন দিতে না দিয়ে তুলে এনেছে—সে প্রতিমার পূজা ক'রে অনর্থক পয়সা নষ্ট করবে কেন এরা! ভাববে সকলে, প্রতিমা কেড়ে আনার মধ্যেও কিছু বদ মতলব ছিল আমার।

কিন্তু কোনও ক্রমেই আর একলা এক পা নড়বার উপায় নেই। লোটা হাতে নদীতে যাবার সময়ও চারজন দরোয়ান লাঠি ঘাড়ে ক'রে সঙ্গে চলেছে। শেঠজীর হুকুম—খবরদার যেন গুরুজী একলা কোথাও না যান। বলা ত যায় না, মার খেয়ে যারা প্রতিমা ফেলে পালিয়েছে তারা যদি কোথাও ওৎ পেতে বসে থাকে।

• নিরুপায় পঙ্গুর মত বসে রইলাম চুপ ক'রে। ছিলিমের পর ছিলিম এল,

এল লোটার পর লোটা ভাঙ্। ক্রমে ভিড় কমে এল। ব্রজকিষণ বাবু আর কয়েকজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তখন এসে আমার সামনে আসন গ্রহণ করলেন। মায়ের আরতি শেষ হ'ল। ব্রাহ্মণরা জল খেতে চলে গেলেন। এমন সময় দূরে দেখা গেল সেই পুলিশ সাহেবকে, আরও দু'জন খাকী-পরা অফিসার সঙ্গে গেট পার হয়ে এগিয়ে আসছেন। গেটের ওপর নহবত তখন মল্লার ধরেছে।

ডি. এস. পি. সাহেব সোজা এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন ওঁরা, তা আমার চেয়ে ভাল ক'রে কেউ জানে না। একবার মা দুর্গার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। না, কোনও উপায় আর নেই। এতগুলি লোকের মাঝ থেকে ছুটে পালাবার কথা চিন্তা করাও পাগলামি। এক মাত্র উপায় উবে যাওয়া। কিন্তু ফক্কড় কর্পূর নয়। সুতরাং চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

ব্রজকিষণ বাবু খাতির ক'রে আহ্বান করলেন তেওয়ারী সাহেবকে। জিজ্ঞাসা করলেন, এত দেরি হবার কারণ কি।

আসন গ্রহণ ক'রে তেওয়ারী সাহেব বললেন—"পুলিশের চাকরি করি জানেন ত শেঠজী। খুন-খারাপি নোংরা ব্যাপার নিয়ে দিন কাটে। লেগেই আছে একটা না একটা হুজ্জুত হাঙ্গামা। কাল রাত্রে একটা লোক ভয়ানক জখম হয়েছে। সে এক জঘন্য ব্যাপার। তাই নিয়েই এতক্ষণ কাটল।"

অনেকেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে লোকটা? কে জখম করলে তাকে?"

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাজী কি এখন ধ্যান লাগিয়েছেন?" শেঠজী জবাব দিলেন, "প্রায়ই ত ঐ ভাবে থাকেন। বাবা এখন সমাধিতে আছেন।"

তখন চাপা গলায় বললেন তেওয়ারী সাহেব—"সহরের পশ্চিম দিকের বাবাজী-পাড়ায় একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে কাল রাত্রে। একটা মেয়ে-মানুষ এক বাবাজীকে কামড়ে জখম করেছে। মেয়েমানুষটাকে আমরা আজ সকালে ধরে ফেলেছি। তার কাছ থেকে সেই সব বাবাজীদের কীর্তিকলাপ

আমরা জানতে পেরেছি। সেই পাড়াসুদ্ধ হারামজাদাদের বেঁধে আনা হয়েছে। সব ব্যাটা নচ্ছারের বেহদ্দ। একজনকেও সহজে ছাড়া হবে না। শুধু স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হয়েছে। বড় সাহেব তাকে মোটা রকম বখশিশ করবেন। সেই জানোয়ারটা এখন হাসপাতালে আছে, যদি প্রাণে বাঁচে তাকে আমরা জেল খাটিয়ে ছাড়ব।"

তারপর আরও নিচু গলায় পুলিশ সাহেব শেঠজীদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। কেন জখম করেছে, কি ক'রে জখম করেছে, শরীরের কোন্‌খানে জখম করেছে। তাঁর জবাব আর আমার কানে গেল না।

চোখ খুললাম, চেয়ে রইলাম মা দুর্গার মুখের দিকে। জলজল করছে মায়ের মুখ। একটা নরপশুর পশুত্বের বলি হয়েছে জেনেই কি মায়ের মুখ অত উজ্জ্বল? হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণভরে মাকে একটি প্রণাম করলাম।

মহাতিথি মহাষ্টমী—।

প্রভাতের আলোয় ধরণীর বুকে জন্ম গ্রহণ করছে একটি দিন। কে জানে কি আছে নবজাতকের ভাগ্যে! কি সঙ্গে নিয়ে এল এই নতুন অতিথিটি, আজব আশঙ্কা না আশ্বাসের আলো? মাত্র অষ্টপ্রহর এর পরমায়ু, এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে কত রকমের বল-বিক্রম জাহির করবে এই ক্ষণজন্মা, তারপর আর একটি আগন্তুকের জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্তর্ধান করবে বিস্মৃতির অন্তরালে।

ফক্কড় কখনও স্বাগত জানায় না এদের, বিদায়ও দেয় না সমারোহ ক'রে। কারণ এদের একটির সঙ্গে অপরটির কোথাও কোনও মিল নেই, জাত কুল মন মেজাজ সবই বিভিন্ন ধরণের। এইটুকু ভাল ক'রে জানে বলেই ফক্কড়ের অভিধানে চমক বলতে কোনও কথা নেই। সহসা অকস্মাৎ হঠাৎ এই সব শৌখীন শব্দগুলি ভদ্র মানুষদের নিজস্ব সম্পদ। ফক্কড় জানে তার জীবনের এই স্বল্পায়ু অতিথিদের কাছ থেকে তার ভিক্ষা করবার কিছুই নেই। যা

দেবার এরা দিয়ে যায়, আর যা নেবার তা নিয়ে বিদেয় হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার খেলায় ফক্কড়ের কিছুমাত্র লাভ-লোকসান নেই।

রামকেলী ধরেছে সানাই।

বাঙলার মায়েদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ মহাষ্টমী তিথি। এই তিথিতে বাঙালী মা জগৎ-জননীর কাছে সন্তানের জন্যে কল্যাণ ভিক্ষা করেন—আয়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও আমার সন্তানকে, তাকে জয় দান করো মা—শ্রী দান করো। মহাতিথি মহাষ্টমীতে বাঙলার আকাশ বাতাস শোধিত হয় মাতৃ-হৃদয়ের অমৃত সিঞ্চনে। তাই বাঙালী মরলেও বাঙলার প্রাণ কিছুতে মরে না, বাঙালীর জয়যাত্রা কিছুতেই ব্যাহত হয় না।

সানায়ের সুরে কেমন যেন নেশার আমেজ আছে। উঠি উঠি ক'রেও উঠতে পারছিলাম না। শুয়ে শুয়েই হিসেব ক'রে ফেললাম। আজ যেতে হবে ডি. এস. পি সাহেবের বাড়ীতে। তাঁর বৃদ্ধা মা সাধু দর্শন করবেন। দুপুর বেলা স্বয়ং তেওয়ারী সাহেব এসে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমায়। তার আগে একবার বার হবো অন্য পূজা-মণ্ডপগুলি ঘুরে আসতে। কিন্তু এরা কি ভাববে তা'হলে! এখন অন্য কোথাও পূজা দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন কি আমার? সেধে এসেছেন মা আমায় কৃপা করতে, চোখের সামনে দশ দিক আলো করে বসে আছেন জগৎ-জননী, এঁকে ফেলে রেখে কেন আমি ছুটছি অন্য সব পূজা-মণ্ডপে?

যা খুশি ভাবুক এরা, তবু একবার আজ সকালে বার হ'তেই হবে। দেখে আসতেই হবে সেই দৃশ্যটি, যা এখানে দেখা ঘটবে না কপালে। দেখে আসব লালপাড় মটকা বা গরদের শাড়ি পরে ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে মায়েরা এসেছেন মহাষ্টমীর পূজা দিতে। গলায় আঁচল দিয়ে অঞ্জলি ভরে ফুল বেলপাতা চন্দন সিঁদুর নিয়ে আকুল নয়নে চেয়ে আছেন দুর্গতি-নাশিনী দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভুজার দিকে। এক অনুচ্চারিত অব্যক্ত মহামন্ত্র সাকার রূপ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়েছে মহামায়ার সামনে। জননীর বুকের মাঝে লুকিয়ে

থাকে সেই মহামন্ত্র, কোনও শাস্ত্রে, কোনও পণ্ডিতের পাঁজি-পুঁথিতে লেখা থাকে না।

শেষ পর্যন্ত উঠে বসতেই হ'ল। সানায়ের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে শুয়ে মানসিক রোমন্থন করা আর চলল না। গান গাইতে গাইতে শেঠজী-বাড়ীর মহিলারা উপস্থিত হলেন সেই ভোর বেলায়। তাঁদের সমবেত কণ্ঠের সুমধুর সুর, মস্ত মস্ত ঘোমটার ভেতর থেকে বার হয়ে রামকেলীকে দেশ ছাড়া ক'রে ছাড়লে।

আমার স্নানের দ্রব্যগুলি থালায় সাজিয়ে এনেছেন ওঁরা। সুতরাং স্থির হয়ে বসে রইলাম আসনের ওপর। আবার আমার মাথায় ঢালা হ'ল সুগন্ধি তেল আর মহামূল্য আতর। সকলেই ঢাললেন একটু ক'রে। ফলে সেই সকাল বেলাতেই তেলে আর আতরে চুল দাড়ি নাক মুখের এমন অবস্থা হ'ল যে নদীতে না গিয়ে আর উপায় রইল না। ওদের কর্ম শেষ ক'রে ওঁরা বিদায় হলেন। তখন আধ ডজন দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে চললাম নদীতে। স্নান সেরে এসে দেখলাম নতুন গরদের জোড় আর একবাটি হলুদ-রঙের চন্দন-বাটা এসে গেছে। কাপড় চাদর পরে আসনে বসার পর দারোয়ানজী'রা সেই চন্দনটা সব লেপে দিলে কপালময়। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে গলায়। তাতেও মন উঠল না কারও, আরও খানিক আতর আনিয়ে গায়ে ঢেলে দিলে। তখন জ্যান্ত ঠাকুর সেজে পুরোহিতদের পিছনে একখানা জলচৌকির ওপর বসে রইলাম।

কোনও দিকে এতটুকু অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। ঘড়ি ধরে পূজা হচ্ছে। শহর-বিখ্যাত দু'জন পণ্ডিত এসেছেন পূজা করতে। তাঁদের আত্মীয়স্বজনরাই পূজার আয়োজন ক'রে দিচ্ছেন। ওধারে নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে তোরণটি। তোরণের ওপর নহবতখানার সাজসজ্জাই হয়েছে সবচেয়ে অপরূপ, সেখানে বসে সব চেয়ে নামজাদা বাজনাদাররা প্রহরে প্রহরে রাগ-রাগিণী পালটাচ্ছে। এই নহবতের ব্যবস্থা আর একটিও পূজা-মণ্ডপে নেই। এই

বাজনা হচ্ছে শেঠজীদের জাতীয় সম্পদ। পূজা পার্বণ বিয়ে সাদি সমস্ত উৎসবে নহবত বাজা চাই। উৎসবের মান-মর্যাদার মূল্য নিরূপণ হয় নহবত-খানার সাজ-সজ্জার ওপর আর তোরণের সামনে যে ক'জন রাজস্থানী বীর কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের পাগড়ি, সোনালী জরির কাজ-করা বিচিত্র পোষাক আর শুঁড়-তোলা নাগরার মস মস শব্দের ওপর। দু'জন পহেলা নম্বরের পালোয়ান যাত্রাদলের প্রধান সেনাপতি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের তোরণের সামনে, তাতেই এমন একটা আতঙ্কজনক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে ফস ক'রে কেউ গেট পার হ'তে সাহস করছে না। ইতিমধ্যেই বাঙালী ছেলেমেয়েদের একটি ছোট খাট দল জমে গেছে ওখানে। ভাবছে ওরা গেট পার হ'তে গেলে তলোয়ার খুলে তেড়ে আসবে না ত!

দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি এ পূজো ঠিক বাঙলার পূজো নয়। নানা রঙের পোষাক পরে যারা হৈ চৈ করছে চারিদিকে, তারা বাঙলা দেশের ছেলে মেয়ে নয়। এরা জানেও না দুর্গা পূজাটা কি। ওরা এসেছে তামাসা দেখতে। পূজো ত পূজো, বাঙালীরা করে এ পূজো, এ পূজোর সঙ্গে ওদের এতটুকু পরিচয় নেই, যোগাযোগ নেই। হঠাৎ একটা বড়গোছের তামাসা জুটে গেছে, ওদের বাপ-দাদার পয়সায় হচ্ছে তামাসাটা। কাজেই ওরা আমোদ ফূর্তি করবে বৈ কি!

আর ঐ দূরে গেটের বাইরে এদের চেয়ে অনেক হীন বেশে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের মনের ভাবও তাই। ওরাও জানে এ পূজোর সঙ্গে ওদের কোনও সম্বন্ধ নেই। মারোয়াড়ীরা পয়সার জোরে রাতারাতি হুলস্থুল বাধিয়েছে, এ হ'ল বড় লোকের ব্যাপার। এর সঙ্গে বাঙালীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে! মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। মনে হ'ল, কোথায় যেন কি অভাব রয়ে গেছে। প্রতিমার চোখের দৃষ্টিতে যেন সেই ভাবটি নেই—যা ফুটে উঠেছে অন্য সব পূজা-মণ্ডপের প্রতিমাগুলির চোখে। যেন ঠিক তেমন ভাবে জলজল করছে না মায়ের মুখ, মহাষ্টমীর দিন প্রতিটি

প্রতিমার মুখ যেমন জলজল করা উচিত! যেন—যেন মা বড় বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

আরও কত কি যে মনে হ'ল! ভয়ানক রাগ হ'ল নিজের ওপর। এ সমস্ত ছাই-পাঁশ কেন চিন্তা করছি আমি? অহেতুক অযথা কৃপা করেছেন কৃপাময়ী আমাকে, রাস্তার কুকুরকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন রাতারাতি। তবু কেন সন্তুষ্ট হতে পারছি না আমি! যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় তুষ্ট করবার জন্যে এতবড় একটা কাণ্ড-কারখানা ক'রে যাচ্ছে তাদের আপনার জন ব'লে মনে করতে পারছি না কেন আমি? কি হীন মন আমার! কি বিশ্রী আত্মাভিমান! ছিঃ।

সামনে ছ'জন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিষণলালের বাঙালী ম্যানেজার রূপনারায়ণ বাবু। তিনি সঙ্গে এনেছেন এঁদের, সুতরাং এঁরা সহজ লোক নন।

প্রণাম সেরে উঠে বসতে চিনতে পারলাম। সুরেশ্বরবাবু এবং একজন মহিলা। বড় আপনার জন মনে হ'ল সুরেশ্বরকে। গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করলাম বসবার জন্যে। কৃতার্থ হয়ে ওঁরা মাটির ওপরেই বসে পড়লেন।

নিচু গলায় সুরেশ্বর রূপনারায়ণবাবুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। সুরেশ্বর এসেছেন আমাকে তাঁদের পূজামণ্ডপে নিয়ে যাবার জন্যে। মহাপুরুষ যখন সেধে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে, তখন তাঁরা কেউ চিনতে পারেন নি। অসংখ্য অপরাধ ক'রে ফেলেছেন সকলে। কিন্তু মহাপুরুষ ত অপমান অবহেলা গায়ে মাখেন না। সেই বিশ্বাসেই সুরেশ্বর সাহস ক'রে এসেছেন। একবার আমায় নিয়ে গিয়ে চুটিয়ে দেখাবেন ভক্তি করা কাকে বলে আর কতবড় উঁচু দরের ভক্ত তাঁরা। এখন রূপনারায়ণবাবু যদি দয়া ক'রে একটু ব'লে দেন শেঠজীকে, কারণ শেঠজীর হুকুম ভিন্ন ত আর মহাপুরুষকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

রূপনারায়ণবাবু ছুটে গিয়ে আগে মুখ থেকে পানের পিকটা ফেলে এলেন

মণ্ডপের বাইরে। তারপর বেশ মুরুব্বীয়ানা চালে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"শেঠজীর সঙ্গে দেখা হ'লে আমি তাঁকে জানাব আপনাদের কথা। বহু জায়গা থেকেই লোক এসে ধরেছে শেঠজীকে, ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। হাকিম, পুলিশ সাহেব, সরকারী উকিল সেন সাহেব, তারপর ওধারে সহরের অনেকগুলো বারোয়ারি-পূজার পাণ্ডারা। এখন কোথায় কবে ওঁকে পাঠানো হবে তা ঠিক করবেন শেঠজী নিজে। আপনাদের কথাও তাঁকে জানাবো সময় মত। দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

শুনে হাত কচলাতে লাগলেন সুরেশ্বর, তাঁর সঙ্গিনীর মুখ লাল হয়ে উঠল। আর আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। এ কি রকম কথা! আমি কি বন্দী নাকি এঁদের কাছে? আমার যখন ইচ্ছে, যেখানে খুশি যাবো, এঁরা বাধা দেবার কে? আচ্ছা দেখি, কি করে এঁরা বাধা দেন।

উঠে দাঁড়ালাম। সুরেশ্বরও তখন উঠেছেন। তৎক্ষণাৎ সকলকে হতভম্ব ক'রে দিয়ে সুরেশ্বরের হাত ধরে সোজা এগিয়ে চললাম গেটের দিকে। রূপনারায়ণবাবু চিৎকার করতে লাগলেন দারোয়ানদের নাম ধরে। কয়েকজন চাকর দারোয়ান ছুটে এল। আমার পিছনে তারা দল বেঁধে চলতে শুরু করে দিলে। রূপনারায়ণ ছুটলেন শেঠজীর গদিতে। স্বয়ং সুরেশ্বর এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে আমার হাতের মধ্যে ধরা তাঁর হাতখানা থরথর করে কাঁপছে। পিছন ফিরে দেখে নিলাম, মহিলাটিও আসছেন কিনা। আসছেন ঠিকই, তবে চাকর দারোয়ানদের পিছনে পড়ে গেছেন।

গেট পার হবার আগেই দু'খানা গাড়ী এসে থামল গেটের সামনে। একখানা থেকে নামলেন ব্রজকিষণলাল। নেমে পরিষ্কার বাঙলায় সুরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"নিয়ে ত চলেছেন গুরুজী মহারাজকে, কিন্তু সামলাবেন কি ক'রে? সহর সুদ্ধ মানুষ ভেঙে পড়বে, এমন হাঙ্গামা হবে যে ওঁর শরীরেও চোট লাগতে পারে। এ সমস্ত ভেবে দেখেছেন ত?" ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন সুরেশ্বর। কোনও রকমে বললেন, "আমি ত এখনই এঁকে নিতে

আসিনি। হঠাৎ যে উনি এখনই যাবেন আমার সঙ্গে তাও জানতাম না।"

হাসলেন শেঠজী। বললেন—"উনি ত যাবেনই ঐ ভাবে। ওঁর কি পরোয়া আছে কিছুতে, কিন্তু আমাদের সব দিক বিবেচনা করা দরকার।"

পিছন ফিরে তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে খাটো গলায় কি পরামর্শ করলেন। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ীতে উঠে কোথায় চলে গেলেন। তখন ধীরে-সুস্থে আর একখানা গাড়ীতে আমাদের তুলে দিলেন শেঠজী। পিছনের আসনে আমি বসলাম। দু'জন দারোয়ান দু'পাশের দরজায় উঠে দাঁড়াল। সুরেশ্বর আর তাঁর সঙ্গিনী বসলেন ড্রাইভারের পাশে। ধীরে ধীরে গাড়ী গিয়ে বড় রাস্তায় উঠল।

কিছু পরে পিছন ফিরে দেখি একখানা পুলিশের লরি আসছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্ততঃ এককুড়ি পুলিশ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে লরির ওপর, আর ড্রাইভারের পাশে বসে রূপনারায়ণবাবু দাঁতের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি চালাচ্ছেন।

ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে যে ব্যাপারটা! ওরা আবার কেন চলেছে সঙ্গে? ও কিছুই নয়, শেঠজী একটু জাঁকজমক দেখাতে চান। তেওয়ারী সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার দরুন এক লরি পুলিশ পাঠাতে পেরেছেন আমার পিছনে। তার মানে লোকে এবার বুঝুক যে কত বড় শেঠের পোষা সাধু আমি। নয়ত কি এমন কাণ্ড ঘটতে পারে সেখানে যার জন্যে এত সাবধানতার প্রয়োজন?

ভয়ানক কাণ্ড না হ'লেও যেটুকু ঘটে বসল সুরেশ্বরবাবুর পূজামণ্ডপে, তাতে পুলিশ না থাকলে আমার উদ্ধার পাওয়া কঠিন হ'ত বৈকি!

গাড়ীর ভেতর বসেই দেখতে পেলাম, টুপি-মাথায় দু'জন অফিসার তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের সামনে। লরি থামল আমাদের গাড়ীর পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে কনেষ্টবলরা লাফিয়ে নেমে সার বেঁধে দাঁড়ালো দু'পাশে। সুরেশ্বর নামলেন, মহিলাটি নামলেন, তারপর আমি নামলাম। তৎক্ষণাৎ

ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চরমে গিয়ে পৌছল। পুলিশ কেন এল তাই দেখবার জন্যে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সুরেশ্বর যে একেবারে মহাপুরুষ সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন তা নিশ্চয়ই কেউ জানত না। কিন্তু যে মহাপুরুষকে পাহারা দেবার জন্যে এক লরি পুলিশ প্রয়োজন হয়—তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত ভিড় না হ'লে চলবে কেন। সুতরাং ছুটে আসতে লাগল পাড়াসুদ্ধ মানুষ। দাবানলের মত সংবাদটি ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার মেয়ে-পুরুষ ছেলে-ছোকরা জমা হয়ে গেল। সুরেশ্বর তখন আমায় নিয়ে মণ্ডপের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দরজা রুখে পুলিশ খাড়া, আর একটি প্রাণীকেও ভেতরে আসতে দেওয়া হবে না। তাতে বড় বয়েই গেল। অন্য দিক দিয়ে তখন এত লোক ঢুকে পড়েছে মণ্ডপের মধ্যে যে আর তিল-ধারণের স্থান নেই।

আমার কপালে মা দুর্গার সামনে পৌছনো ঘটে উঠল না। তার দরকারও নেই। নিজেই মা দুর্গার চেয়ে অনেক বেশী খাতির পাচ্ছি। আমাকে দর্শন করতে এত লোক পাগল হয়ে উঠেছে! আমার আবার দুর্গা দর্শন করার প্রয়োজন কি! হাজার খানেক মা দুর্গার সাক্ষাৎ অনুচরীরা ঘিরে ধরেছেন তখন। পায়ের ধুলোর জন্যে তাঁরা ঠেলাঠেলি চুলোচুলি লাগিয়েছেন। ভাগ্যে এদের দশটি ক'রে হাত নেই, থাকলে আর রক্ষে ছিল না কি!

একখানা উঁচু টেবিল এনে তার ওপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। সুরেশ্বরবাবু গর্জন করতে লাগলেন। সত্যিই যে তিনি একজন সার্থক সম্পাদক তা দেখিয়ে দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা মারমুখো হয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমার চারিদিকে। ঘনঘন অসংখ্য শাঁখ বাজতে লাগল। গোলমালটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল। আমার গরদের কাপড় চাদরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে তখন। গোল্লায় যাক কাপড় চাদর, দম আটকে যে মারা পড়িনি এই যথেষ্ট। টেবিলের ওপর বসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

তখন আরম্ভ হ'ল প্রণামী দেওয়া আর পায়ের ধুলো নেওয়া। টাকা

নোট এমন কি ছোটখাটো। সোনার অলঙ্কারও স্তূপাকার হয়ে উঠল পায়ের কাছে। বাঙালীও যে ভক্তি দেখাতে জানে তার ষোল-আনা প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রণাম সারতে লেগে গেল ঘণ্টা খানেকের ওপর। ওধারে বাইরে তখন আরও কয়েক হাজার মানুষ জমা হয়েছে। তাদের চিৎকারে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। এখন ঐ ব্যূহ ভেদ ক'রে বার হতে হবে। ভাবতেই বুকের ভেতর হিম হয়ে এল।

আবার দেখা দিলেন সম্পাদক মশাই। স্বেচ্ছাসেবকদের আদেশ দিলেন ভিড় সরিয়ে পথ করতে। তারপর আমার পিছনের কাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"এবার তুলে নিয়ে চল এঁকে।"

এতক্ষণ পরে আমার পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ হ'ল। দেখলাম সুরেশ্বরের সেই সঙ্গিনীকে। তাঁর চোখ মুখ মাথার চুল জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করতে কি ধকল সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

হাত জোড় ক'রে বাঙলা ভাষায় নিবেদন করলেন সুরেশ্বর—"দয়া ক'রে একবার অধমের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে হবে যে!"

সভয়ে ঘাড় নাড়লাম। আর না, আর এতটুকু ভক্তি সহ্য হবে না। এবার রেহাই দাও, যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাই।

মুখ শুকিয়ে গেল সুরেশ্বরের, তিনি অসহায় ভাবে চাইলেন মহিলার দিকে। তখন সেই মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এমনভাবে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে যে আমাকে চোখ নামাতে হ'ল। অনেক কিছু ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, সবচেয়ে মারাত্মক যা ছিল তা হচ্ছে—যদি না যাও তা'হলে আমি গলায় দড়ি দোব।

ভেবে দেখলাম—যাওয়াই উচিত। না গেলে নেহাত নিমকহারামি করা হয়। সম্পাদক মশায়ের একটা মর্যাদা আছে। যদি উনি মহাপুরুষকে একবার নিজের বাড়ীতে না নিয়ে যেতে পারেন তাহলে লোকের কাছে মুখ দেখাবেন

কেমন ক'রে! তাছাড়া ঐ মহিলাটি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছেন তারও একটা মূল্য আছে ত।

নেমে দাঁড়ালাম টেবিল থেকে। যে চাদরখানা পাতা ছিল টেবিলে, টাকাকড়িসুদ্ধ সেখানা গুটিয়ে নিয়ে রূপনারায়ণ বাবুর হাতে দিলেন সুরেশ্বর। স্বেচ্ছাসেবকরা দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াল। সামনে সেই মহিলা আর পিছনে সুরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে চললাম প্রতিমার সামনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। কিন্তু আজ আর প্রণামী দেবার নেই কিছু হাতের কাছে। তারপর প্রতিমার বাঁ পাশের বেড়ার গায়ে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে আমাকে বার ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সে-ধারে কেউ নেই। খোলা আকাশের তলায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একটি বড় পুকুরের পাড় দিয়ে চললাম ওঁদের সঙ্গে। সুরেশ্বর বললেন, "কাছেই আমার বাসা। সামনের পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবার উপায় নেই। এই পথে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

ভদ্রমহিলা শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, "হবেই ত, তবে ছাদের ওপর জল তুলতে যেটুকু কষ্ট হয়েছিল ততটা হবে না নিশ্চয়ই।"

থতমত খেয়ে সুরেশ্বর নির্বাক হয়ে গেলেন।

পুকুর-পাড় ছেড়ে ছোট একটু বাগানের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। বাগানটুকু পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বন্ধ দরজার সামনে। টিনের চাল টিনের দেওয়াল দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী।

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনি স্বহস্তে দরজায় খিল দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন তারপর আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তাঁর হাবভাব দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হ'তে লাগল আমার। এ ভাবে কি দেখছেন উনি! আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর আর মহিলাটি বৃদ্ধের রায় শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পরীক্ষা শেষ ক'রে বৃদ্ধ আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে বেশ চীৎকার ক'রে বললেন, "আমি পিতু, কাশীর পিতু মুখুয্যে আমি, আমায় চিনতে পারছ ব্রহ্মচারী ?"

সত্যিই একটু চমকে উঠলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু ঘোলাটে চক্ষু দুটি, আর ধনুকের মত বাঁকা নাকটি। তাহ'লে পিতু মুখুয্যে এখনও বেঁচে আছেন! আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠতে গেলাম। সেই মুহূর্তে পিতুবাবু আবার বলতে লাগলেন, "এই সুরেশ্বর হচ্ছে আমার জামাই, এখানকার কলেজে প্রফেসারি করে। আর ঐ আমার মেয়ে গৌরী। এবার মনে পড়ছে আমাদের ?"

আর একবার ভাল ক'রে দেখলাম মহিলাটিকে। গৌরী অর্থাৎ পিতু মুখুয্যের মেয়ে এবং প্রফেসার সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে চেয়ে আছেন আমার দিকে। এ সেই দৃষ্টি, যা দেখে প্যাণ্ডেল থেকে এসেছি আমি ওঁর সঙ্গে। এই দৃষ্টি বলতে চায়—বলো—চিনতে পারছ, না বললে এখনই আমি গলায় দড়ি দোব।

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। বললাম, "কি ক'রে চিনি বলুন। গৌরী যে এমন একজন গিন্নীবান্নী হয়ে পড়েছে এ কি ধারণা করা সহজ!"

আমার হাসিতে ওঁরা কেউ যোগ দিলেন না। বেশ শব্দ ক'রে গৌরী একটি নিঃশ্বাস ফেললে। যেন এতক্ষণে তার বুকের ওপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। পিতুবাবু দু'হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরেশ্বর বললেন—"আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম উনি বাঙালী।"

গৌরী এবার হেসে ফেললে। বললে—"তা ত নিশ্চয়ই, তা না বুঝলে কি ওঁকে দিয়ে অত জল তোলাতে পারতে।"

পিতুবাবু তখনও জড়িয়ে ধরে আছেন আমাকে। বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন তিনি। কম্পিত গলায় বলতে লাগলেন বৃদ্ধ—"সকলকে ফাঁকি দিয়ে যখন পালালে কাশী থেকে তখন পিতু বুড়োর জন্যেও কি একবার তোমার মন

খারাপ হ'ল না ব্রহ্মচারী! একবার মনেও হ'ল না তোমার, যে বুড়োটা হয়ত পাগল হ'য়ে যাবে বা মরে যাবে!"

ততক্ষণে গৌরী চলে গেছে ঘরের মধ্যে। সেখান থেকেই সে বললে, "এবার ছেড়ে দাও বাবা তোমার ব্রহ্মচারীকে। ঘরের ভেতর এনে বসাও। এবার একটু মুখে জল-টল দিতে হবে ত ওঁকে।"

পিতুবাবু ছেড়ে দিলেন আমাকে। বললেন—"হাঁ হাঁ ঠিকই ত, ঠিকই ত। আগে একটু সরবৎ দে গৌরী। ভিড়ের চাপে নিশ্চয়ই ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে ব্রহ্মচারীর।"

তখনও সুরেশ্বর মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, "একটুও মন খারাপ করবেন না আপনি আমাকে দিয়ে জল তোলাবার জন্যে। আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাতে ওরকম একটু আধটু ঠাট্টা করা চলে।"

হা হা করে হেসে উঠলেন পিতুবাবু। কাশীর সেই পিতুবাবু—এই হাসির জন্যেই বাঙালী-টোলায় বিখ্যাত ছিলেন পিতু বুড়ো। আরও অনেকটা বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাসিটি এখনও ঠিক তেমনিই আছে। হাসি ত নয় যেন একটা জলপ্রপাত। ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সামনে পড়ে। মারাত্মক সংক্রামক জিনিষ হচ্ছে পিতুবাবুর ঐ প্রাণ-খোলা হাসি। ঐ হাসির তোড়ে কাশীতে কয়েকটা বছর কেমন অনায়াসে কেটে গেছে আমার। ঐ হাসি দিয়ে পিতুবাবু আমার মনের কালি ধুয়ে দিয়ে ছিলেন। যতবার মাথা তুলতে গেছি ততবার পিতুবাবুর হাসি আমার মাথার ওপর হড়হড় করে ঝরে পড়েছে। আর একেবারে শীতল হয়ে গেছি আমি। ভালই হয়েছে, কোথায় কাশী কোথায় চট্টগ্রাম। পিতুবাবু এখন জামায়ের বাড়ীতে বাস করছেন। প্রফেসার জামায়ের শ্বশুর এখন কাশীর পিতু বুড়ো। আমারও বেশ উন্নতি হয়েছে। ছিলাম কালী-বাড়ীর পুরুত, এখন হয়েছি ফকড়। বন্য জন্তুর মত স্বাধীন প্রাণী ফকড়। দারোয়ান, পুলিশ, গয়নের কাপড় চাদর, টাকা, নোট, সোনার অলঙ্কার

এই সব দিয়ে বাঁধা যায় না ফক্কড়কে, কিছুতেই ফক্কড়কে বশীভূত করা যায় না। কিন্তু যায়ও ত আবার ফক্কড়কে বশীভূত করা! এই ত গৌরী অনায়াসে তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে বশীভূত করে বাড়ীতে নিয়ে এল ফক্কড়কে! নামকরা প্রফেসার-পত্নী গৌরীর চোখের দৃষ্টি এখনও বদলায় নি তাহলে!

বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়েছে গৌরী। আমরা তিন জনে উঠলাম বারান্দায়। একখানা আসন হাতে ছুটে এল সে। আসনখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে ফেলে দিলাম ওপাশের চেয়ারের ওপর। বসে পড়লাম শতরঞ্চিতে। চোখ পাকিয়ে বললাম, "দেখ ক্ষেপিও না বলছি বাড়াবাড়ি করে। সম্পাদক মশাই আমার মত একজন মহাপুরুষকে সসম্মানে নিয়ে এসেছেন। তুমি অপমান করছ কেন? নালিশ করলে মজা টের পাবে।"

এতক্ষণে সুরেশ্বরের মুখের কালো মেঘ কাটল। বললেন—"তা করবেন পরে। এখন একটু সেজেগুজে বসুন আসনের ওপর। আমি ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনি এখানে। আপনার সামনে তাঁকে বলে দি এবেলা যাবেন না আপনি।"

এবেলা যাব না আমি! বলে কি?

পিতুবাবুর টনটনে আক্কেল আছে। তিনিই বাধা দিলেন জামাইকে।

"সেটা ভাল দেখায় না সুরেশ্বর। তাতে গোলমাল আরও বাড়বে, লোক ভেঙে পড়বে এ বাড়ীতে। এখন জলটল খাইয়ে ব্রহ্মচারীকে পৌছে দাও মারোয়াড়ীদের হাতে। পুজোর হাঙ্গামা চুকলে আমরা আবার নিয়ে আসব। ততদিনে মানুষের উৎসাহেও একটু ভাঁটা পড়বে।"

ঘরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, "সে যা হয় হবেখন খানিক পরে। এখন না খেয়ে এক পা নড়তে পারবে না কেউ বাড়ী থেকে।"

চেপে বসলাম। সুরেশ্বরের হাত ধরে টেনে বসালাম পাশে। যার যা খুশি ভাবুক। কে কি ভাববে তার জন্মে থোড়াই কেয়ার করে ফক্কড়। শুধু ফক্কড় কেন, মহাপুরুষ ফক্কড়। মহাপুরুষের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া পাপ, কার

এত সাহস হবে শেঠজীর গুরুজীকে বিরক্ত করবার। অতএব থাকুক ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

মস্ত একটা সাদা পাথরের বাটি সামনে ধরলে গৌরী। হাত থেকে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খালি করে দিলাম বাটিটা। নুন চিনি দই লেবুর রস দিয়ে চমৎকার বানানো হয়েছে সরবৎটা, বেশ যত্ন করেই বানিয়েছে গৌরী। বহুদিন আগেই এই রকম এক বাটি সরবৎ আমার প্রাপ্য ছিল গৌরীর কাছে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে মাঝখানে। তখন হয়ত এত যত্ন করে এই রকম চমৎকার সরবৎ বানাতে পারত না গৌরী। তা না পারুক তবু অন্ততঃ একটি দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেতে পারতেন পিতুবাবু। না হয় মেয়ের হাতের সরবৎ না খাইয়ে শুধু মুখেই আমায় বিদায় দিতেন সেদিন, না হয় আজকের এই প্রফেসর বাবুর স্ত্রীর মত তখনকার সেই গৌরী এত অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত না। তবুও তখনকার সেই হতদরিদ্র কালী-বাড়ীর পুরুতের অতি তুচ্ছ মর্যাদার কিছু মাত্র হানি হত না। এতবড় একটা মহাপুরুষকে বাড়ীতে ধরে এনে এত উচ্ছ্বাস এত আদর আপ্যায়ন দেখানোর চেয়ে তখনকার সেই হতভাগা কালী-বাড়ীর বামুনকে একবার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেলে পিতা পুত্রীর উদার প্রাণের পরিচয় পেয়ে আরও বেশী মুগ্ধ হতাম আমি। আর তাহলে হয়ত—

"হয়ত তুমি ভাবছ ব্রহ্মচারী, তোমার আমি চিনলাম কি করে? আমি তোমায় চিনতে পারি নি। গৌরী তোমায় চিনতে পেরেছিল। তোমায় জল তুলতে দেখে এসে গৌরী আমায় বললে তোমার কথা। আমার বিশ্বাস হয় নি। আমার ধারণা ছিল তুমি এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছ। হয়ত এতদিনে আবার সংসারী হয়ে বিয়ে থা করে শান্তিতে—"

হেসে উঠলাম পিতুবাবুর কথা শুনে। বললাম—"শান্তিতেই ত আছি পিতুবাবু, এত ভক্ত, এত মান মর্যাদা, এত ধন দৌলত আমার পায়ে আছড়ে পড়ছে তবু বলেন সংসারী হলেই শান্তি পেতাম!"

বৃদ্ধ আর একটি কথা বললেন না। দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। বাটি নিয়ে গৌরী আবার ঘরের মধ্যে চলে গেছে। সুরেশ্বরও উঠে গেছেন। ঘরের ভেতর থেকে ওদের স্বামী স্ত্রীর কথার আওয়াজ আসছে। মহাপুরুষকে জল খাওয়াবার আয়োজন হচ্ছে ওখানে।

সজোরে একটি ধাক্কা দিয়ে জাগালাম ফক্কড়কে। সাবধান—এলিয়ে পড়া সাজে না তোমার। তুমি একটি পোড় খাওয়া পেশাদার ফক্কড়। রক্ত-মাংসে গড়া একটি আস্ত উপগ্রহ তুমি। ঘুরতে ঘুরতে এমন জায়গায় এসে পড়েছ যখন আলোয় আলো হয়ে গেছে তোমার ওপর ভেতর। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে! আবার তোমায় ছুটতে হবে তোমার আপন পথে, ঘুরতে হবে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে। এই তোমার বিধিলিপি, কার সাধ্য খণ্ডন করে!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিতুবাবু বললেন—"তুমি যে বেঁচে আছ এ কথা তখন কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এই পিতু বুড়ো তিন বছর ধরে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মরেছে। আমি শুধু গলা ফাটিয়ে বলেছিলাম তখন—ব্রহ্মচারী মরেনি, মরতে পারে না সে এমন হীন অবস্থায়। লোকে হেসেছে, পাগল বলেছে আমাকে। আমি বাবা বটুকনাথের কাছে মাথা খুঁড়েছি। এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন বটুকনাথ, তোমায় ফিরে পেলাম তাঁর দয়ায়। কাল সকালে যখন তুমি রাজরাজেশ্বর সেজে প্রতিমা দর্শন করতে এসেছিলে তখন দূর থেকে দেখে তোমায় চিনে ফেললাম। তাই ত পাঠালাম আজ গৌরী আর সুরেশ্বরকে তোমার কাছে। একবার আমার সঙ্গে তুমি কাশীতে চল ব্রহ্মচারী, সেই হতভাগা হতভাগীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব যে পিতু বুড়ো পাগল নয়। মিথ্যে কথা বলে পিতুকে ভোলানো অত সহজ নয়।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি মরে গেছি এ কথা রটল কি করে?"

"কি করে যে কি রটে কাশীতে তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন।" পিতুবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঘরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, "আবার সেসব কথা আজ তুলছ কেন বাবা। তাঁরা সব ব্রহ্মচারী মশায়ের একান্ত

আপনার লোক ছিলেন। পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরা ছাড়া আর ত কাউকে চিনতেন না ব্রহ্মচারী মশায়। তাঁরা যা করেছিলেন ওঁর ভালর জন্যেই করেছিলেন।"

পিতুবাবু বললেন, "সেই কথাটাই ব্রহ্মচারীর জানা দরকার। একেবারে জল-জ্যান্ত মিথ্যে কথা রটাতে লাগল। গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তরকাশীতে তোমার কলেরা হয়েছিল। চিনতে পেরে অনেক সেবা-শুশ্রূষা করে তারা। তারপর সব শেষ হয়ে গেলে শেষ কাজটুকু করে তারা কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গোত্তরী চলে যায়। সবাই বিশ্বাস করলে তাদের গল্প। আমি বললাম—না তা কখনও হ'তে পারে না। এ মিথ্যে, অমন ইতরের মত মরতে পারে না ব্রহ্মচারী। জগৎজননী রাজরাজেশ্বরীর সন্তান, না হয় ঘুরছেই পথে পথে, তা বলে—"

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"সে তারা কারা? কারা রটালে এ সমস্ত কথা?"

আড়াল থেকে ঝাঁজিয়ে উঠল গৌরী, "অন্য কে রটাতে যাবে অমন অলক্ষুণে কথা, রটালেন শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর মেম সাহেব। যাঁরা এখন স্বামী শঙ্করানন্দ আর করুণাময়ী ভৈরবী সেজে কালী বাড়ীতে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা চালাচ্ছেন।"

পিতুবাবু বললেন, "রক্তের দোষ, বিষাক্ত রক্তে জন্ম। লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে হবে কি, ওর রক্তে মিশে আছে ব্যভিচার। আসল কাল কেউটের পেটে জন্ম, ঠিক সময় সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সেই সর্বনাশী কালীর দোহাই দিয়ে চুটিয়ে স্ফূর্তি চালাচ্ছে। তারানন্দ পরমহংসের মেয়ের পেটে জন্মে যা করা উচিত তাই করছে। বড় বড় লোক তার চেলা হ'য়েছে। বড় বড় ঘরের সর্বনাশ করছে। যে কালীবাড়ীতে সন্ধ্যে দীপ জ্বলত না এখন তার জাঁকজমক দেখে কে। এখন তুমিই আর চিনতে পারবে না সেই কালীবাড়ীকে।"

হৃষেশ্বর এসে বললেন, "এবার উঠুন। হাতে মুখে জল দিন। মহাষ্টমীর প্রসাদ মুখে দিন একটু।"

ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন পিতুবাবু, "হাঁ-হাঁ—উঠে পড় ব্রহ্মচারী। আর দেরি ক'রে কাজ নেই। ওরা হয়ত এখানেই এসে পড়বে।"

এবার সুরেশ্বর বাধা দিলেন শ্বশুরকে—"অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি। তাঁরা ওঁকে ভাল ক'রে চেনেন। উনি নিজে ইচ্ছা ক'রে না গেলে কেউ ডাকতে আসতে সাহস করবে না। পুলিশ গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এক প্রাণীকে ভেতরে আসতে দেবে না। ইতিমধ্যে ডি, এস, পি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মকিষণ-বাবু নিজে সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

বেশ ধোঁকায় পড়ে গেলাম। আমাকে বিদেয় দেবার জন্যে এত ব্যাকুল কেন পিতুবাবু! এখনও কি আমায় ভয় করেন নাকি তিনি?

গৌরী চেঁচিয়ে উঠল ওধার থেকে, "জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি।"

সুরেশ্বরের সঙ্গে নেমে গেলাম উঠানে। আপন হাতে পা ধুইয়ে দেবে গৌরী। ঘটিটা কেড়ে নিয়ে বললাম, "রক্ষে কর, অত ভক্তি সহ্য হবে না আমার। শেষ পর্যন্ত কিছু না খেয়েই তোমার ঐ নিচু পাঁচিল টপকে উধাও হ'য়ে যাব।"

গজগজ করতে করতে গৌরী ফিরে গেল—"গুণের মধ্যে শুধু ঐটুকুই ত আছে, উধাও হ'য়ে যাব। শুনলেও গা জ্বালা করে আমার।"

সুরেশ্বর হেসে ফেললেন। বললেন, "তা যে যাবেনই সে ত আমরা সবাই জানি। এখন দয়া ক'রে মুখ হাত ধুয়ে চলুন ঘরে। নয়ত গৌরী আরও চটে যাবে।"

বললাম, "দেখুন আপনিই বিচার করুন। এতবড় একটা মহাপুরুষকে যে নিয়ে এলেন তা গৌরী কি মানতে চাচ্ছে। ও এখনও আমাকে সেই কালী-বাড়ীর পুরুতই মনে করে।"

হাত মুখ ধুয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে যা দেখলাম তা চক্ষুস্থির হবার মত ব্যবস্থা! প্রায় এক বিঘত উঁচু আসন পাতা হ'য়েছে। প্রথমে খান দু'য়েক কম্বল পাট ক'রে পেতে তার ওপর কার্পেটের আসন দেওয়া হয়েছে। শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড থালায় সাজানো হ'য়েছে ফলমূল সন্দেশ। তার পাশে কয়েকটা

পাথর-বাটিতে বোধ হয় দই দুধ ক্ষীর। গৌরী প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে, আমি বললে থালাখানি সামনে ধরে দেবে।

আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। সুরেশ্বরের দিকে ফিরে বললাম, "তা'হলে এবার চলুন আমায় পৌঁছে দেবেন পুলিসের কাছে।"

আঁতকে উঠল গৌরী, "তার মানে?"

"মানে অত্যন্ত সরল। দর্শন ক'রেই পরম তৃপ্ত হ'লাম তোমার ভক্তির বহর দেখে। এভাবে ত কেউ কাউকে খেতে দেয় না। এই রকম ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে কিছু খেও না যেন শুধু প্রসাদ ক'রে দিও।"

চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল গৌরীর। পিতুবাবু এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পিছনে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এ সমস্ত কাণ্ড কেন করতে গেলি তুই ব্রহ্মচারীর জন্যে। ঐ কম্বলখানা তুলে নাও ত সুরেশ্বর, শুধু আসনেই যথেষ্ট হবে।"

বললাম, "আর দু'খানা আসনও চাই যে। আপনারা দু'জনও বসবেন আমার সঙ্গে। গৌরী সামনে বসে সব ভাগ ক'রে দেবে আমাদের। আর আমরা ভাল মানুষের মত গল্প করতে করতে পেট পুরে খাব।"

ছুটে বেরিয়ে গেল গৌরী, আর দু'খানা আসন এনে পেতে দিলে। তখন আমরা তিন জনে খেতে বসলাম।

নারকেলের চিঁড়ে নারকেলের সন্দেশ বহুকাল চোখে দেখিনি। আগেই এক মুঠো নারকেলের চিঁড়ে মুখে ফেলে চর্বণ সুরু করলাম। সামনে বসে গৌরী বকে যেতে লাগল, "মহাষ্টমীর দিনটাও হয়ত এই খেয়েই কাটবে। দুটো রেঁধে খাওয়াবো তার সময় কই। বেলা বারোটা বেজে গেছে। ভক্তরা এতক্ষণে হন্তে হ'য়ে উঠেছে। আর দেরি করলে শেষে বাড়ী চড়াও করবে।"

শুনতে পেলাম একটি নিঃশ্বাসের শব্দ। যা মুখে পুরেছিলাম তা গলা দিয়ে নামিয়ে বললাম, "হুঁ, এই খেয়েই দিন কাটবে বৈ কি। চল আমার সঙ্গে, [illegible] মহারাজের ভোগের আয়োজন দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।"

সুরেশ্বর বললেন, "সে কথা আমরা জেনে এসেছি। ওঁরা যত আয়োজন করেন, সব আপনি প্রসাদ ক'রে দেন। ওঁরা আশ্চর্য হ'য়ে ভাবেন কিছু না খেয়ে আপনি বেঁচে আছেন কি ক'রে।"

"এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন ক'রে বেঁচে আছি।" বলে এক মনে ফলমূল খেয়ে যেতে লাগলাম।

পিতুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আরও কিছুদিন আছ নাকি এখানে?"

সংক্ষেপে জবাব দিলাম, "তা জানি না ত।"

"কিছুই উনি জানেন না, কবে যে সরে পড়বেন এখান থেকে তাও ওঁর ঠিক করা নেই। সে কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবারও অধিকার নেই কারও। যখন যেদিকে খুশি চলে যাবেন। আর পাপীতাপী যারা, তারা পড়ে থাকবে, মাথা খুঁড়বে, তাতে ওঁর কি। একেবারে ষোল আনা মহাপুরুষ না হ'লে মানুষ এ রকম পাষাণ হতে পারে কখনও।" বলে আরও খানিকটা ক্ষীর বাটিতে ঢেলে দিতে এল গৌরী। দু'হাতে বাটি চাপা দিয়ে বললাম, "মাপ কর, আরও খেতে হলে এ বাড়ী থেকেই বার হতে পারব না, অন্য কোথাও সরে পড়ব কেমন ক'রে।"

সুরেশ্বর বললেন, "ধীরে সুস্থে খান আপনি। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি প্রাণীকে এধারে আসতে দেবে না। বাড়ীর সামনে গলির মুখে পুলিশের লরি দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে প্যাণ্ডেলের সামনে আপনার গাড়ী ঘিরে আছে মানুষে। তারা জানতেও পারবে না, আপনি পুলিশের লরিতে উঠে সোজা চলে যাবেন ব্রজকিষণবাবুর ওখানে।"

দরজায় কা'রা ধাক্কা দিচ্ছে। পিতুবাবু শুধু একটু সরবৎ খেয়ে বসেছিলেন। তিনি উঠে গেলেন দেখতে। গৌরী বললে, "এবার ওরা এসেছে। আর ত ধরে রাখা যাবে না আপনাকে। বলে যান, আবার কখন দেখা হবে।"

সুরেশ্বর বললেন, "আমি এখানকার পূজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। কাল কাঙালী-ভোজন হবে এখানে। আমার আর এতটুকু সময় হবে না আপনার কাছে যাবার। গৌরী যাবে আপনার কাছে বিকেলে। মাড়োয়াড়ী মহিলাদের

নিমন্ত্রণ করে আসবে। সম্ভব হলে আজ রাত্রেই তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানকার আরতি দর্শন করিয়ে দেবে। ভালই হ'ল, আপনার জন্যে এখানকার বাঙালী সমাজের সঙ্গে মারোয়াড়ীদের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আমরাও হিন্দু ওঁরাও তাই। অথচ আমরা কেউ কারও পূজা উৎসবে যোগ দিই না। ওঁদের হাতে টাকা আছে, ওঁরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু ভাল করতে পারেন মানুষের। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনি না, বাঙালী মারোয়াড়ী একে অপরকে এড়িয়ে চলে। সেই ভাবটা যদি আপনার এখানে আসার দরুন ঘোচে ত মহা উপকার হবে।"

পিতুবাবু ফিরে এসে জানালেন, "ম্যানেজারবাবু আর পুলিশ অফিসাররা উপস্থিত হয়েছেন। ভিড় আরও বাড়ছে, এখন আমাকে বার করে না নিয়ে যেতে পারলে শেষে বিপদ ঘটবে।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম আর একবার ভক্তির ঠেলা সামলাবার জন্যে। সুরেশ্বর গেলেন পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করতে। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলে গৌরী। আমার একখানা হাত ধরে আছেন পিতু-বাবু। তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, "অনেক কথা বলবার আছে আমার। অনেক কথা জানতে হবে আপনার কাছে।"

ধরা গলায় জবাব দিলেন বৃদ্ধ, "আর কেন সে সব কথা নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামানো। ভুলে যাও সে সব কথা।"

গৌরী প্রায় চুপি চুপি বললে, "ভুলতে দেরী হবে না মোটেই।'

বার হলাম সুরেশ্বরবাবুর বাড়ীর সামনের দরজা দিয়ে। ছোট গলি, গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে লরি। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলাম। পিছনে উঠলেন রূপনারায়ণ বাবু আর কয়েকটি কনেষ্টবল। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গৌরী সুরেশ্বর পিতুবাবুকে। মনে হ'ল, গৌরীর দুই চোখ যেন টল টল করছে।

মোড় ফিরল লরি। মনে মনে হাসলাম। ফক্কড়ের জন্যেও চোখের জল পড়ে তাহলে! শুকনো ভস্ম-লেপা ফক্কড়ের কপালে চোখের জল পড়লে যে

ভস্ম ধুয়ে যাবে। এই যে ছুটি মুক্তার মত বিন্দু টলটল করছে গৌরীর চোখে ও নিশ্চয়ই ফক্কড়ের জন্যে নয়। বেনা বনে কেউ মুক্তা ছড়ায় না। ফক্কড়ের কপালে আছে তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, কুকুরের মত দূর দূর করে খেদানো। নয় ত পাহাড় পর্বত ভেসে যায় এমন প্রচণ্ড ভক্তির বন্যা। এ ছাড়া অন্য কিছু ফক্কড়ের কপালে জুটতেই পারে না।

•

লরি এসে থামল ডি, এস, পি সাহেবের বাঙলায়। আধ ঘণ্টা পরে আবার সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবার ডি, এস, পি সাহেবের গাড়ীতে। প্রায় ছুটোর সময় পৌঁছে গেলাম যথাস্থানে। মহাসমারোহে আমাকে নামানো হ'ল। শেঠজীরা নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে প্যাণ্ডেলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা শক্ত করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তার মাঝখানে তক্তাপোশ পেতে তার ওপর ওঠানো হয়েছে আমার জলচৌকি। জলচৌকিখানি কিংখাব দিয়ে মুড়ে তার ওপর দেওয়া হয়েছে বহুমূল্য কার্পেটের আসন। আসনের সামনে একটা ফুলের তোড়া আর একখানা মস্ত রুপার পরাত রাখা হয়েছে। পরাতের ওপর বসানো রয়েছে সেই লাল খেরোর থলিটি। থলিটি বেশ বোঝাই। বুঝলাম সুরেশ্বরের ওখানে যা প্রণামী পড়েছে সে সমস্ত বোঝাই আছে থলিতে।

বসলাম গিয়ে আসনের ওপর। জলস্ত কলকে নিয়ে ছুটে এল একজন। মায়ের সামনে তখন হোমাগ্নি জলছে, আহুতি দিচ্ছেন পুরোহিত।

"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ, সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।"

নহবতে ভীমপলশ্রী চলছে। দলে দলে মানুষ ঢুকছে প্যাণ্ডেলে। প্রতিমা দর্শন করে এসে দাঁড়াচ্ছে বেড়ার চার ধারে। জোড় হাতে মহাপুরুষ দর্শন করছে সকলে। কেউ কেউ আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করে কি বলছে। জানাচ্ছে নিজেদের মনস্কামনা। বেশীক্ষণ কারও দাঁড়াবার উপায় নেই। এক দলকে সরিয়ে আর এক দলের স্থান করে দিচ্ছে দারোয়ানরা। অজস্র আনি,

দোয়ানি সিকি ছুঁড়ছে লোকে, একজন সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে থালায় জমা করছে। মাঝে মাঝে কলকে আসছে, ফিরিয়ে দিচ্ছি প্রসাদ করে। ব্রজকিষণ-বাবুর বাড়ী থেকে রূপার গেলাসে সরবৎও এসে গেল একবার।

হোম সমাপ্ত করে পুরোহিত মশায় এসে ফোঁটা দিয়ে গেলেন কপালে। সানায়ে পিলু ধরেছে তখন। হঠাৎ নানা রঙের অজস্র আলো জ্বলে উঠল প্যাণ্ডেলের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সহ্যও হচ্ছে না আর গোলমাল, লোকের ভিড়, সানায়ের বাজনা। একটু কোথাও নিরিবিলিতে যদি শুয়ে থাকতে পারতাম!

একদা সে সুযোগ ছিল আমার। সারা জীবনই নিরালায় কাটিয়ে দিতে পারতাম আমি তারানন্দ পরমহংসের মঠে মাসে দশ টাকা ঠিকায় মা কালীর সেবা পূজা করে। মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটুকু অন্ততঃ মিলেছিল সেখানে। সেই আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ে থাকতাম সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে। দম কাটবার উপক্রম হলেও কারও সঙ্গে একটি বাক্যালাপ করতাম না। এই পিতু বুড়ো সর্বপ্রথম টেনে বার করেন আমাকে সেই অন্ধকার ঘর থেকে! পরমাত্মীয়ের বেশে একদিন উদয় হন তিনি, আমার সমাধি-গহ্বরের অখণ্ড নির্জনতার মৃত্যুর মত শান্তি নষ্ট করার জন্যে। সেদিন সন্ধ্যারতির পর মন্দির থেকে বেরিয়ে দারুণ চমকে উঠেছিলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ি সুদ্ধ আমার চেয়ে অন্ততঃ এক হাত উঁচু এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে অন্ধকার কোণায়। কে ও!

শুনেছিলাম, তারানন্দের রহস্যময় মাঠে কত কি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদেরই কেউ হবেন মনে করে আর একটু হলে আঁতকে উঠেছিলাম আর কি! সেই মুহূর্তে কানে গেল ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"ব্রহ্মচারী, আমি কেদারঘাটের পিতু বুড়ো, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম বাবা।"

মানুষের গলা শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। তবু সেই মূর্তির দিকে চেয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আরও এগিয়ে এলেন তিনি। মন্দিরের আলো পড়ল তাঁর ওপর। ভাল করে দেখতে পেলাম তখন তাঁকে। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে সাদা থান, মোটা শুভ্র এক গোছা পৈতা গলায় এক শান্ত সৌম্য বৃদ্ধ। আগেও কয়েকবার নজরে পড়েছে এই মূর্তি পথে ঘাটে। কম্পিত কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি বললেন—"আমার ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত, তার বয়স তোমার চেয়ে ঢের বেশী হ'ত এখন। বুড়োমানুষ বিরক্ত করতে এসেছি বলে রাগ করছ না ত বাবা?"

এমন কিছু ছিল সে কণ্ঠস্বরে যে আমার বড় সাধের দুর্ভেদ্য খোলসটা খসে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কি উত্তর দিয়েছিলাম তাঁকে তাও বেশ মনে আছে এখনও। বলেছিলাম—"বুড়ো বাপ সেধে দেখা করতে এলে ছেলে কি রাগ করতে পারে কখনও।"

উত্তর শুনে দু'হাতে আমায় বুকে জাপটে ধরেছিলেন বৃদ্ধ। আর একটি কথাও সেদিন তাঁর মুখ দিয়ে বার হয় নি! তাঁর বুকে কান পেতে আমি সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম এক অন্য জাতের ভাষা। সে ভাষা বুকের ভাষা, তাতে কোনও ভেজাল ছিল না, কারণ তা মুখের ভাষা নয়।

দিনের পর দিন উন্নতি হতে লাগল কালীবাড়ীর! অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষের খাড়া মই বেয়ে ক্রমেই ওপর দিকে উঠে যেতে লাগলাম আমি। আর তফাতে দাঁড়িয়ে পিতু বুড়ো পরম তৃপ্তিতে হাসতে লাগলেন আমার উন্নতি দেখে। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই ধরণের একটা রহস্যময় জাল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখলেন। সমঝদার দ্রষ্টার ভূমিকায় আগাগোড়া সার্থক অভিনয় করে গেলেন। কালী বাড়ির ঘূর্ণি হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে না।

অথচ কালীবাড়ীর হাড়হদ্দ সবই ছিল তাঁর নখাগ্রে। পরমহংস তারানন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্র-শিষ্য তিনি। গুরুর জীবদ্দশায় প্রবল প্রতাপ ছিল তাঁর কালী-বাড়ীতে। তাঁর মুখেই আমি শুনেছিলাম কালীবাড়ীর অনেক গুহ্যাতিগুহ্য

কাহিনী। কিন্তু কেন যে পিতুবাবু অমন নির্লিপ্ত হয়ে দূরে সরে রইলেন তাঁর গুরুর মঠের ছোঁয়াচ এড়িয়ে, শত চেষ্টা করেও তা জানতে পারিনি কোনও দিন। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাঁকে কালীবাড়ীর উৎসবাদিতে নামাতে—অদ্ভুত কায়দায় বিন্দুমাত্র আঘাত না দিয়ে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু আমার ওপর ছিল তাঁর কড়া নজর। মানুষের খোশামুদিতে আর সদ্যলব্ধ সিদ্ধপুরুষ পদের গরমে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে না ওঠে, সে জন্যে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। উপদেশ না দিয়ে, শাসন না করে বা কারও নিন্দে না করে শুধু নিজের সাহায্য দিয়ে তিনি আমায় রক্ষা করেছেন। একবার আমার বেশ শক্ত জাতের জ্বর হয়। তখন মাথার কাছে বসে রাত কাটিয়েছিলেন পিতুবাবু। সবই তিনি করেছিলেন, বাপের যা করা উচিত সাবালক ছেলের জন্যে। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপার, নির্জলা মিথ্যা একটা খ্যাতি আমার, পিতুবাবুর মত লোকের মাথা খারাপ করে দিলে। অতি সাধারণ লোকের মত তিনি বিশ্বাস করে ফেললেন যে আমি একটি মহাগুণী সাধক মানুষ, বিশ্ব সংসার সুদ্ধ মানুষকে শুধু আমার এই পোড়া চোখের দৃষ্টি দিয়েই বশীভূত করে ফেলতে পারি। নিজেই অনেকের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন যে তারানন্দের গদির উপযুক্ত মানুষ আমি। আর কোনও শক্তি থাকুক না থাকুক তারানন্দের মত সর্বনেশে চক্ষু দুটি আছে আমার। সুতরাং সকলের সাবধান হওয়া একান্ত উচিত।

আর কেউ সাবধান হ'ক না হ'ক, নিজে তিনি যথেষ্ট সাবধান হলেন। একটি দিনের জন্যেও তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীর দরজা পার হতে দিলেন না। বরং সুবিধে পেলেই উপদেশ দিতেন—ব্রহ্মচারী মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে। তাঁর মতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারীর কোনও গৃহস্থ বাড়ীতে না যাওয়াই একান্ত উচিত। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কোনও দিন পিতুবাবুর বাড়ী থেকে কেউ এল না মা কালী দর্শন করতে। লোকের মুখে শুনতাম, ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়িনী হয়ে আছেন। আর থাকবার মধ্যে ছিল এক মেয়ে।

সে মেয়ের মুখও ত্রিভুবনে কেউ কোনও দিন দেখতে পেত না।

রোজ ব্রাহ্মমুহূর্তে আসতেন পিতুবাবু। পাথর বাঁধানো গলিতে উঠত তাঁর লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ। বিছানায় শুয়েই শুনতে পেতাম তাঁর স্তোত্রপাঠ।

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।

ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্র স্ত্রী শিখী চ ত্রিলোকপাং॥

. মন্দিরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জপ করতেন পিতুবাবু। কখনও বসতেন না। মঙ্গলারতি শেষ হ'লে মাকে প্রণাম ক'রে লাঠি ঠক ঠক ক'রে ফিরে যেতেন। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম, মঙ্গলারতির সময় একটি দিনও অনুপস্থিত হন নি তিনি। কিন্তু অন্য কোনও সময় কালীবাড়ীতে ঢুকতেন না। বিশেষ পূজা উৎসবের দিনে একবার আসবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছি, অন্ততঃ মায়ের প্রসাদ একটু বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে মিনতি করেছি কিন্তু কোনও ফল হয় নি। একটু হেসে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হ'লে বিকেল বেলা কেদারঘাটে যেতে হ'ত আমায়। ঘাটে বসে তাঁর কাছ থেকে শুনতাম তাঁর গুরু তারানন্দের অমানুষিক সব কীর্তিকাহিনী। শুনতাম কি রকম জাঁকজমক ছিল তখন কালীবাড়ীতে। কিন্তু মঠ ধ্বংস হ'য়ে গেল, মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি অভিচার ক্রিয়া আর উদ্দাম পঞ্চ-মকারের স্রোতে তলিয়ে গেল তাঁর গুরুর সুনাম মানমর্যাদা। বলতে বলতে পিতুবাবু আকুল হয়ে উঠতেন। জড়িয়ে ধরতেন আমার দু'হাত। বলতেন, "সাবধান ব্রহ্মচারী, খুব সাবধান। এ বড় ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। যেটুকু শক্তি পেয়েছ তা সামলে রাখাই সবচেয়ে বড় কথা। নয় ত নিজেও মরবে, অপরকেও মারবে।"

আপ্রাণ চেষ্টা করতাম তাঁকে বিশ্বাস করাতে যে বিন্দুমাত্র কোনও শক্তি পাই নি আমি। সে জিনিষ যে কি তা আমি জানিও না, বিশ্বাসও করি না। হুজুকে মেতে যার যা খুশি বলছে। কিন্তু পিতুবাবুর মত মানুষ কি ক'রে বিশ্বাস করেন তাদের কথা!

ফল হ'ত একদম বিপরীত। পিতুবাবু ভাবতেন আমি তাঁর চোখেও ধুলা

দেবার চেষ্টা করছি। তাকেও ঠকাবার চেষ্টা করছি বলে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠত। বলতেন, "আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রে কোনও লাভ হবে না বাবা। তুমি যে কি পারো আর কি পারো না, আমি তা ভাল ক'রে জানি। তোমার চক্ষু দুটি দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার ভয় হয়, নিজে তুমি কোনও দিন কারও ফাঁদে না পা দাও।"

কেটে গেল গোটা তিনেক বছর। এত উঁচুতে পৌঁছে গেলাম আমি যে পিতুবাবুর কথা ভেবে তখন আর মন খারাপ হ'ত না। একান্ত আপনার লোক হয়েও পিতুবাবু একটি দিনের জন্যে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন না তাঁর বাড়ীতে, এজন্য তাঁর ওপর রাগ অভিমান করবারও আমার ফুরসত রইল না। তখন নাম করা মানুষে সাধ্য সাধনা করছেন আমাকে একবার তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে। উকিল ডাক্তার অধ্যাপক, যাঁরা ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদের সমান দরের মানুষ, তাঁরা আমার কৃপা লাভের জন্যে ধন্না দিচ্ছেন তখন। কাজেই একান্ত কাছের মানুষ হয়েও দিন দিন দূরে সরে গেলেন পিতুবাবু।

ইতিমধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটে বসল যার ফলে পিতুবাবুর সব সতর্কতা ভণ্ডুল হয়ে গেল। একান্ত যত্নে আমার সর্বনেশে চক্ষু দু'টির নাগালের বাইরে রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র কন্যাকে। বাবা কেদারনাথের যোগসাজসে সেই মেয়েই পড়ে গেল একেবারে আমার হাতের মুঠোয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে শিবরাত্রির দিন বেলা তিনটের সময়। অনেক বিচার বিবেচনা ক'রে সেই অসময়ে পিতুবাবু মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন কেদার-নাথের মাথায় জল ঢালাতে। কালীবাড়ীর ভক্তদের ছেড়ে সেই সময় আমিও যে যাবো শিব পূজা করতে, এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

যথারীতি কেদারনাথের একটি মাত্র দরজায় তুমুল সংগ্রাম চলেছে। এক দল মানুষকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দরজা আটকানো হচ্ছে। তারা বার হতে না হতে একদল মরীয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দরজার ওপর। এক হাতে ফুলের সাজি আর এক হাতে দুধ গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে, মানুষের চাপে এগিয়ে যাচ্ছি দরজার

দিকে। নজরে পড়ল পিতু বুড়োকে। মানুষের ধাক্কায় তিনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ পড়ল। আমরা অনেকগুলি লোক সেই চাপের চোটে দরজা পার হয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়লাম।

তখন ফুলের সাজি আর জলের ঘটি সুদ্ধ দু'হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছি। মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার, কোনও দিকে মুখ ফেরাবার উপায় নেই। এক সময়ে পৌঁছবই শিবের সামনে। তখন দুধ গঙ্গাজল ফুল বেলপাতা তাঁর ওপর ফেলে দিয়ে আবার মানুষের চাপেই বেরিয়ে যাবো মন্দির থেকে। এই হচ্ছে চিরকালের ব্যবস্থা, এই ভাবেই শিবরাত্রির দিন আমাদের সব ক'টি প্রসিদ্ধ শিববাড়ীতে বাবাদের মাথায় জল ঢালে লোকে। গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি আর হৃদয় বিদারক চিৎকার এইগুলিই হচ্ছে আমাদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সবচেয়ে মারাত্মক মহিমা।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল পেছন থেকে টান পড়ছে আমার কোমরের কাপড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম মুঠো ক'রে কে ধরে আছে আমার কোমরের কাপড়। মুখ ফেরাবার উপায় নেই। কিন্তু বেশ মালুম হ'ল যে ধরে আছে আমার কোমর, সে পুরুষ নয়। কষে ধরে আছে সে আমার কোমরের কাপড় যাতে ধাক্কার চোটে ছিটকে না যায় অন্য দিকে।

কোনও রকমে মানুষ গুঁতিয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেও ঠিক পৌঁছে গেল আমার সঙ্গে। দু'জনে দেওয়ালের গায়ে চেপটে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন তার মুখ আমার কানের কাছে। কানে গেল দুটি কথা, "আমি পিতু মুখুজ্যের মেয়ে, আমাকে বার ক'রে নিয়ে চলুন মন্দির থেকে।"

বলেছিলাম, "যেমন ধরে আছ তেমনি ধরে থাক, খবরদার যেন হাত না ফসকায়।"

হাত ফসকায় নি পিতুবাবুর মেয়ের। যথা নিয়মে মানুষের চাপে আবার বেরিয়েও এসেছিলাম মন্দির থেকে।

বাইরে পদার্পণ করেই আমার কোমর ছেড়ে দিয়েছিল সে। দূরে থেকে

দেখলাম পিতুবাবু পাগলের মত খুঁজছেন মেয়েকে। একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে মেয়ে ছুটে চলে গেল বাপের কাছে। আমিও আবার মানুষের ঠেলায় মন্দিরে ঢুকলাম। পূজাটা যে আমার সারা হয়নি তখনও।

শিবরাত্রির দিন কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে ঘটেছিল সেই তুচ্ছ ঘটনাটি। একমাত্র বাবা কেদারনাথ ছাড়া আর কেউ সাক্ষী ছিল না তার। প্রয়োজনও ছিল না অন্য সাক্ষীর। অতি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা, হয়ত মনেও থাকত না আমার। কিন্তু পিতুবাবুই খোঁচাখুঁচি করে সেই সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ ক'রে ছাড়লেন।

তিন দিন পরে কেদার ঘাটে ব'সে পিতুবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি কি হয়েছিল সেদিন মন্দিরের মধ্যে, কি আমি বলেছিলাম তাঁর মেয়েকে, তাঁর মেয়েই বা কি বলেছিল আমাকে। কোনও কথাই হয়নি আমাদের মধ্যে, সেই ভিড়ে আর গোলমালে আলাপ আলোচনা সম্ভবই নয়, আর অত অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু আলাপ হওয়া সম্ভব। নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিলাম প্রাণপণে, কিন্তু পিতুবাবুকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। তারপর পিতুবাবু বেমালুম ভুলে গেলেন সেদিনের ঘটনাটা। আর একটি দিনের জন্যেও একটি কথা উত্থাপন করলেন না সে সম্বন্ধে।

তিনি ভুলে যান, কিন্তু মেয়েটিও যে অনায়াসে ভুলে যাবে সে দিনের ঘটনাটা তা আমি ধারণা করতে পারিনি। আশা ক'রে রইলাম যে একবার অন্ততঃ পিতুবাবুর মেয়ে আসবে মঠে কালী দর্শন করতে বা পিতুবাবু নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন আমায় তাঁর বাড়ীতে। আশা করতে অবশ্য কেউ আমায় পরামর্শ দেয়নি। নিজের গরজে আশা করলাম, আত্মীয়তার কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম তখন, তাই অনর্থক আশা ক'রে রইলাম। তারপর নিরাশ হ'লাম। ফলে রাগ দুঃখ অভিমান জমে উঠল মনের মধ্যে। বুঝলাম ওঁরা নিজেদের আমার চেয়ে এত উচ্চস্তরের জীব বলে জ্ঞান করেন যে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না আমাকে। সত্যিই ত, কালীবাড়ীর পুরুতকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যাবার

কি এমন গরজ পড়েছে পিতুবাবুর, আর তাঁর কন্যাই বা সেধে ভদ্রতা দেখাতে আসবেন কেন সামান্য পুরুতের কাছে!

আট আটটি বছর গড়িয়ে গেল আর একবার পিতুবাবুর কন্যার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে। শুধু আটটি বছরই নয়, অনেকটা স্থানও পার হতে হ'ল আমায়। কোথায় কাশী, কোথায় চট্টগ্রাম। এতটা পথ পার হয়ে দেখা হ'ল আমার সঙ্গে পিতুবাবুর মেয়ের। না, তা ঠিক নয়, আজ যার সঙ্গে পরিচয় হ'ল তিনি অধ্যাপক সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী। আর আমিও সেই কালীবাড়ীর দশ টাকা দামের পুরুত নই, সহরের সবচেয়ে বড় লোক শেঠ ব্রজকিষণলালের গুরুজী মহারাজ।

সুতরাং এবার ভদ্রতা দেখিয়েছে গৌরী। শুধু সাধারণ ভদ্রতা নয়, অসাধারণ আত্মীয়তাও দেখিয়েছে, মায় দু বিন্দু চোখের জল। আর কি চাই আমি! আর ত আক্ষেপ করবার মত কিছুই রইল না, সুদে আসলে আজ সব মিটিয়ে দিয়েছে গৌরী।

মনে মনে ঠিক করলাম এখান থেকে যাবার সময় অধ্যাপকের স্ত্রীকে একখানি দামী বেনারসী কিনে দিয়ে যাব। টাকা নোট গয়না-গাঁটিতে বোঝাই লাল খেরোর থলেটা রয়েছে সামনের থালার ওপর! ফক্কড়ের সম্পত্তি, কিন্তু কোন্ চুলোয় নিয়ে যাবে ফক্কড় ওগুলো বয়ে? কার কাছে গচ্ছিত রাখবে ঐ সম্পদ? ফক্কড়ের কি উপকারে লাগবে ঐ থলে বোঝাই জঞ্জাল?

আপদ, আপদ জুটেছে এক গাদা। ইচ্ছে হ'ল, এক লাথি মেরে ফেলে দি থালা থলে সব কিছু সামনে থেকে।

কে কল্কে বাড়িয়ে ধরলে সামনে। কল্কে নিয়ে চোখ বুজে দিলাম একটা মোক্ষম টান। ওধারে তখন পিলু শেষ ক'রে গৌরীতে পৌঁছেছে সানাই।

চোখ চাইতে হ'ল আবার। দামী বেনারসী পরে কে একজন গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হ'য়ে প্রণাম করছে। পাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ব্রজকিষণের পত্নী। প্রণাম সেরে সোজা হয়ে উঠে বসতে চিনতে পারলাম। সাজে পোষাকে অলঙ্কারে অপরূপ বানিয়েছে অধ্যাপক মশায়ের স্ত্রীকে।

সানাই তখন গৌরী ছেড়ে পূরবীতে পৌছল।

মানুষের নজর বেশী করে আকর্ষণ করার সৎ বাসনায় যে সব মহিলারা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা দেন, তাঁরা এক বিশেষ ধরণের অঙ্গুলিবিন্যাস জানেন। দু'হাতের অঙ্গুলি-কটির সাহায্যে মুখের ওপরের ওড়না অল্প একটু তুলে ধরবার কায়দাটুকু সত্যিই দেখবার মত জিনিষ। সেই সময় অঙ্গুলিগুলির যে চমৎকার ভঙ্গিমা দেখান তাঁরা, তার নাম হওয়া উচিত ওড়না মুদ্রা। অবগুণ্ঠন মুদ্রা ত শাস্ত্রেই আছে। পুরাণ শাস্ত্রকাররা ওড়না মুদ্রার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ আমাদের একটি দেবীর মুখও ওড়না ঢাকা নয়। ভবিষ্যৎ শাস্ত্রকারদের ওড়না মুদ্রার কথাটি চিন্তা করা উচিত। হয়ত কোনও প্রগতিবাদী শিল্পী ওড়না ঢাকা দেবী-মূর্তিও বানিয়ে ফেলতে পারেন।

শেঠজীর ঘরণী—ওড়না মুদ্রায় অল্প অবগুণ্ঠন সরিয়ে অনেক রকমের দামী পাথর বসানো নথটি দেখিয়ে ফিসফিস করে নিবেদন করলেন যে সুরেশ্বর বাবুর স্ত্রী এসেছেন নিমন্ত্রণ করতে। আরতি দেখার জন্যে মারোয়াড়ী মহিলাদের সসম্মানে নিয়ে যাবেন তাঁদের পূজামণ্ডপে। শেঠজীদের আপত্তি নেই, এখন আমার অনুমতি পেলেই হয়।

আমার অনুমতির জন্যে ওঁদের যাওয়া আটকাচ্ছে! অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

চোস্ত হিন্দীতে গৌরী তখন তার আরজি পেশ করলে।

"নিজেদের পূজো ছেড়ে অন্য পূজো দেখতে গেলে যদি কোনও অপরাধ হয় এই ভয় করছেন এঁরা। এখানের আরতি হয়ে গেলে আমি এঁদের নিয়ে যাব। এখানের আরতি ত একটু পরেই আরম্ভ হবে। আমাদের ওখানে আরতি হয় রাত ন'টার পর। কৃপা করে যদি আপনি আদেশ দেন—"

চোখ মুখের ভাব, গলার স্বর মায় হাত জোড় করে থাকা সব মিলিয়ে একেবারে নিখুঁত অভিনয়। ভনিতা করা কাকে বলে তা জানে বটে গৌরী।

ওর হাবভাব দেখে গাম্ভীর্য বজায় রাখা সহজ নয়। শিবনেত্র হয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তার শেঠপত্নীর দিকে চেয়ে হাসিমুখে ঘাড় নাড়লাম।

ঢাক ঢোল বেজে উঠল। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে প্রতিমার সামনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাঁশ দিয়ে ঘিরে মহিলাদের জন্যে আলাদা স্থান বানানো হয়েছে প্রতিমার ডান পাশে। শেঠানী গৌরীকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। গৌরী শুনতেই পেলে না, তখন সে জোড় হাতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার ধ্যানভঙ্গ না করে শেঠানী একাই চলে গেলেন—তাঁর আপনজনেদের কাছে। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা সাধু দর্শন করছিল তারাও আরতি দেখতে দাঁড়াল গিয়ে প্রতিমার সামনে। সকলের দৃষ্টি প্রতিমার দিকে। অনেকক্ষণ পরে মানুষের দৃষ্টির আড়াল হতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরতির সময় দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। বাজনার তালে তালে পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখা ওঠা নামা করছে। সেই দিকে চেয়ে আছি। মাত্র দু'হাতের মধ্যে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, মনে হ'ল যেন কি বলছে সে। ওর দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। জোড়হাতে প্রতিমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। কান পেতে রইলাম। ঢাকঢোলের তুমুল আওয়াজের মধ্যেও কানে গেল—"কাল একবার আমাদের ওখানে যাওয়া চাই কিন্তু।" আবার চাইতে হ'ল ওর দিকে। চোখে চোখে মিলল। মিনতি উথলে উঠছে ওর চক্ষু দুটিতে।

পঞ্চপ্রদীপ নামিয়ে অর্ঘ্যপাত্র হাতে তুলে নিলেন পুরোহিত। অপরূপ ভঙ্গিমায় অল্প অল্প কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন জলপূর্ণ শঙ্খটি প্রতিমার সামনে। একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি ঘিরে রয়েছে মা দুর্গার মুখখানি, আরতির বাজনাতেও উন্মাদনা নেই। প্যাণ্ডেল ভর্তি মানুষ এতটুকু নড়াচড়া করছে না। সকলের একাগ্র দৃষ্টি মায়ের মুখের ওপর।

ঢাকঢোলের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার উঠল কোথা থেকে—"আগুন। আগুন।"

চমকে উঠে চারিদিক দেখতে লাগলাম। "কৈ আগুন? কোথায় আগুন?"

ত্রিপল আর পাট পোড়ার গন্ধে দম আটকে এল। নজর গিয়ে পড়ল প্রতিমার পিছন দিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে বার হচ্ছে কালো ধোঁয়া। যেন অসংখ্য অজগর সাপ ফুঁসিয়ে উঠে তেড়ে আসছে মায়ের চারিদিক ঘিরে।

পুরোহিতের হাত থেকে খসে পড়ল শঙ্খটি। বন্ধ হয়ে গেল ঢাক ঢোল কাঁসির বাজনা। আকুল আর্তনাদ উঠল—"আগুন আগুন"। যে যেখানে ছিল সেখানেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল চারিদিকে। বড় বড় ত্রিপল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া মণ্ডপটির মধ্যে নানা জায়গায় বাঁশ বেঁধে বেড়া দেওয়া হয়েছে মেয়ে পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বানাবার জন্যে। বার হবার পথ মাত্র একটি, যার ওপর নহবতের ঘর তৈরী হয়েছে সেই মূল তোরণটি। সমস্ত লোক একসঙ্গে আছড়ে গিয়ে পড়ল তোরণটির ওপর। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল তোরণটি। বাজনাদাররা তাদের বাদ্যযন্ত্রসহ হুড়মুড় করে পড়ল মানুষের ঘাড়ের ওপর। ইলেকট্রিকের তার আনা হয়েছিল তোরণের ভেতর দিয়ে। সেই তার গেল ছিঁড়ে, ফলে সমস্ত আলো একসঙ্গে ঝপ করে নিভে গেল।

মণ্ডপের ভেতর তখন ধোঁয়ায় বোঝাই হয়ে গেছে। নিবিড় অন্ধকারে দম আটকানো ধোঁয়ার মধ্যে উঠছে মেয়ে পুরুষের করুণ আর্তনাদ। হঠাৎ তখন মনে পড়ল গৌরীর কথা। সেই মুহূর্তে খেয়াল হ'ল আমার একখানা হাত কে আঁকড়ে ধরে আছে। বুঝতে পারলাম যে ধরে আছে সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

কড় কড় কড়াং।

বজ্রাঘাতের মত শব্দ উঠল কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটাকতক বোমা ফাটল কোথায়। তারপর সব রকমের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল দারোয়ানদের সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কার।

"ভাগো—ভাগো, টিনা ছুটতা হায়।"

ঠিক সেই সময় আবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম প্রতিমাখানি। মা তখন অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছেন। আগুন ধরেছে চালচিত্রে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ অসুর সিংহ সব-কটি মুখ আগুনের আভায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ষোল আনা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন সকলে। সবার ওপরে মায়ের মুখখানির দিকে চাওয়া যায় না। জননী জেগেছেন, এ হচ্ছে সেই রূপ—

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।

পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥

সেই দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্যে সব ভুলে গেলাম।

হুঁশ ফিরে এল একটা ভীতিবিহ্বল চাপা কণ্ঠস্বর শুনে। বুকের খুব কাছ থেকে সে বললে—"চল পালাই, পালাই চল এখান থেকে।"

মনে পড়ে গেল বজরঙ্গবলীর মন্দিরের গায়ে ত্রিপল আলগা করে বাঁধা আছে আমার বাইরে যাওয়া-আসার জন্যে। গৌরীকে একরকম তুলে নিয়ে আন্দাজ করে ছুটলাম সেই দিকে। অন্ধকারে জায়গাটার ঠাহর পেতে দু'একবার ভুল হ'ল। তারপর নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলাম প্যাণ্ডেল থেকে। পিছন ফিরে দেখলাম পাটগুদামটি লালে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা গুদামটির সর্বাঙ্গ দিয়ে সহস্র মুখে বৈশ্বানরের সহস্র লেলিহান জিহ্বা বার হয়েছে। মনে পড়ে গেল কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা পুরোহিতের আহুতি মন্ত্র—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।"

দু'চোখ ফেটে জল এল। সর্বকর্মই সুন্দরভাবে সাধন করলেন বৈশ্বানর। করবার আর কিছুই বাকি রাখলেন না। বাঁশের ওপর অজস্র ত্রিপল ঢাকা প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সভয়ে আমায় জাপটে ধরলে গৌরী। আগুনের আঁচে গা ঝলসে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—"চল, পালাই এখন এখান থেকে।"

চারিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে তখন। মানুষের সামনে পড়বার ভয়ে পাটগুদামের সামনে দাঁড় করানো মালগাড়ীগুলির আড়াল দিয়ে ছুটতে লাগলাম

দু'জনে। বড় বড় খোয়ায় হোঁচট খেয়ে গৌরী দু'একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে আমাকে ধরে। তখন তার একখানা হাত চেপে ধরলাম শক্ত করে। তারপর কোন্ পথে কোথা দিয়ে ঘুরে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছলাম সে সম্বন্ধে দু'জনের একজনেরও কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না।

প্রথমে গৌরীর মুখেই কথা ফুটল। হঠাৎ সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চারিদিকে চেয়ে সভয়ে বলে উঠল—"এ আমরা কোথায় এলাম!"

চমকে উঠলাম। দু'পাশে অন্ধকার মাঠ, মাঝে মাঝে নিবিড় কালো বড় বড় টিলা, ঘর-বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তবে ভাগ্য ভাল আমাদের যে পাকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম—"তাই ত, কোথায় এসে পৌঁছলাম আমরা। যাচ্ছিই বা এখন কোন্ দিকে?"

ডান দিকে বহুদূরে অনেকগুলি আলো জ্বলছে। সেই দিকে দেখিয়ে গৌরী বললে—"ঐ যে আলো জ্বলছে, ওখানে গেলেই একটা উপায় হবে। চল ঐ ধারেই যাওয়া যাক।"

বললাম—"তাই চল, কিন্তু ও ত অনেক দূর—অতদূর হাঁটতে পারবে তুমি?"

গৌরী তখন হাঁটতে সুরু করেছে, উত্তর দিলে না।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি দু'জনে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত খানা খন্দ। ফকড়ের চোখ অন্ধকারে জ্বলে। ও বেচারা ঘরের বৌ, ও পারবে কেন অন্ধকারে চলতে। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল দু'একবার আমাকে ধরে। শেষে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"আমার হাত ধরে চল গৌরী, নয় ত পড়ে দাঁত মুখ ভাঙবে।"

হাত ধরলে গৌরী। কিছুক্ষণ পরে যেন নিজেই নিজেকে বলতে লাগল—"এইবার নিয়ে দু'বার হ'ল। ভয়ানক একটা কাণ্ড না ঘটলে কিছুতেই আমাদের দু'জনের কাছাকাছি হবার উপায় নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শুনতে পেলাম আবার গৌরীর কণ্ঠস্বর। প্রায় চুপিচুপি বললে সে—"মনে পড়ে সেই শিবরাত্রির কথা?"

বললাম. "পড়লেও কারও কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নেই। ভুলে যাবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার, তার কৃপায় এই মহাষ্টমীর রাতের কথাও বাড়ী গিয়ে বেমালুম মন থেকে মুছে যাবে তোমার। এখন একবার যে কোনও উপায়ে বাড়ী পর্যন্ত পৌছতে পারলে হয়।"

বিশ্রী শব্দ করে বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল গৌরী। বললে—"না ভুললে চলবে কি করে আমার। ভুলতে না পারলে হয় গলায় দড়ি দিতে হয় নয় ত খোলা আকাশের তলায় রাস্তায় নেমে আলেয়ার পিছনে ছুটে মরতে হয়। মানুষের কাছ থেকে মানুষের ব্যবহার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যিনি মানুষই নন, যাঁর শরীরে দয়া মায়া কিছুই নেই, সেই রকমের কড়া সাধক মহাপুরুষের কথা মনে রাখলে কপালে জোটে শুধু লাঞ্ছনা যন্ত্রণা আর অপমান। যা হচ্ছে মরার বাড়া। শুধু শুধু দগ্ধে মরে লাভ কি!"

চুপ করে রইলাম। বলুক ওর যা খুশি, যা বলে ওর তৃপ্তি হয় বলুক। বলে শান্তি পাক ও। ভাল করে জানি ওর কথার মূল্য কি। কালী-বাড়ীর দশ টাকা মাইনের পুরুতকে একবার দেখা দিতে তখন ওদের বাপ বেটীর সম্মানে বেধেছিল। সেই শিবরাত্রির পরে অনর্থক বৃথা আশায় আমি দিন গুনেছিলাম। ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায়নি আমার মনের অবস্থা। একটা নির্লজ্জ কাঙালপনা তখন পেয়ে বসেছিল আমাকে। মুখ বুজে তার ফলও ভোগ করেছিলাম। এই গৌরীর জন্যে অনেকগুলো রাতের ঘুম আমায় বিসর্জন দিতে হয়েছে সে সময়। সে ভুল আর একবার করব না কিছুতেই সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রীর নাকীকান্না শুনে। এখন আমি অনেক পোড় খেয়েছি। এখন আমি একটি বাস্তু ফক্কড়। ফক্কড়ের জন্যে আকাশ অকৃপণ হস্তে জল বাতাস আলো ঢেলে দেয়। তার চেয়ে বেশী আর কিছুর ওপর দাবিও নেই আমার, লোভও নেই।

গৌরী আবার আরম্ভ করলে—"কি লোভে আমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে গেলে তুমি তা তখন বুঝতে পারিনি। জানতাম না ত যে ওটা তোমার একটা খেলা। সবাই বলত যে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি মানুষকে পাগল করে দাও। আমি তা বিশ্বাস করিনি। কেন বাবা আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে তোমার চোখের নাগালের বাইরে রেখেছিলেন, তা বোঝবার মত বয়সও নয় তখন আমার। তারপর যেদিন ভাল করে বুঝতে পারলাম তোমার খেলা, সেদিন কোথায় যে পোড়ার মুখ লুকাব তা ভেবে পেলাম না। যতগুলি চিঠি লুকিয়ে আমি পাঠিয়েছিলাম তোমায় সবগুলি যেদিন আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বাবা মাথা কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন সেদিন—"

হাঁটা আমার বন্ধ হয়ে গেল যে হাতটা ওর ধরেছিলাম সেটাতে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ওকেও থামালাম। কোনও রকমে মুখ দিয়ে বার হ'ল—"কি! কি বললে তুমি গৌরী?"

হাতটা ছাড়াবার জন্যে মোচড়াতে লাগল গৌরী। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল—"থাক, আর ন্যাকা সেজে কাজ নেই। যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর যে সত্যি, তা আমরা দু'জনেই ভাল করে জানি। আজ আমায় ভোলাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না তোমার। সে বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। এখন আর ঐ চোখ দিয়ে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। ও চোখের দৃষ্টিতে আর এতটুকু বশীকরণের শক্তি নেই। তুমি এখন একটি বিষহীন ঢোঁড়া। আজ আর তুমি কোনও সর্বনাশই করতে পারবে না আমার।"

আরও জোরে চেপে ধরেছিলাম ওর হাত। বোধ হয় প্রাণপণে চেঁচিয়েও উঠেছিলাম। "ভুল, আগাগোড়া মিথ্যে। কাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে? কে পেয়েছে তোমার চিঠি? কার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলে চিঠি? বল—বলতেই হবে তোমাকে।"

কে যেন আমার গলা চেপে ধরলে। আর একটি কথাও মুখ দিয়ে বার হ'ল

না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন গৌরী আমার সামনে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি খুঁজতে লাগল আমার দুই চোখে। স্পষ্ট দেখলাম তার চক্ষু দুটিতে যেন কিসের আলো ফুটে উঠেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল। কানে বাজতে লাগল একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। তারপর বেশ লম্বা একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গৌরীর বুক খালি করে। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলে সে—"ভুল! কার ভুল? কোথায় ভুল হ'ল?"

ওর হাত ছেড়ে দিলাম। বললাম, "ভুল আমার ভাগ্যের। কালীবাড়ীর তুচ্ছ পুরুতের বরাতের দোষ সব। নয় ত কোনও ছুতায় অন্ততঃ একবার তুমি দেবী দর্শন করতে আসতে। কিংবা তোমার বাবা একটিবার আমায় ডেকে নিয়ে যেতেন তোমাদের বাড়ীতে। শিবরাত্রির তিন দিন পরে কেদারঘাটে বসে তোমার বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন, মন্দিরের মধ্যে কি কি আলাপ হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার। সেদিন কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি জবাব দিয়ে। অত অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভিড়ে যে কোনও আলাপই সম্ভব নয় তা তিনি বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস তিনি না করুন, কিন্তু আমি ভাল করে বুঝেছিলাম যে তুমি বলেছ তোমার বাবাকে, কে তোমায় মন্দির থেকে বার করে নিয়ে আসে। তারপর দিনের পর দিন আশা করে রইলাম যে হয় তুমি একবার আসবে কালীবাড়ীতে বা তোমার বাবা একবার ডেকে নিয়ে যাবেন আমায় তোমাদের বাড়ীতে। কেউ আমায় আশা করতে পরামর্শ দেয়নি। কালীবাড়ীর তুচ্ছ পুরুতকে তোমরা কি চোখে দেখতে তা ঠিক বুঝতে না পেরে মহা ভুল করেছিলাম আমি। তার ফলও ভোগ করেছি। একটি প্রাণীও জানতে পারেনি, কি জ্বালায় জ্বলে মরেছি রাতের পর রাত—"

গৌরীর গলার স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিলে। যেন একটা ক্রুদ্ধা ফণিনী হিসহিস করে উঠল—"তার মানে, একখানা চিঠিও পাওনি তুমি?"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে গৌরী। কার চিঠি পাব আমি? কে আমায় চিঠি দেবে?"

"কালীবাড়ীতে যে অন্ধ বুড়ীটা থাকত, যাকে তুমি খাওয়াতে পরাতে, সেই বুড়ীটা আমার কোনও চিঠি দেয়নি তোমার হাতে?"

উত্তরও দিলাম না আর। শুধু নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। ঘন ঘন পড়ছে ওর নিঃশ্বাস, বুকও ওঠা নামা করছে অস্বাভাবিক ভাবে। তারপর ওর গলার স্বর একেবারে ভেঙে পড়ল। "উঃ কত বড় শয়তানী সেই অন্ধ বুড়ী! আর কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে আমার বাবা! নয় ত, নয় ত আজ আমাকে—"

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে। তারপর শুনতে পেলাম অস্ফুট কান্নার শব্দ, যেন অন্ধকারটাই কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জনে। অনেকক্ষণ ধরে সেই কান্না চাপবার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক দিন আগে কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আমার পিঠের সঙ্গে লেপটে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ের উত্তাপ যেন স্পষ্ট টের পেলাম। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ আবার আমার নাকে গেল বহুদিন পরে। সেই ভীরু চোখ দুটির অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি স্পষ্ট চিনতে পেরে দারুণ মোচড় খেলাম নিজের বুকের মধ্যে।

সে দিনটি ছিল শিবচতুর্দশী—আর আজ মহাষ্টমী। আট বছর পরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দু'জনে, খোলা আকাশের তলায় জনমানবহীন মাঠের মধ্যে। রাত কত হবে এখন!

আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেদিনকার সেই কুমারী মেয়েটির সঙ্গে আজকের এই অধ্যাপকের স্ত্রীর কত প্রভেদ! আহা এতক্ষণে হয়ত স্ত্রীর খোঁজে পাগল হয়ে উঠেছেন অধ্যাপক

মশাই, আর তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর মেয়ের শোকে মাথা খুঁড়ে মরছেন। না, আর দেরি করা কিছুতেই উচিত হবে না। বললাম—"এবার চল তোমায় পৌঁছে দি। হয়ত এতক্ষণে তাঁরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, হয়ত এখন—"

বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"কোথায় যাবো? কেন যাবো—"

অদ্ভুত প্রশ্ন, কি জবাব দোব! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু সামলে নিয়ে গৌরী বলে যেতে লাগল, "দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলে তুমি। তোমার খেয়ে তোমার পরে' সেই বুড়ীটা বেঁচেছিল। তুমি চলে যাবার পরে তাকে ঘাটে বসে ভিক্ষে করতে হয়। যখন মরল তখন দেহটা তুলে নিয়ে গেল ডোমেরা। কত দিন তাকে আমি লুকিয়ে খাইয়েছি, চুরি করে টাকা পয়সা দিয়েছি তাকে। আর শয়তানী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগাগোড়া। হঠাৎ তুমি চলে গেলে কাশী ছেড়ে, আমি পড়লাম রোগে। রোগে পড়েও কত খোশামোদ করেছি বুড়ীকে, যা হ'ক একটু তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে আনবার জন্যে। আমার চিঠির উত্তর তার মুখে পাঠাতে তুমি। কি বিশ্রী ন্যাকামি সে সব। তখনই আমার সন্দেহ হ'ত, তোমার মত লোক অতটা বে-হুঁশ হয়ে ওসব কথা বলতে পারো না বুড়ীকে। তবুও তোমার হাতের একটু লেখা পাবার জন্যে বুড়ীকে পীড়াপীড়ি করতাম আর ঘুষ দিতাম। আর বুড়ী আমায় বলত যে লিখে উত্তর দিতে তুমি ভয়ানক ভয় পাও। তারপর সেই অসুখের সময়ই এল তোমার প্রথম চিঠি।"

সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনতে শুনতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে আমার তখন।

কোনও ক্রমে মুখ দিয়ে বার হ'ল, "কোথা থেকে পাঠিয়েছি সে চিঠি আমি? কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে?"

যেন মরা মানুষে কথা বলছে, এমন ভাবে বলে গেল গৌরী।

"যা লেখা ছিল তোমার চিঠিতে, তা পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে, কোনও উপায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকলে আমি গলায় দড়ি দিতাম।

আমার বাবাকে তুমি লিখেছিলে চিঠিখানা দিল্লী না হরিদ্বার থেকে আর তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বাণ্ডিল বেঁধে আমার সব কখানি চিঠি। লিখেছিলে তুমি—আপনার কন্যার গুণরাশি আপনাকে জানাবার জন্যে তার সব চিঠিগুলি এই সঙ্গে পাঠালাম। আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, আমার কোনও ক্ষতি সে করতে পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি সাবধান হবেন।"

অতি কষ্টে উচ্চারণ করলাম, "তারপর গৌরী—তারপর ?"

বোধ হয় আমার সেই মর্মন্তুদ কণ্ঠস্বর শুনেই গৌরী চমকে উঠল। এবার আমার একখানা হাত ধরে ফেললে সে। বললে, "থাক, আর দরকার নেই শুনে তোমার। চল ফিরি এবার। তারপর আর কিছুই নেই। তারপর একবার কাশীতে রটে গেল, কলেরায় তুমি মরে গেছ উত্তরকাশীতে। তারপর গৌরীও মরে গেল একদিন।"

চুপচাপ দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। বহুবার দু'জনের গায়ে গা ঠেকল। বহুক্ষণ দুজনে হাঁটলাম পাশাপাশি। দূরের আলো কাছাকাছি এসে গেল চিনতে পারলাম, রেল স্টেশনের দিকেই এগিয়ে চলেছি আমরা।

আবার গৌরীই প্রথমে কথা বললে—"সত্যি কথা বলবে ব্রহ্মচারী, একটি খাঁটি জবাব দেবে আমায় ?"

বললাম, "মিথ্যে কথা আমি সহজে বলি না গৌরী, গুরুতর প্রয়োজন হলে মৌনব্রত ধারণ করি। বল, তুমি কি জানতে চাও আমার কাছে ?"

"লজ্জাও করে সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে। তবু বড় জানতে ইচ্ছে করে, একবার মাত্র আমায় মন্দিরের মধ্যে দেখে কি লোভে তুমি বশীকরণ করতে গেলে ? কি এমন দেখেছিলে আমার মধ্যে যে তৎক্ষণাৎ একেবারে মাথাটা খেয়ে দিলে আমার ; আর করলেই যদি সর্বনাশটা তাহলে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে না কেন ? তুমি ত ভাল করেই জানতে তোমার নিজের বিদ্যের গুণ, তোমার ঐ চোখ দুটি দিয়ে যখন যার সর্বনাশ করবার ইচ্ছে হয় তা অনায়াসে করতে পারো তুমি। আমার

মাথাটা খেয়ে আমাকে দগ্ধে মরবার জন্যে ফেলে রেখে গেলে কেন? ও ভাবে একটা নিরপরাধ মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে কি সুখ পেলে তুমি?"

আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে ওর দুই কাঁধ ধরে চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে গৌরী যে বশীকরণ কি ব্যাপার তাও আমি জানি না। যদি এখনই এই চোখ দুটো আমার নষ্ট করে ফেলি তাহলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?"

সভয়ে গৌরী দু'হাত দিয়ে আমার চোখ মুখ চেপে ধরলে। সেই মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা কাল পেঁচা উড়ে গেল কি একটা শিকার মুখে নিয়ে। শিকারটা চিঁ চিঁ করে চেঁচাচ্ছে তখনও।

ভয়ানক চমকে উঠল গৌরী ওপর দিকে চেয়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"চল ব্রহ্মচারী, চল পালাই এখন থেকে।"

শক্ত করে ওর একখানা হাত ধরে বললাম, "চল।"

হঠাৎ এক সময় নজর পড়ল নিজের কাপড় চাদরের দিকে। পরে আছি শেঠ ব্রজকিষণের দেওয়া মহামূল্য সেই গরদের কাপড় চাদর। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক খালি করে। হায় এখন আমি ফক্কড়ও নই। আর একবার আমার জাত নষ্ট হ'ল।

কাল সপ্তমীর দিন গঙ্গার ঘাটে পাওয়া প্রতিমাখানির কথা মনে পড়ে গেল। যারা বিসর্জন দিতে এনেছিল তাদের কাছ থেকে বড় স্পর্দ্ধা করে কেড়ে নিয়েছিলাম মাকে। আমার মত ফক্কড়ের পূজা মা গ্রহণ করবেন কেন। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় দাউ দাউ করে জলে গেল আমার চোখের সামনে প্রতিমাখানি। পুড়ে ছাই হয়ে গেল ফক্কড়ের স্পর্দ্ধা। ফক্কড়ের হঠাৎ নবাবী ছাই হয়ে উড়ে গেল আকাশে। চক্ষের নিমিষে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভাগ্যদেবতা যে খোলস পালটালেই সব কিছু পালটানো হয় না। হ্যাংলার মত কোনও কিছুর জন্যে হাত বাড়িয়েছো কি হাতে ফোস্কা পড়বে। আগুনের আঁচে হাত আর মুখ দুই পুড়ে কালো হয়ে যাবে।

তাই হয়েছে। এই মুখ নিয়ে দিনের আলোয় আর চট্টগ্রাম সহরে টেকা যাবে না এক দণ্ড। কি করে এখন গিয়ে দাঁড়াব আমি মারোয়াড়ীদের সামনে? সর্বনাশ হয়ে গেল ওদের, হয়ে গেল আমার জন্যেই। ঐ সর্বনাশী দুর্গাকে তুলে নিয়ে গিয়ে না বসালে হয়ত এতবড় সর্বনাশটা হ'ত না ওদের। এতটুকু কারও উপকারে লাগে না ফক্কড়। ফক্কড়ের পোড়া কপালের ওপর আতর ঢাললে বা চোখের জল ফেললে নিজের কপালেও আগুন লাগে।

নিজের চিন্তায় ডুবে পথ চলছিলাম। হাতে টান পড়ল। গৌরী বললে—"ঐ যে দেখা যাচ্ছে স্টেশন। একখানা গাড়ী ভাড়া কর। অনেক রাত হয়েছে, তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে বাসায়।"

হাত ছেড়ে দিলাম। অত রাতে গাড়ী পাওয়া সহজ নয়। পাঁচটা টাকা দিতে রাজী আছি বলাতে একজন ঘোড়া খুঁজতে বার হ'ল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া ধরে এনে গাড়ীতে জোতা হ'ল যখন তখন স্টেশনের ঘড়িতে একটা বাজল। মনে মনে ঠিক করলাম, গৌরীকে নামিয়ে দিয়ে এই গাড়ীতেই আবার স্টেশনে ফিরে আসব। তারপর সামনে যে ট্রেন মেলে। কাল দিনের আলোয় এ মুখ কেউ যেন না দেখতে পায় এ দেশে।

ঝড় ঝড় ছড় ছড় শব্দে চলল গাড়ী। চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় ঘোড়া দুটিকে আপ্যায়িত করে অনর্গল বকছে গাড়োয়ান তার সঙ্গে উঠছে চাবুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ। সামনাসামনি দু'জনে বসে আছি আমরা। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ গৌরী বললে—"এই নাও ধরো।"

"কি! কি ওটা?"

"তোমার সেই লাল থলেটা, যার মধ্যে টাকা-কড়ি বোঝাই ছিল।"

"ওটাকে তুমি পেলে কোথায়!"

"আগুন-আগুন শুনেই আমি ওটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। এতক্ষণ আমার জামার ভেতরে ছিল। এখন মনে পড়ল।"

হাঁ করে চেয়ে রইলাম থলেটার দিকে। তারপর চাইলাম গৌরীর দিকে। চিরন্তনী নারী—মৃত্যুকালেও পোঁটলার কথা ভুলতে পারে না।

গৌরী বললে—"থলেটা এবার বেশ করে বেঁধে রাখ কোমরে। এখান থেকে পালাতে হলে টাকার দরকার। এখন আর কিছুতেই এখানে থাকা চলে না তোমার, যার যা মুখে আসবে বলবে। তোমার মহিমাও মা দুর্গার সঙ্গে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শেঠজীরা আবার উলটে কোনও ফ্যাসাদ না বাধালে বাঁচি! এতক্ষণে তোমার ভক্তরা হয়ত তোমার রক্ত পান করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।"

মনে মনে মানলাম গৌরীর কথাটা। থলেটা নিয়ে কোমরের কাপড়ের সঙ্গে কষে বেঁধে ফেললাম। বেশ উঁচু হয়ে উঠল উদরটি। উঁচু জাতের বিলাতী কুকুরের মত ফক্কড়ের উদর পিঠের সঙ্গে লেগে থাকা নিয়ম। পেটে হাত বুলিয়ে বুঝলাম, নেহাত বেমানান হয়ে উঠেছে সেখানটা।

বেশ কিছু রসদ বাঁধা রয়েছে পেটে। তার অনিবার্য ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিরালম্ব নিঃস্বের আর যত দুঃখই থাকুক, থাকে না ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথার মধ্যে প্যাঁচ কষবার যন্ত্রণা-ভোগ। এই জন্যেই ফক্কড় সুখী। ফক্কড় শুধু ফক্কড় বলেই রাজার রাজা। পেটে বাঁধা থলেটার টাকা-পয়সাগুলো দারুণ গোলমাল বাধালে মাথার মধ্যে।

ফক্কড়ের নিজস্ব চলন চলতে হবে না এখন কিছু দিন। সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, অদৃশ্য ভাবে নেমে উঠে আর উঠে নেমে, বেঞ্চির তলায় শুয়ে আর বাথরুমের মধ্যে বসে ট্রেন-ভ্রমণ নয়। হিসেব করা সময়ের মধ্যে যেখানে খুশি গিয়ে পৌঁছে যাব।

কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার সেই স্থানটির নাম কি!

কে বলে দেবে কোথায় গিয়ে থামতে হবে ফক্কড়কে?

গৌরী বলে উঠল, "থামাও, থামাও। থামাতে বল গাড়ী এখানে। বাঁ দিকের ঐ গলির ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের।"

মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বললাম।

তারপর!

গাড়ী থেকে নেমে মাটির ওপর পা দেবার পর মুহূর্তেই মাটি ফুঁড়ে সামনে আবির্ভূত হ'ল একটি মূর্তিমান 'তারপর'। দুই চোখ লাল করে দু'হাত মেলে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর কি করতে চাও তুমি?"

ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। সত্যিই ত, কি করতে যাচ্ছি আমি গৌরীর সঙ্গে! কেন যাচ্ছি আর? আর একবার ওর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গিয়ে কি লাভ হবে আমার? পিতু বুড়ো আর এক প্রস্থ কাঁদুনি গাইবেন, সুরেশ্বর আর একবার চুটিয়ে আদর আপ্যায়ন করবে। তার গৃহিনীকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনেছি বলে একটু বেশী করে কৃতজ্ঞতা জানাবে। আর গৌরী সাজাতে বসবে জলখাবারের থালা।

কিন্তু তারপর? তারপর কি?

পা দু'টো যেন গেড়ে বসে গেল মাটিতে। এক হাতে গাড়ীর দরজাটা ধরে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গলির ভেতর কয়েক পা এগিয়ে গেল গৌরী। এগিয়ে যেতে যেতে বললে —"গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এস। বাড়ী গিয়ে ভাড়া দিয়ে দোব।"

কথাটা বলে সাড়া শব্দ না পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে। পিছনে কাউকে আসতে না দেখে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর আবার ফিরে এল গাড়ীর কাছে।

"কি হ'ল! দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

আমার গলা দিয়ে শুধু বার হ'ল—"আর কেন?"

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল গৌরী—"তার মানে! আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে এখান থেকেই তুমি চলে যাবে না কি? তাহলে কি বলব আমি তাদের? কোথায় এতক্ষণ কাটিয়ে এলাম, তার জবাব কি দোব আমি?"

বিস্ময় ব্যাকুলতা ত্রাস এক সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গৌরীর কণ্ঠস্বরে।

গাড়ীর মিটমিটে আলো পড়েছে ওর মুখের ওপর। ওর অসহায় চক্ষু দুটির দিকে চেয়ে যেন চাবুক খেলাম পিঠে।

তাই ত! এতক্ষণ কোথায় কাটালাম আমরা? কি করে কাটল এতটা সময়? কেন এত দেরি হ'ল ফিরতে? এই রকমের শত শত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হবে যে এখনই! কিন্তু আমি ওর সঙ্গে গেলে কোন্ দিকে কতটুকু সুরাহা হবে তা ঠিক বুঝতে না পেরে ওর চোখ দুটির দিকে চেয়ে রইলাম।

দপ করে জ্বলে উঠল গৌরীর চোখ।

"তুমি কি সত্যিই মানুষ নও? এ ভাবে আমাকে এখানে ফেলে পালালে কি অবস্থা দাঁড়াবে আমার, তাও কি ঢুকছে না তোমার মাথায়? কোন্ মুখে এখন আমি দাঁড়াব তাদের সামনে গিয়ে?"

কান্নায় না উৎকণ্ঠায়, ঠিক বলতে পারব না, ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিলাম নিজের মাথায়। গাড়োয়ানকে বললাম —"মিঞা সাহেব, এখানে একটু থাকো গাড়ী নিয়ে। এই গাড়ীতেই আমি ফিরে যাবো স্টেশনে। আবার পাঁচ টাকা পাবে তুমি।" বলে কোমর থেকে থলে বার করে তার হাতে পাঁচটি টাকা দিলাম।

গৌরীকে বললাম—"চল এবার, কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যে তোমার কতটুকু উপকার হবে তা বুঝতে পারছি না।"

গলিটা পার হতে দু মিনিটও লাগল না। দরজার গায়ে হাত দিয়ে গৌরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পিছনে আমাকেও দাঁড়াতে হ'ল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, বাড়ীর ভেতর থেকে ভেসে আসছে কার গলার স্বর! কে কথা বলছে!

একটু সময় লাগল কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে। পিতুবাবুর গলা, আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথাগুলি বলছেন তিনি, বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর কথা বলতে।

"তোমার কোন দোষ নেই বাবা, সব দোষ আমার এই পোড়া কপালের। তাকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, তোমাদের পাঠালাম তার কাছে। এখনও যে তার মনে আমার সর্বনাশ করার ইচ্ছে লুকিয়ে আছে তা

সন্দেহ করতে পারিনি। মৃত্যুকালে চরম ভুল করলাম। বুক দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিলাম তার সেই সর্বনেশে চোখ দুটোর নাগাল থেকে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তোমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে। যাতে ওদের দু'জনের চোখে চোখে না মেলে তার জন্যে বহু ছল চাতুরী করতে হয়েছে আমাকে। সব শেষ হয়ে গেল। এত দিনের এত চেষ্টা এত সাবধান হওয়া সব নিজে পণ্ড করে দিলাম।"

শেষটুকু বলতে যেন বুক ভেঙে গেল পিতুবাবুর। গৌরীর দিকে চেয়ে দেখলাম। দরজার গায়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আবার সেই মর্মান্তিক হাহাকার ভেসে আসতে লাগল বাড়ীর ভেতর থেকে।

"আজ আর তোমার কাছে কোনও কথা লুকাবো না সুরেশ্বর, আর তোমায় ঠকাবো না আমি। তোমায় মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দোব, তোমার হাতে তোমার বাবার সম্পত্তি বুঝিয়ে দোব, এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি তোমার বাবার মৃত্যুকালে। আজ তুমি মানুষের মত মানুষ হয়েছ, পাঁচজনের একজন হয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজে স্থান পেয়েছ। তোমার হাতে তোমার বাবার সম্পত্তি দিতে পেরে খালাস পেয়েছি আমি। অনেকগুলো বছর তোমার জন্যে আমি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। নাবালক ছেলেটিকে পথে বসালাম না দেখে লোকে ধন্য ধন্য করেছে আমাকে, আমার মত সামান্য মানুষের এতবড় নির্লোভ নিঃস্বার্থপরতা দেখে তাক লেগে গেছে সকলের। কিন্তু তারা কেউ জানতো না যে একদিন তোমার গলায় একটি কাল-সাপিনীকে ঝুলিয়ে দেবার বাসনা বুকে পুরে আমি তোমার পরম হিতৈষী সেজে বসে ছিলাম। তুমি বড় হয়েছ, একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ করেছ, তোমার বাবার টাকা তোমায় পাঠিয়েছি আমি, আর মনে মনে দিন গুনেছি, কবে তোমার চরম সর্বনাশটুকু করতে পারব, কবে তোমার জীবনটা বিষিয়ে দিতে পারব সেই চিন্তায় রাত জেগে কাটিয়েছি।"

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল পিতুবাবুর গলা।

"জ্যান্ত কালকেউটের বাচ্চা, ওই মেয়ের শিরা উপশিরার মধ্যে বইছে বিষ, তারানন্দের রক্তের বিষ। মায়ের পেটে থাকতে সেই বিষ খেয়ে ও বেড়েছে, ওর হাড় মাংস রক্ত মজ্জা তৈরী হয়েছে সেই বিষ থেকে। পেটে থাকতেই ওর মা ওকে নিকেশ করে দিতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিয়েছিলাম, ভূমিষ্ঠ হবার পর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর মায়ের কাছ থেকে। আমার বিশ্বাস ছিল, এক ফোঁটা মায়ের দুধ যদি ওর পেটে না যায়, যদি কস্মিনকালে ও জানতে না পারে কোন্ মায়ের পেটে জন্মেছে, তাহলে বিষক্রিয়া সুরু হবে না ওর দেহ মনে। ভুল ভুল, কালকেউটের বাচ্চাকে দুধ কলা দিয়ে পুষলেও তার বিষ যাবে কোথায়।"

অনেকক্ষণ কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সরু গলিটার মধ্যে দম আটকে এল আমার। মনে হ'ল, আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার ওপর। আকাশের চাপে এবার পিষে মারা যাবো। একেবারে আমার বুকের কাছে দরজার গায়ে লেগে আছে আর একটি প্রাণী। ওর লাল বেনারসীর রঙ পালটে গেছে। চিকচিকে কালো জেল্লা ঠিকরে বার হচ্ছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। ঘোমটা খসে পড়েছে, দুটো রূপার কাঁটা গোঁজা রয়েছে খোঁপায়। খোঁপাটা যেন সাপের ফণা, কাঁটা দুটো সাপের দুই জলন্ত চক্ষু। ফণা তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাপটা। একটু নড়লে চড়লেই মারবে ছোবল।

আমার দুই চোখ জ্বালা করে উঠল। কি একটা যেন ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আটকে গেল গলায়। কয়েক ঘণ্টা আগে এই কাল-সাপিনীকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলাম জলন্ত প্যাণ্ডেল থেকে। ইচ্ছে হ'ল, তৎক্ষণাৎ আর একবার তাকে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই সেই দম-আটকানো গলিটার ভেতর থেকে। সেখানে ছিল আগুন আর এখানে নেই একবিন্দু বাতাস। আকাশ নেমে এসেছে মাথার ওপর, দু'পাশে অন্ধকার নিরেট পাঁচিল, সামনে বন্ধ দরজা। পিছন ফিরে পালাবার পথটি খোলা আছে এখনও। একটু

পরে যদি পিছনের পথও বন্ধ হয়ে যায়! তখন দম আটকে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

হাত তুললাম, ওর কাঁধ ধরে টেনে আনবার জন্যে হাত বাড়ালাম। সেই মুহূর্তে আবার কানে এল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"ওর বাবা কে?"

থমকে থেমে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। আবার শুনতে পাওয়া গেল সেই থমথমে গলা।

"তারানন্দের মেয়ের স্বামী বড় ছেলে জন্মাবার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার অনেক দিন পরে জন্মায় এই মেয়ে।"

"তাহলে ওর বাপের কি কোনও পরিচয়ই নেই?"

"আছে সুরেশ্বর আছে। বাপের পরিচয়ই আছে তার—"

কে যেন চেপে ধরলে পিতু বুড়োর মুখ।

হঠাৎ সামনে থেকে আমি একটা ধাক্কা খেলাম। আমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল গৌরী, পর মুহূর্তেই দুর্দান্ত বেগে আছড়ে গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। সে আঘাত সহ্য করতে পারলে না দরজাটা, ভেতরের খিল ছিটকে বেরিয়ে গেল। খোলা দরজা পার হয়ে গৌরীও ছিটকে গিয়ে পড়ল উঠানের ওপর। চক্ষের নিমেষে উঠে দাঁড়ালো সে, এক লাফে রোয়াকের ওপর উঠে সামনের খোলা দরজার দু'পাশে দু'হাত দিয়ে দাঁড়ালো। কয়েকটি মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ। তারপর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে ফেললে অন্ধকার আকাশটাকে।

"বল, বল শিগগির কে আমার বাবা?"

ঘরের ভেতর থেকে আলো পড়ছে গৌরীর দেহের ওপর। ওর পিছন দিক অন্ধকার। অদ্ভুত দেখাচ্ছে দৃশ্যটা, ঠিক যেন একখানি ছবি। দরজাটা হচ্ছে ছবির ফ্রেম। ফ্রেমে-আঁটা একখানি ছবি। অন্ধকার একটি দেহের চারিদিক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। জ্যোতির্ময়ী আঁধার-কন্যা।

বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল গৌরী—"বল, বল দয়া করে আমার বাবা কে ?"

উত্তর শোনার জন্যে আকাশ বাতাস বিশ্বচরাচর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সেই নিরুদ্ধ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটানা ভেসে আসতে লাগল একটা গোঙানি।

"সর্বনাশী, এই জন্যেই একদিন তোকে তোর রাক্ষসী-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বুকে করে বাঁচিয়েছিলাম আমি। তোর গর্ভধারিণীর পরিচয় মুছে দিতে চেয়েছিলাম তোর কপাল থেকে। জন্ম দিয়েছিলাম বলে মুখ বুজে ষোল আনা ফল ভোগ করেছি। তবু তোকে রক্ষা করতে পারলাম না, যে বিষ তোর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে সে বিষের ফল ফলে তবে ছাড়ল।"

প্রাণহীন ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। সুরেশ্বরের কথা শোনা গেল, একান্ত নিরাসক্ত তার কণ্ঠস্বর।

"কেন আবার ফিরে এলে এখানে ?"

আবার নিস্তব্ধতা। আমার চোখের সামনে ফ্রেমে-আঁটা আলো-ঘেরা কালো ছবিখানি নিথর নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। পাষাণের মত ভারী সময় একটুও নড়ছে না! নিজের বুকের মধ্যে ধকধক্ শব্দও শুনতে পাচ্ছি আমি তখন।

নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা মস্ত ঢিল ছুঁড়লে কে। আকাশের দিকে ছিটকে উঠল অনেকটা জল। অনেকগুলো ঢেউ উঠল জলের বুকে।

"যাও, দূর হয়ে যাও। দিনের আলোয় ও মুখ আর দেখিও না এখানে। আগুনে পুড়ে মরেছ এই ধারণা করবে সকলে।"

সুরেশ্বরের বলা শেষ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন পিতুবাবু।

"যা, যা, পুড়িয়ে ফ্যাল তোর ঐ পোড়ার মুখ। তোকে সুখী করবার জন্যে আজীবন আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি। এবার তুই মর্। তুই মরেছিস জেনে তবে যেন আমি মরি।"

টলতে টলতে নেমে এল গৌরী। উঠান পার হয়ে দরজার সামনে এসে

পৌঁছল। ধরে ফেললাম তার একখানা হাত। মুখ তুলে সে চাইল একবার আমার দিকে। তারপর মাথা হেঁট করে হু হু করে কেঁদে উঠল।

চিৎকার করে উঠলাম আমি, "সুরেশ্বরবাবু।"

রোয়াকের ওপর থেকে ধীর শান্ত কণ্ঠে সাড়া দিলে সুরেশ্বর—"বলুন।"

"কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন গৌরীকে? কি অন্যায় করেছে সে আপনার কাছে?"

সুরেশ্বর নেমে এল, এসে দাঁড়ালো গৌরীর পিছনে। প্রায় চুপি চুপি বলতে লাগল। "কোনও অন্যায় করেনি গৌরী, অন্যায় করেছে এ কথা আমি বলিনি। আমি শান্তি চাই, ও মরে গেছে এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমি শান্তিতে থাকতে চাই। এর বেশী আর কিছু চাই না আমি ওর কাছে। হয় ও যাক নয়ত আমিই যাচ্ছি।"

শেষ চেষ্টা করলাম।

"গৌরীকে তুমি অবিশ্বাস করছ সুরেশ্বর, তাকে তুমি—"

সুরেশ্বর থামিয়ে দিলে আমাকে—"না তা করি না আমি। বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনও কিছুই করবার দরকার করে না আমার। ওর মায়ের পরিচয় পাবার পরে ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।"

তখনও ধরেছিলাম গৌরীর হাত। টান পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল গৌরী। "আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমায়।"

ছাড়লাম না গৌরীর হাত, বেরিয়ে এলাম দরজা পার হয়ে ওর হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। চিৎকার করে বলে ফেললাম—"ওর মায়ের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা যার মনে বাসা বেঁধে রইল তার সংসারে বাস করার চেয়ে মরাই ভাল, চল গৌরী।"

ভেতর থেকে পিতুবাবু জবাব দিলেন, "হাঁ, তাই যা। মরগে যা ঐ ভণ্ড বুজরুকটার সঙ্গে। যা করে তোর গর্ভধারিণী মরেছে তাই করে তুইও মরগে যা। নরক তোর—"

আর যাতে শুনতে না হয় সে জন্তে—হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।

ছড়ছড় শব্দে গড়িয়ে চলেছে গাড়ী, সামনা-সামনি বসেছি দু'জনে। গাড়ীর এক কোণে মাথা রেখে পড়ে আছে গৌরী। নিঃশেষে নিভে গেছে ওর ভেতরের আগুন। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম কেউ আসছে কি না। কেউ না। নজরে পড়ল পূব আকাশটা, সেখানে তখন খুব ফিকে সাদা রঙ্ ধরতে সুরু করেছে।

মহানবমী।

ব্রাহ্মমুহূর্তে ঢাক ঢোল বাজছে সহরময়। প্রভাতের বাতাসে ভেসে এল মহানবমীর বাজনা। ভয়ানক মুচড়ে উঠল বুকের ভেতরটা। মায়ের পূজা দেখতে ছুটে এসেছিলাম বাঙলায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পূজার ক'টা দিন থাকবই বাঙলা দেশে। সে প্রতিজ্ঞা গোল্লায় গেল। মহানবমীর ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার ট্রেনের কামরায় চ'ড়ে বসে আছি।

বসে আছি দ্বিতীয় শ্রেণীর গদি মোড়া আসনে। আমরা দু'জন ছাড়া আর এক প্রাণীও নেই গাড়ীতে। বাইরের দিকে চেয়ে ওপাশের আসনে বসে আছে গৌরী। রক্তবর্ণ বেনারসী জড়ানো, হাতে গলায় সোনার অলঙ্কার, কপালে সিঁথিতে লাল ডগডগে সিঁদুর,—চমৎকার! কে জানে ঠিক এই সাজেই একদিন ও এসেছিল কি না সুরেশ্বরের ঘরে! যে ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই বিদেয় হচ্ছে। আসা যাওয়ার মাঝে যে সময়টুকু অযথা অপচয় হয়েছে তার জন্তে অনর্থক মন খারাপ করে কি লাভ। হঠাৎ নিজের দিকে নজর পড়ল। বহুমূল্য কাপড় চাদর রয়েছে আমার অঙ্গে, মাথা থেকে ছড়াচ্ছে মহামূল্য আতরের গন্ধ। না, নেহাত বেমানান দেখাচ্ছে না আমাকে গৌরীর সঙ্গে। চমৎকার!

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে পোড়াতে লাগলাম। অনেকটা সময় পরে গলা

দিয়ে ধোঁয়া নামাতে মাথাটা সাফ হয়ে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো মিল খুঁজে পেলাম। সর্বস্ব খুইয়ে বসলে মনের যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে সব কিছু, হাতের মুঠোয় পাওয়ার অসীম তৃপ্তি। বেঁচে থাকার চরম আনন্দের সঙ্গে চমৎকার স্বাদ পাচ্ছি মৃত্যুর ওপারের পরম শান্তির। সামনে চোখ-বুজে বসা মূর্তিটিকে সঙ্গে নিয়ে এই যাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে পৌছব, সেই নাম না জানা ঠিকানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে জীবন-নদীর ওপারের একটি ঠিকানা, যেখানে এপারের কলঙ্ক পৌছতে পারবে না। এক নৌকার যাত্রী আমরা দু'জনে, নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছি এবার। এই মহাযাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে লাগবে আমাদের তরী, সেখানে কেউ কাউকে মিথ্যে সন্দেহ করে না। জন্ম-মৃত্যু হীন সেই দুনিয়ায়, কার গর্ভে কে জন্মেছে, এজন্যে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার রেওয়াজ নেই।

কান ফাটা চিৎকার ক'রে উঠল ইঞ্জিন। গাড়ী চলতে সুরু করলে। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় পুড়ে গেল সেই প্রতিমাখানি যাকে তুলে এনেছিলাম নদীর ধার থেকে। বিসর্জিতা প্রতিমার পূজা হ'ল না। আবার মহানবমীর প্রভাতে আর একখানি বিসর্জিতা প্রমিতা নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল। কোন্ বিধাতা বলে দেবে, কি লেখা আছে এই প্রতিমাখানির কপালে!

নিরালম্ব নিরাশ্বাস নিরুদ্বেগ ফক্কড় জীবনে শান্তি আছে কিন্তু সান্ত্বনা নেই। জাগরণের অবিচ্ছিন্ন উন্মাদনা আছে, নেই সুপ্তির মদির মাধুরী, নেই স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা। ফক্কড়ের চোখের পাতা যখন মুদিত হয়, হাত পা হয় অচল, দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে পথের পাশে, গাছতলায়, বা কোনও দেবালয়ের উঠানের কোণে; তখন তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ধারণা করা ভুল। ধারণা করতে হবে যে যন্ত্রটা কিছুক্ষণের জন্যে থেমে আছে, একটু পরেই আবার চলতে সুরু করবে।

ঘুম কখনও স্পর্শ করে না ফক্কড়কে, ফক্কড় কিছুতে ঘুমায় না।

হলে খাট বিছানা না হলেও চলে, কিন্তু চাই একটি মন। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ, কান্না হাসি আশা নিরাশায় হাবুডুবু খেতে জানে এমন একটি সহৃদয় মনের সাহায্য না পেলে ঘুমাতে পারে না কেউ। দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না, এটা একটা কথার কথা। খারাপ ভাল যে কোনও জাতের চিন্তা না থাকলে মনেরও অস্তিত্ব থাকে না। তখন ঘুমাবে কে? মন হয় জেগে থাকে, নয় স্বপ্ন দেখে, নয় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খোরাক চাই মনের, যেখানে মনের খোরাক জোটে না সেখানে মনও নেই।

বেচারা ফক্কড় কোথায় পাবে মনের খোরাক! কি দিয়ে মনকে খেলা দেবে ফক্কড়? কোনও দিন কিছু না পেয়ে মন ফক্কড়ের মুখে পদাঘাত করে সরে পড়ে। তখন সদাজাগ্রত ফক্কড় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে হিসেব করে, নিঃশ্বাস নেবার মেয়াদ কতটা খরচ হয়ে গেল। অসহায় ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে, অবিরাম চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কলসীর জল, ফুরিয়ে আসছে চিরজাগ্রতের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ। শেষে নেমে আসে সেই চরম মুহূর্তটি ফক্কড়ের দুই চোখের ওপর, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে তখন ফক্কড়। এমন ঘুম ঘুমায় যে তা ভাঙবার সাধ্য নেই স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তারও!

গাড়ী ছাড়বার পর এক ফাঁকে আমার সেই পুরানো বন্ধুটি এসে উপস্থিত। বহুকাল আগে যিনি আমার মুখে চড় মেরে স'রে পড়েছিলেন, সেই হ্যাংলা বন্ধুটি আমার খোরাকের গন্ধ পেয়েই নির্লজ্জের মত উদয় হলেন আসমান থেকে। টেরও পেলাম না কখন তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গে। লাল বেনারসী পরা যে প্রাণীটি চোখ বুজে বসে রয়েছে সামনে, তার সম্বন্ধেই আলাপ-আলোচনা সুরু হয়ে গেল বন্ধুটির সঙ্গে। নাছোড়বান্দা বন্ধুটি জেগে রইলেন সঙ্গে, কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করতেই থাকলেন। ফলে ঘুমিয়ে পড়লাম, ফক্কড়ের ঘুম নয়, আসল স্বপ্ন দেখার ঘুম। যে ঘুমে ঘুমিয়ে মানুষ ফানুসের মত উড়ে চলে যায় আকাশে, এই হৃদয়হীনা ধরণীর ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার হয়ে গেলাম অনেকটা পথ আর অনেকটা সময়। তারপর লাগল ঘুমের গায়ে ধাক্কা, যাকে অবলম্বন করে মন আমার ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই অবলম্বনটি নড়ে উঠল ভয়ানক ভাবে। চোখ চেয়ে দেখলাম তার মুখখানি। দুর্ভাবনা দুঃখ ক্লান্তি অবসাদের চিহ্ন মাত্র নেই সে মুখে। তার বদলে দেখতে পেলাম সম্ভ ছুটি পাওয়া একটি স্কুলের মেয়ের মুখের ছেলেমানুষি-চপলতা। আমার একখানা হাতে সজোরে নাড়া দিতে দিতে গৌরী বলছে—"ওঠ, ওঠ। এস নেমে পড়ি এবার। এখানে বদল করে নাও টিকিট। চাঁদপুর থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ যাব আমরা। যে করে হ'ক, কালই কাশী পৌছতে হবে আমাদের। এতটুকু সময় নেই নষ্ট করবার মত। কাশীতে খবর পৌছবার আগেই আমি গিয়ে ঢুকতে চাই বাড়ীতে।"

হেসে ফেললাম ওর হাবভাব দেখে। বললাম—"কালই কাশী পৌছতে হলে দু'খানা ডানা গজানো দরকার তোমার এখনই। উড়ে না গিয়ে উপায় নেই।"

হিসেব করতে লেগে গেল গৌরী।

"কেন পৌছব না কাল? ভোর বেলা গোয়ালন্দ পৌছব, দুপুরের দিকে কলকাতা। সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে যে কোনও মেলে উঠলেই ভোর রাতে মোগলসরাই গিয়ে নামা যাবে। তারপর—"

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"তারপর আগে চাঁদপুর পৌছে স্টীমারে চড়ো, সেই স্টীমার গিয়ে যথাসময়ে পৌছক গোয়ালন্দ। তখন আবার হিসেব আরম্ভ করো।"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম লাকসাম জংশনে গাড়ী ঢুকছে। এ গাড়ী সোজা চলে যাবে লামডিং বদরপুর হয়ে গৌহাটি। দু'খানা গৌহাটির টিকিট কিনেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। তখন পরামর্শ করার মত অবস্থা ছিল না গৌরীর সঙ্গে। কোনও কিছু না ভেবে চিন্তেই কিনেছিলাম গৌহাটির টিকিট। জানতে পেরেছিলাম যে গৌহাটি পর্যন্ত একটানা যাবে গাড়ীখানা, তেরো

অন্ততঃ দুটো দিন আর দুটো রাত নিশ্চিন্তে থাকতে পারব গাড়ীর মধ্যে, এই আশাতেই কিনেছিলাম টিকিট দুখানা।

নিশ্চিন্ততাকে নির্বিবাদে গৌহাটি পর্যন্ত চলে যাবার সুযোগ দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম লাকসাম জংশনে। সংবাদ নিয়ে জানলাম ঘণ্টা তিনেক পরে আসছে চাঁদপুরের গাড়ী সাঁলেট থেকে।

গৌরী বললে, "চল কোথাও, মানুষের চোখের আড়ালে গিয়ে বসা যাক, আমাদের সাজপোষাক দেখে সকলে হাঁ করে চেয়ে আছে। এগুলো ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম।"

ওয়েটিংরুমের দিকে চললাম দু'জনে। পাশে চলতে চলতে গৌরী বললে—"একটা বাক্স বিছানা অন্তত সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমাদের। একেবারে কিছু নেই সঙ্গে, লোকে ভাবছে কি!"

লোকে কি ভাববে! কত কি না ভাবতে পারে লোকে! কেউ কারও ভাববার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তা না পারুক, কিন্তু আর একটি নতুন জাতের মনের খোরাক জুটল বটে আমার। এখন থেকে চোখ কান সজাগ রেখে অতি সাবধানে পা ফেলা প্রয়োজন। চতুর্দিকের তাবৎ মানুষে কে কি ভাবছে সে সম্বন্ধে নিখুঁত হিসেব রাখতে হবে। ভাল করে বুঝতে পারলাম, শুধু যে গৌরীকেই পেয়েছি তা নয়, তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে আরও অনেকগুলি ফ্যাসাদ জুটেছে। যার কোনওটিকেই অবহেলা করা চলবে না।

ওয়েটিং রুমের দরজার পাশে একখানা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। বেঞ্চির ওপর রয়েছে কার টিনের বাক্স আর বিছানার বাণ্ডিল। গৌরী বসে পড়ল এক ধারে। বললে—"যাক, বাঁচা গেল এতক্ষণে। এইবার লোকে ভাববে এই বাক্স বিছানাটা আমাদের সম্পত্তি।"

গৌরীর চাল চলন দেখে সত্যিই বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। শেষ রাত্রে যে বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটে গেল তার কিছুই কি মনে পড়ছে না ওর? এতটুকু

সময়ের মধ্যে বেমালুম ভুলে মেরে দিলে নিজের ঘর বাড়ী স্বামীর কথা! যে লোকটিকে সে এতকাল বাবা বলে ডেকেছে, যে তাকে বুকে করে মানুষ করেছে, ক্ষোভে দুঃখে হয়ত সে মারাই গেল এতক্ষণে। তার কথাও কি একবার মনে পড়ছে না গৌরীর! ঘর সংসার মান সম্মান নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় ছুটেছে ও আমার সঙ্গে? কি করতে চলেছে এখন কাশীতে? সব চেয়ে বড় কথা আমায় সঙ্গে নিয়ে চলেছে কেন? আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?, কি পরিচয় দেবে ও লোকের কাছে আমার?

চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা হবার আগে যে চিন্তাগুলি মাথার মধ্যে উদয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল, অনেকটা পথ পার হয়ে এসে সেগুলি একে একে উঁকি দিতে লাগল। ওর দিকে চেয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে একটা প্রশ্ন গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল। স্পষ্ট করে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হ'ল যে—

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে। "অমন করে চেয়ে থেকো না আমার দিকে। লোকে কি ভাববে। মহাপুরুষ মানুষ না তুমি?"

হালকা পরিহাসের সুর ওর গলায়। নিঃশ্বাস চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। স্পষ্ট করে জানবার প্রশ্নটা আর করা হ'ল না আমার। চাপা গলায় অনর্গল বলে যেতে লাগল গৌরী—

"ঐ রাগ অভিমানটুকুই শুধু সম্বল মহাপুরুষের। আমাদের মত সাধারণ মানুষের বোধজ্ঞান যদি থাকত তাহলে একটি বারের জন্য অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেন তখন কাশীতে। তা নয়, উনি অভিমান করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন, কেন একটা আইবুড়ো মেয়ে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল না। আর ওধারে আমি একটার পর একটা চিঠি লিখে ম'লাম। সেই হারামজাদী বুড়ী সবগুলো চিঠি পৌঁছে দিলে আমার শত্রুর হাতে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।"

কিছুই বলবার নেই আমার। জবাব দেবার আছে কি! হয়ত বলতে পারতাম—"কই, চিঠি লিখতে ত বলিনি আমি তোমাকে। জবাব শুনে নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ হ'ত গৌরীর আর মুখের মত জবাব দিতে পাবার বিমল আনন্দ লাভ হ'ত আমার। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তি পেলাম জবাব না দিয়ে। সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক তবু যে আমিই হতে পেরেছি ওর সর্বনাশের হেতু, এই কথা শুনেই একটি অনাবিল আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। অন্ততঃ এইটুকু মূল্য আমায় দিলে গৌরী যে আমি তার সর্বনাশের হেতু হ'তে পারি। আর ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হ'ক শেষ পর্যন্ত গৌরী যে এসে পড়েছে আমার হাতেই তার জন্যে নিজের বরাতকে ঠুকে একটি ধন্যবাদ দান করলাম। কিন্তু আবার ও ছুটেছে কেন কাশীতে সাত তাড়াতাড়ি!

সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম সর্বপ্রথম—"আবার যাচ্ছ কেন কাশীতে?"

তৎক্ষণাৎ পালটা প্রশ্ন ক'রে বসল গৌরী—"নয়ত কোথায় যাবো আর মরতে?"

তাইত! কোথায় যে যাবো আমরা, কোথায় যে চলেছি ওকে নিয়ে সে কথা ত একবারও ভেবে দেখিনি। ফক্কড় কোথায় নিয়ে যাবে ওকে? কোথায় লুকিয়ে রাখবে ঐ সম্পত্তি ফক্কড়? হাতের মুঠোয় পেয়েছি যাকে তাকে নিয়ে এখন আমি করব কি! আজন্মকাল গৌরী নিশ্চয়ই ফক্কড়ের চলনে চলতে পারবে না। এখন উপায়!

আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধ হয় গৌরীর দয়া হ'ল। মিষ্টি হেসে গলায় মধু ঢেলে বললে—"বেশ ত, আগে চল না কাশীতে। বাড়ীতে যে ভাড়াটে আছে তার কাছে খবর পৌছবার আগেই আমরা পৌছে যাবো। একখানা খাতা আছে আমার বাবার, খাতাখানা আমার চোখে পড়েছে অনেকবার। কিন্তু কখনও সেখানা হাতে পাইনি। খাতাখানা খুব যত্ন ক'রে লুকিয়ে রাখত বুড়ো, তাতেই ও নিজের হাতে লিখে রেখেছে নিজের কীর্তিকাহিনী। আমার

জন্মবৃত্তান্তও তাতে লেখা আছে নিশ্চয়ই। সেই খাতাখানা আমি দখল করতে চাই। তারপর যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাবো। যা করতে বলবে তাই করব।"

সামান্য আদর করলেই একেবারে গলে যায় আর ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকে, সেই জাতের পোষা জীবের মত তখন আমার মনের অবস্থা। যা বলব তাই করতে রাজী গৌরী! এবার বলার মত কিছু বলতে হবে আমায়, চাইবার মত কিছু চাইতে হবে ওর কাছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে না কি! বলার আর চাইবার পরম লগ্ন কি অনেকগুলো বছর আগে পার হয়ে আসিনি! সে দিনের সেই না বলা কথাটি কি আর একবার খুঁজে পাওয়া সহজ! খুঁজে পেলেও আজকের এই পোড় খাওয়া ফক্কড়ের মুখ দিয়ে সহজে কি বেরোবে সেই ভাষা! সবচেয়ে বড় কথা, সে কথা শোনবার মত কান কি এখনও বেঁচে আছে গৌরীর?

বেশ মিষ্টি মুখে একটি ঝামটা দিয়ে উঠল গৌরী—"না, আর পারি না বাপু তোমার সঙ্গে। মহাপুরুষের সঙ্গে পথ চলতে হ'লে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরতে হবে দেখছি। আমার মুখের দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকে সময়টুকু কাটিয়ে দিলেই কি চলবে? এখান থেকে অন্ততঃ একটা জলের জায়গা যোগাড় ক'রে নাও না। সারাটা পথ দুটো প্রাণী কি এক ঢোঁক জলও মুখে দোব না?"

এবার সম্পূর্ণ সজাগ হ'য়ে উঠলাম। বললাম—"টাকা দাও।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল গৌরী, "টাকা কি আমার কাছে না কি।"

আরে! তাও ত বটে! থলেটা যে এখনও বাঁধা রয়েছে আমার কোমরে! তাড়াতাড়ি সেটাকে কোমর থেকে খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ধরলে গৌরী থলেটা, জিজ্ঞাসা করলে, "কত দোব?"

"দাও তোমার যা খুশি।"

কয়েকখানা নোট বার ক'রে দিলে আমার হাতে। টিকিট দু'খানা বাঁধা আছে আমার চাদরের খুঁটে। টিকিটও বদলে আনতে হবে ত।

গৌহাটির টিকিটকে কলকাতার টিকিট বানাতে দু'চারটে ছোট-খাটো মিথ্যে কথা বলতে হ'ল। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাতে একটা কেবিনের মধ্যে

স্থান জোটে তার জন্যে চাঁদপুরে তার করবার আলাদা দাম দিলাম। তারপর একটা কুঁজোর সন্ধান করলাম। কুঁজো পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং কিনলাম একটা মস্ত বড় এলুমিনিয়ামের কেটলি আর একটি এলুমিনিয়ামের গেলাস স্টেশনের সামনের দোকান থেকে। এক হাঁড়ি মিষ্টিও নিলাম। দোকানদার হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে দিলে।

তখন এক হাতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে আর এক হাতে জল ভরতি চকচকে কেটলি নিয়ে দর্শন দিলাম গৌরীকে। গৌরীর পাশে তখন বসে আছে আর একটি বউ। দূর থেকে আমাকে দেখে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল গৌরী। আর একটু কাছাকাছি পৌছে শুনতে পেলাম।

"দেখ না ভাই, কি রকম সঙ। এই মাত্র এক রাশ জিনিসপত্র হারিয়ে এল চন্দ্রনাথ স্টেশনে, তার জন্যে দুঃখ আছে না কি মনে একটু। আবার কোথা থেকে জোটালে ঐ কেটলিটা। কি গো, ও কেটলিটা আবার পেলে কোথা থেকে ?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, "কিনলাম এখানে।"

উঠে এগিয়ে এসে হাঁড়ি আর কেটলি ধরলে গৌরী।

বললাম, "আর বেশী দেরি নেই গাড়ীর।"

গৌরী বললে, "তবে আর এখানে এগুলো খুলে কাজ নেই। একেবারে গাড়ীতে উঠেই যা হয় করা যাবে।"

গৌরী আবার ফিরে গেল বেঞ্চিতে। কেটলি হাঁড়ি পাশে রেখে গল্প করতে বসল বৌটির সঙ্গে। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি পায়চারি করতে লাগলাম সামনের প্লাটফরমে।

চাঁদপুরের গাড়ীতে উঠে দেখলাম একজন বুড়ো সাহেব আর তাঁর মেম সাহেব শুয়ে আছেন দুধারের দু'খানা বেঞ্চিতে। রঙ দেখে মনে হ'ল সাহেবের বাড়ী এ দেশেই এবং রেলেই চাকরি করেন তিনি। আমরা উঠতে সাহেব নিজের বিছানা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর মেমের পাশে। আধ ঘণ্টা

লম্বা একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ ক'রে তাঁর নিজস্ব ভাষায় বকবক করতে লাগলেন বুড়ীর সঙ্গে।

গাড়ীতে উঠে গৌরী আবার বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। যেন একেবারে ভুলেই গেল আমার কথা। হাস্যপরিহাসে উচ্ছল যে মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে এইমাত্র উঠলাম গাড়ীতে, এ যেন সে নয়। এ একটি মূর্তিমতী হতাশা। ঠিক জানি না, মরবার সময় মানুষের মনের অবস্থা কি রকম হয়। জানা চেনা এই দুনিয়াটার ওপর হয়ত কারও টান না থাকতে পারে, কিন্তু এটাকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা আর একটা জগতে একলা পাড়ি দেবার সময় আতঙ্কে আর হতাশায় কি ভাবে মুষড়ে পড়ে মানুষ তার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। একটা জীবন্ত বিভীষিকা, সর্বস্ব পিছনে ফেলে নিঃসঙ্গ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে এক হতভাগিনী। সামনে ধূ ধূ করছে আদিগন্ত মরুভূমি। ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, সাহস সান্ত্বনা পাবার প্রত্যাশা করা নির্লজ্জ বাতুলতা।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ীর ভেতরে নজর ফিরিয়ে আনলে গৌরী। নত চোখে বললে, "হাতে মুখে জল দিয়ে এবার কিছু মুখে দাও।"

তথাস্তু। এতটুকু তাগিদ ছিল না কিছু মুখে দেবার, তবু এক গেলাস জল নিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখে হাতে দিলাম। তারপর এক গেলাস জল ওর হাতে দিয়ে বললাম—"তুমিও ধুয়ে ফেল হাত মুখ।

গেলাসটা নিলে আমার হাত থেকে। জানলায় মুখ বাড়িয়ে জলটা থাবড়ালে মুখে মাথায়। ঘুরে বসে গেলাসটা রেখে বেনারসীর আঁচলে চোখ মুখ মুছতে লাগল। মোছা তার শেষ হয় না, আঁচল আর নামাতে পারে না চোখের ওপর থেকে। অনেকক্ষণ পরে যদিও বা নামাল আঁচল, কিন্তু মুখ আর তুলতে পারে না। নত চোখে কম্পিত হাতে হাড়ির ঢাকা খুলতে গেল।

হাত চেপে ধরলাম। বললাম—"থাক এখন ওটা গৌরী। খিদের জ্বালায় এখনই আমরা কেউ মরে যাবো না।"

হাত সরিয়ে নিয়ে রক্তবর্ণ ফোলা চক্ষু দুটি তুলে একটিবার ও তাকালে আমার দিকে। তারপর আবার গাড়ীর বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। আরও অনেকক্ষণ পরে বুড়ো বুড়ী দু'জনেরই নাক ডাকতে লাগল। তখন গৌরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"ভাগ ক'রে নাও গৌরী, ভাগ ক'রে নাও আমার সঙ্গে তোমার ব্যথার বোঝা। আমারও কেউ নেই, কিছু নেই, এই দুনিয়ায়। তবু বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছি এতদিন। অনেক বড় পৃথিবীটা, অনেক আলো অনেক বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে অনেক দুঃখ অনেক বেদনা এখানে। তার তুলনায় তোমার আমার দু'জনের দুঃখ বেদনা কতটুকু।"

বাইরের দিকেই চেয়েই গৌরী ফিস্ ফিস্ করে বললে—"কিন্তু আজ যে তোমায় দেবার মত কিছুই নেই আমার। সর্বস্ব খুইয়ে এলাম যে, এখন তোমায় কি দিয়ে সন্তুষ্ট করব আমি?"

খুব জোর দিয়ে বললাম—"আছে গৌরী, নিশ্চয়ই আছে। এমন বহুমূল্য কিছু এখনও আছে তোমার কাছে যা পেলে আমার সব পাওয়ার বড় পাওয়া হবে।"

চোখ তুলে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল গৌরী আমার মুখের দিকে।

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—"দিতে পারবে তুমি? দেবে আমায় তুমি সে জিনিষ গৌরী? শুধু ভক্তি ভক্তি আর ভক্তি। ওই শুকনো জিনিষ চিবিয়ে চিবিয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভয় ভক্তি ভালবাসা ও সব এক জাতের জিনিষ। ওতে আর আমার লোভ নেই। অন্য কিছু দাও তুমি আমায় গৌরী, যা রক্তমাংসে-গড়া মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না কিছুতে।"

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"কি সে জিনিষ! কি চাও তুমি আমার কাছে ব্রহ্মচারী?"

"অতি তুচ্ছ জিনিষ গৌরী, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তার নাম। প্রেম নয়, ভালবাসা

নয়, রক্তমাংসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তার। কোনও কিছুর বদলেই কেনা যায় না সে বস্তু। এই দুনিয়ায় দুর্ভাগা দুর্ভাগীদের বুকের মধ্যে আছে সেই অমূল্য সম্পদ লুকানো। ভাগ্যবানদের ভাণ্ডারে মেলে না সে বস্তু।"

জানলার বাইরে ছিল আমাদের দু'জনের হাত। গৌরী আমার হাতখানা তার মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললে—"বল ব্রহ্মচারী, বল সে জিনিষের নাম। দেবো, নিশ্চয়ই দেবো আমি, দেবো তোমায় যা তুমি চাইবে আমার কাছে।"

"দাও তাহলে, দাও তোমার বিশ্বাসটুকু আমায়। এই দুনিয়ায় তুমি যে একা নও, তোমার ব্যথা বেদনার ভাগ নেবার জন্যে আর এক হতভাগাও যে রয়েছে তোমার পাশে, এই বিশ্বাসটুকু শুধু কর তুমি আমার ওপর। এর বেশী আর এতটুকু কিছু আমার দাবি নেই তোমার কাছে।"

গৌরী আরও জোরে চেপে ধরলে আমার হাতখানা তার মুঠির মধ্যে।

আকাশের আলো কমে আসছে। দূর গ্রামের গাছপালার মাথার ওপর আঁধার এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বাসায় ফিরে চলেছে পাখীরা।

সন্ধিক্ষণ।

দিবা-রাত্রির মহাসন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হ'ল কি আমার! সন্ধান পেলাম কি আর একটি প্রাণের! গৌরী কি আমায় সত্যিই বিশ্বাস করতে পারলে!

আঁধার ঘনিয়ে উঠছে, আঁধারের মধ্যে ছুটে চলেছে গাড়ী। ঐ আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার প্রশ্নের উত্তর।

সহজ নয়, রক্তমাংসে-গড়া প্রতিমাকে তুষ্ট করা সোজা নয়। রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে থাকে সন্দেহ স্বার্থপরতা ঘৃণা আর ক্ষুধা। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে সে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। মৃন্ময়ী প্রতিমার ক্ষুধা নেই, নিবেদিত নৈবেদ্যর সবটুকু ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু রক্ত-মাংসে গড়া প্রতিমায় ক্ষুধা আছে! সে ক্ষুধাকে কতক্ষণ বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে তুষ্ট রাখা যাবে!

মানুষের অন্তঃপুরে অন্তঃকরণ নামে একটি রহস্যময় স্থান আছে, ষ্টীমারের অন্দরমহলে আছে তেমনি ছোট ছোট কেবিন। ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে নিরালায় দুটি মন বাঁধা থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে চলন্ত ষ্টীমার। তার অন্দরমহলের অভ্যন্তরে কাঁপতে থাকে দুটি বুক। সেই কাঁপুনিতে হয়ত এক জোড়া বুকের কপাট খুলে গেলেও যেতে পারে। যত্রতত্র বুকের কপাট খোলে না, একটি মনের সঙ্গে অপর একটি মনের শুভদৃষ্টি হবার শুভলগ্ন সব সময় সর্বত্র আবির্ভূত হয় না। বিশাল নদীর বুকে ধক ধক শব্দের তালে তালে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে ষ্টীমার। তখন তার অন্দরমহলের ছোট্ট কেবিনের মধ্যে হয়ত দুটি অন্তঃকরণ জানতে পারে দুজনের অন্তঃপুরের রহস্য।

কেবিনের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌরী। এক পা দরজার ভেতরে দিয়েই আবার টেনে নিলে, যেন ভেতর থেকে কে ওকে বাধা দিলে ঢুকতে। এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি আর এক হাতে জলের কেটলি নিয়ে আমাকেও থামতে হ'ল ওর পিছনে।

বললাম—"কি হ'ল আবার, থামলে যে?"

মুখ ফিরিয়ে একান্ত অসহায় ভাবে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল গৌরী। নিমেষের মধ্যে বুঝতে পারলাম তার চোখের ভাষা। বরফের মত ঠাণ্ডা শাণিত একখানা ছুরির ফলা স্পর্শ করলে আমার পাঁজরায়। এতটুকু অসাবধান হলেই ফলাখানা সম্পূর্ণ ঢুকে যাবে আমার বুকের মধ্যে।

হেসে ফেললাম হো হো করে। বললাম—"এবার তোমার মাথাটাই না বিগড়ে যায়। ছেলেমানুষী বুদ্ধি ত, এটুকু আর মাথায় আসছে না যে দরজাটা বন্ধ না করলেই চলবে। আমাদের কাছে কিছু নেই যা পেতে বাইরে বসা যাবে। ভেতরে চল, জলটল খেয়ে বাইরে এসে খাবার ঘর থেকে দু'খানা চেয়ার টেনে বসে নদী দেখতে দেখতে আরামে যাওয়া যাবে।"

একটু যেন লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমার হাত থেকে মিষ্টির হাঁড়িটা নিলে। জলের কেটলিটা কেবিনের দরজার

ও-পাশে নামিয়ে রেখে বললাম—"দাও এবার কিছু পয়সা, চায়ের কথা বলে আসি।"

টাকার থলিটা যে ওর জামার মধ্যে রয়েছে সে কথা ভুলে বসে আছে। হাঁ করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম—"নির্ঘাত গোলমাল হয়েছে তোমার মাথায়, থলিটা যে জামার মধ্যে রেখেছ তাও মনে পড়ছে না!"

এবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল গৌরী। তাড়াতাড়ি জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে থলিটা টেনে বার করলে।

"কত দোব?"

"যা হয় দাও, চা আনাই আর অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়। সিগারেটও নেই।"

একখানা নোট বার করে দিলে আমার হাতে। ছুটলাম স্টীমারের দোকানে। যে কোনও উপায়ে ওর চোখের আড়াল হতে পারলে বাঁচি। আলোকোজ্জল ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে দু' পাশে দুটি বিছানা ধপধপে সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরের যেটুকু নজরে পড়েছিল তাই যথেষ্ট। কি দুর্নিবার আকর্ষণ সেই ছোট্ট ঘরটির! কি অপরিমেয় প্রলোভন সেই বিছানার! কি ভয়ংকর অসহ্য শীতলতা গৌরীর চোখের দৃষ্টির! বিশ্বাস আমায় করেছে গৌরী। এতটুকু ভেজাল নেই সে বিশ্বাসে। বিশ্বাস করেছে সে, যে আমি একটা রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ। জীবন্ত মানুষের প্রাপ্য সম্মানটুকু সে আমায় দিয়েছে।

সেকেণ্ড ক্লাসের গণ্ডির বাইরে দরাজ তৃতীয় শ্রেণীর এক কোণায় তৃতীয় শ্রেণীর চায়ের দোকান। চা পান বিড়ি সিগারেট মুড়ি মিছরি খাবার দই মিষ্টি সব কিছু পাওয়া যায়। আগে এক প্যাকেট সিগারেট নিলাম। একটা ধরিয়ে কষে গোটা কতক টান দিতে ফুসফুসের কফ মগজ গরম হয়ে উঠল। তখন এক কাপ চা নিয়ে বসে পড়লাম একখানা টিনের চেয়ারে। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে শোনা গেল স্টীমারের বাঁশির কান ফাটা চিৎকার। অতবড়

স্টীমারখানার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। যাত্রীদের মধ্যে কলহ কচকচি বেশ থিতিয়ে এল। দূর থেকে দ্রুত তালে ঝপ ঝপ আওয়াজ আসতে লাগল। ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে লাগল কতকগুলি বাতির মালা। চাঁদপুরের মাটি আর নবমীর চাঁদ একদৃষ্টে চেয়ে রইল স্টীমারখানির দিকে।

আর এক কাপ চা নিলাম। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরাম করে বসলাম। অন্ধকার নদীর বুকে ধকধক আওয়াজ তুলে ছুটে চলল স্টীমার। কোথায় চলল! কোথায় চলেছি আমি! কোথায় শেষ হবে এ যাত্রার!

বহু দিন আগে।

কত দিন আগে তার সঠিক হিসেব নিজেও স্মরণ করতে পারি না এখন। মনে হয় যেন এ জন্মের আগের জন্মে ঘটেছিল ঘটনাটা। একদা এই রকম চাঁদপুর থেকে স্টীমার ছেড়েছিল একখানা। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে চলেছিল সেই স্টীমারে। দাদার সঙ্গে চলেছিল ছেলেটি কলকাতায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে গ্রামখানির আলোয় বাতাসে তার চোদ্দটা বছর কেটে গেল সে আলো বাতাসে আর কুলালো না! বিশাল বিশ্বের অনন্ত আকাশ তখন হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে ছেলেটিকে। আপন সন্তানকে আপন কোলে আর ধরে রাখতে পারলে না গ্রাম। কাঁদতে কাঁদতে ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেই সে যাত্রার সুরু।

স্টীমারের চায়ের স্টলের সামনে টিনের চেয়ারে দাদার পাশে বসে চা খেয়েছিলাম। জীবনের সেই প্রথম চাপান। মিষ্টি তেতো গরম জল গলা দিয়ে নামছিল আর অকারণ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। বাঁধন ছেঁড়ার ছন্নছাড়া ছন্দে তখন নাচছে বুকের রক্ত, চোখের সামনে জ্বলছে রামধনু রঙের ফুলঝুরি। অজানা অচেনা দুনিয়ার দুন্দুভি-নিনাদ সেই প্রথম শুনেছিলাম কানে। তখন নিজের কাছে নিজেও ছিলাম অজানা অচেনা। সেই না-চেনা নিজেকে নিয়ে যে যাত্রা সুরু হয়েছিল আজও তার সমাপ্তি হ'ল না। এখনও পৌঁছাতে পারলাম না সঠিক ঠিকানায়। এখনও শুধু ঘুরে মরছি।

কিন্তু সেদিনের সেই অকারণ পুলক কবে অন্তর্ধান করেছে। তার বদলে এখন অঝোরে বর্ষণ হচ্ছে মাথার ওপরে—অকারণ দুঃখ লাঞ্ছনা আর অপমান। পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি নিজেকে নিয়ে। বেঁচে থাকার দায়িত্বটুকুকে ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকার সাধনা চলেছে এখন। বড় বেশী করে চিনে ফেলেছি নিজেকে, বড় নির্মম ভাবে নিজেকে নিজে বুঝে ফেলেছি।

এই যে তেতো মিষ্টি গরম জল গলা দিয়ে নামছে, এ তেতোও লাগছে না, মিষ্টি ত নয়ই। আর গরম? গরম হবার মত আর কোনও কিছুই এখন জোটে না জীবনে। শরীরের রক্ত শীতল হিম হয়ে জমে বসে আছে অনেক আগে।

একদা এই চাঁদপুর থেকে যে যাত্রার সুরু হয়েছিল তার চরম পরিণতি ঘটেছে একটি পোড় খাওয়া পাকা ঝানু ফক্কড় জীবনে। গৌরী ভুল করলে, অনর্থক ভয় পেলে, ফক্কড় আর যাই করুক, ভুলেও কাঁধ পেতে দায়িত্ব নেবে না কিছুর। সবরকমে দায়িত্বশূন্য জীবনই ফক্কড়-জীবন। জীবন একে কিছুতেই বলা চলে না—বলা উচিত জীবন্ত-সমাধি।

একে একে অনেকে এসে দাঁড়ালো সামনে। সারা জীবনটা গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম, শোনালাম নিজেকেই। অবিরাম আত্মবঞ্চনার একটি সকরুণ ইতিহাস। জীবনের আলো হাতের মুঠোয় ধরা দিতে সেধে এসেছে বারবার, সভয়ে হাত টেনে নিয়েছি হাতে আঁচ লাগবার ভয়ে। তারপর না পাওয়ার পরম তৃপ্তিতে চেখে চেখে লেহন করেছি বঞ্চিতের ব্যথাটুকু। এইই ঘটেছে জীবনে, এইই ঘটছে বারবার। দাবি করার সাহসের অভাবে চাবি হাতে পেয়েও মণিকোঠার দরজা খোলা হ'ল না আমার।

আজও দরজার বাইরে থেকেই ফিরে আসতে হ'ল। ফিরে এসে শুধু কাপের পর কাপ তেতো মিষ্টি গরম জল গিলছি আর ধোঁয়া ছাড়ছি। অথচ কি অকল্পনীয় অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রত্যাশা করেছে গৌরী আমার কাছ থেকে! মরা মানুষের কাছ থেকে সে জীবনের ডাক শোনার ভরসা পেয়েছে। বহুদিন পরে ফক্কড়ের জমাট রক্তে সামান্য দোলা লাগল। তাহলে

এখনও আমাকে মানুষ বলে চেনা যায়! এই শতধা বিদীর্ণ চর্ম ঢাকা যে 'আমি'টি এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তাকে অনর্থক অযথা সম্মান দিয়েছে গৌরী। শুধু এই জন্যেই বাকী জীবনটুকু বিনা মূল্যে বিক্রি করে দিতে পারি আমি ওর পায়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর এক জনের কথা।

প্রায় শেষ হয়ে আসা উপন্যাসখানির অনেকগুলো পাতা তাড়াতাড়ি উলটে গেলাম। পিছন দিকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে খুঁজে বার করতে হবে। সেও যে দিয়েছিল আমায়, শুধু সম্মান নয়, আরও অনেক কিছু সে উজাড় করে দিয়েছিল আমার নামে। মানুষের যা প্রাপ্য তার সবটুকুই আমি পেয়েছি তার কাছ থেকে। সে হতভাগীর ভুলের পূজা ব্যর্থ হয়ে গেল, ভাগ্যের পরিহাসে একজনের নামে নিবেদিত নৈবেদ্য আর একজন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। আজও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সেই ব্যর্থ পূজার ফল বুকে নিয়ে। আজও সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে এক দিন তার মেয়ের জন্মদাতা ফিরে আসবেই তার কাছে।

যদি তাই হয়! আর একবার যদি দাঁত বার করে হাসে তার নিষ্ঠুর নিয়তি! যদি কোনও কালে সে জানতে পারে তার মেয়ের বাপের আসল পরিচয়! যার ছবি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে সে বেঁচে আছে, সেই মানুষটি তার মেয়ের জন্মদাতা নয়! সেই মর্মান্তিক সত্যটুকু জানবার আগেই যেন তার মৃত্যু হয়। যাবার বেলা সে যেন তার একমাত্র অবলম্বন মিথ্যেটুকুকেই আঁকড়ে ধরে পার হয়ে যেতে পারে।

ভুল ভ্রান্তি মিথ্যে নকল আর জাল নিয়ে কারবার। সারা জীবন ঐ সব জঞ্জাল জমিয়ে জমিয়ে এক বিরাট অট্টালিকা গড়ে তুলেছি হাওয়ার ওপর। দায় দায়িত্বকে এড়িয়ে চলার হীন প্রবৃত্তি, নিজের সঙ্গে ছল চাতুরী আর জুয়াচুরি, এই সম্বল করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। জীবন দেবতা অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছেন যা কিছু কামনার ধন, সোনার কাঠি হাতের মুঠায়

পেয়েছি। নিতে পারিনি, ধরে রাখতে পারিনি হাতে। নিজেই নিজের সব চেয়ে বড় শত্রু, এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি আছে!

সজোরে একটা নাড়া দিলাম মাথাটায়। নাঃ আর কোনও লোভেই ঠকাব না নিজেকে। যা আমার প্রাপ্য তার ষোল আনা সুদে আসলে আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়ব।

গেঞ্জী পরা তোয়ালে কাঁধে ঝাড়ুদার এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

"হুজুর—আপকো সেলাম দিয়া মাজী।"

চমকে উঠলাম। বেশ একটু লজ্জিতও হলাম। গরদের জোড় পরা উঁচু ক্লাসের যাত্রী একজন তৃতীয় শ্রেণীর চায়ের দোকানের সামনে টিনের চেয়ারে বসে এক ঘণ্টার ওপর চা খাচ্ছে আর সিগারেট ফুঁকছে। দোকানের লোকেরা আর অন্য সব যাত্রীরা হাঁ করে চেয়ে দেখছে চুল দাড়িওয়ালা আশ্চর্য জীবটিকে। ছি ছি ছি এতটা বেহুঁশ কখনও হয় মানুষে। গৌরী এখনও জল মুখে দেয়নি। নাঃ সত্যিই আমি মানুষ নই।

সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছিল দোকানে। এক ঠোঙা নিলাম। এক কেটলি চা আর দু'জোড়া কাপ ডিস পাঠাতে বলে ছুটলাম ঠোঙা হাতে কেবিনের দিকে। যাক্, সিঙ্গাড়াগুলো যে পাওয়া গেল তাই রক্ষে। বলব—এগুলো ভাজিয়ে আনতে এতটা দেরী হয়ে গেল।

কেবিনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। দরজা বন্ধ, কেবিনের মধ্যে কার সঙ্গে কথা বলছে গৌরী! কোন্ আপদ এসে জুটল আবার এর মধ্যে!

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম।

"আপনাকে নিয়ে গোঁসাই যখন স্টীমারে উঠছিল তখন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওপরে। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনারা যে ঘর পেয়েছেন তা ত—"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"তোমার আপনার লোকদের কাছ থেকে তুমি পালাতে গেলে কেন?"

"গোঁসাই আমাকে পালাতে বলেছিল। যখন গোঁসাইকে নিয়ে আমি আমাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলাম তখন পথে আমাকে বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালাতে, আবার যখন ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই তখনও একবার বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে। চট্টেশ্বরীর দরজার পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল গোঁসাই। কিন্তু তার আগেই আমি পালিয়ে এসেছিলাম গোঁসাইয়ের কাছে। রাত থাকতেই আমি পালাই। ভোর বেলা গোঁসাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম যখন তখন আর গোঁসাই আমায় চিনতে পারলে না। এই ধুতি আর এই চাদরখানা হাতে দিয়ে দূর করে দিলে। তারপর আমায় পুলিশে ধরলে—"

রাগে ফেটে পড়ল গৌরী—"কেন তোমায় দূর করে দেবে? দূর করে দিলে আর তুমি অমনি চলে গেলে! কেন গেলে? কেন ছেড়ে দিলে তাকে? তাড়িয়ে দিলেই অমনি চলে যেতে হবে? ওর যা খুশী তাই করবে কেন? কি মনে করে ও আমাদের? আমরা কি মাটির পুতুল যে ওর খেলা শেষ হলেই ও আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে? কেন তোমরা ছেড়ে দাও ওকে? কেন ওর এতবড় স্পর্দ্ধা?"

অপর পক্ষ ভীতিজড়িত কণ্ঠে বললে—"তা কি করে জানব ঠাকরুণ। ওনারা গোঁসাই মোহন্ত মহাপুরুষ। ওনাদের মনের কথা আমরা ছোটলোক জানব কেমন করে।"

আরও তেতে উঠল গৌরীর গলার স্বর।

"ওঃ—ভারি আমার গোঁসাই মহাপুরুষ রে। সাধু হয়ে শুধু ঐটুকুই শিখেছেন আর যখন যার খুশী সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন। থাকবার মধ্যে আছে ঐ সর্বনেশে চক্ষু দুটি। যে হতভাগী পড়বে ঐ সর্বনেশে চোখের দৃষ্টিতে তাকেই জ্বলতে হবে সারা জীবন। কোনও বাদ বিচার নেই, তোমার মত মেয়েকেও ও বাদ দেয় না! পথের কাঙালিনীর ওপরও ওর নজর পড়ে! এতদূর নেমে গেছে সে! কারও সর্বনাশ করতেই ওর আটকায় না। কিছুতেই ওর অরুচি

নেই এখন। কাশীতে সকলে ওকে ভয় করত যমের মত। সবাই জানত ওর মত বশীকরণ করবার ক্ষমতা আর কারও নেই। সেই লক্ষীছাড়া ক্ষমতাটুকু নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছেন সকলের বুকে। যাক, তোমার বরাত ভাল যে আবার তুমি ওকে ধরতে পেরেছ। কিছুতেই আর ছাড়বে না, যে ভাবে হোক ওকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর যেন ও কাউকে ঠকাতে না পারে, আর কোনও হতভাগীর সর্বনাশ না করতে পারে ঐ চোখ দিয়ে।"

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। হচ্ছে কি? মাথাটা সত্যই খারাপ হয়ে গেল নাকি গৌরীর! উপোসে আর দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে একেবারে।

কিন্তু ও আপদ আবার জুটল কোথা থেকে?

দরজায় ঘা দিলাম।

"দরজা খোল গৌরী। হাত পুড়ে গেল এধারে।"

খুলে গেল দরজা। হাসিতে মুখখানি বিকৃত করে তরল কণ্ঠে বলে উঠল গৌরী—"তবু যা হ'ক, এতক্ষণে মনে পড়ল দাসীর কথা।"

থতমত খেয়ে বললাম, "এই সিঙাড়াগুলো ভাজাতে একটু—"

"না না, একটুও দেরি হয় নি। দেরি হয়েছে বলে কি মরে গেছি নাকি আমি।"

ঠোঙাটা নিলে আমার হাত থেকে। তারপর চোখ দুটিতে একটা ভারি বিশ্রী সংকেত ফুটিয়ে আহ্বান করলে আমাকে।

"এস, ভেতরে এস। দেখবে এস কে এসেছে তোমার কাছে।"

যেন একটা চড় খেলাম গালে। ওর চোখে আর গলার স্বরে যে ইঙ্গিতটুকু প্রকাশ পেলে তাতে সর্বশরীর রি রি করে জ্বলে উঠল আমার। ভাবলে কি ও আমাকে?

কেবিনের মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্ত্রীলোকটি। বিষের জ্বালা তার দুই চোখে। আরও রুক্ষ আরও করুণ হয়ে উঠেছে তার মূর্তি।

তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"আবার এখানে এসে জুটলে কোথা থেকে?"

জবাব দিলে গৌরী—"তোমায় খুঁজতে খুঁজতে এল গো টান আছে বলেই ধরতে পারলে শেষ পর্যন্ত।"

আগুন জলে উঠল আমার মাথার মধ্যে। দাঁতে দাঁতে চেপে যতদূর সম্ভব চাপা গলায় তাকেই হুকুম করলাম—"বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।"

এবার তাকে আড়াল করে দাঁড়াল গৌরী।

"ইস্, অত রাগ কেন? তুমি যে একজন পাকা ব্রহ্মচারী তা কি আর আমি জানি না। ও যাবে না। ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসবার পরামর্শ দিতে গিয়েছিলে যখন, তখন এ রাগ ছিল কোথায় তোমার? কেন যাবে? কোথায় যাবে ও এখন? লজ্জা করে না তোমার ওকে তাড়িয়ে দিতে? কার জন্যে ও ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে?"

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ব্যঙ্গ করছে না ত আমাকে! না তা নয়, হিংস্র উল্লাস নাচছে ওর চোখে। এবার বেশ ধীরে সুস্থে ওজন করে বলতে লাগল গৌরী, "এই খেলা খেলবার জন্যেই ত তুমি সাধু হয়েছ। সুযোগ সুবিধে পেলে কোনও কিছুতেই তোমার অরুচি নেই। কোনও মেয়ের সর্বনাশ করতে যাবার সময় মনে থাকে না যে তার ভার বইতে হবে। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালানো যায় না ব্রহ্মচারী, এবার আর কিছুতেই তা হতে দোব না আমি। এ বেচারা একটা গাঁয়ের মেয়ে, ওদের বোষ্টমদের ঘরে চিরকাল শান্তিতে কাটাতো আর ভিক্ষে করে খেতো। কেন তুমি ওর সর্বনাশ করতে গেলে? কেন তোমার বিদ্যে ফলাতে গেলে ওর ওপর? তোমার ঐ পোড়া চোখের দৃষ্টিতে যে পড়বে তারই তুমি মাথা খাবে কেন? ওকে দেখেও তোমার লোভ হ'ল! ছিঃ।"

গৌরীর পিছন থেকে কি যেন বলতে গেল স্ত্রীলোকটি। এক ধমক দিয়ে তাকে থামালে গৌরী। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল আমায়, "ও আর আমি দু'জনে থাকব কেবিনের মধ্যে। তুমি বাইরে থাকবে। ওর টিকিট করে নিলেই চলবে।"

তারপর হঠাৎ ওর কণ্ঠে উথলে উঠল দরদ আর মিনতি।

"ওকে আর দূর করে দিও না ব্রহ্মচারী। আর পাপে ডুবিও না নিজেকে। নিজের কথাটাও একটু ভাবো। এভাবে মেয়েদের পথে বসিয়ে নিজে সাধু সেজে চিরকাল মজায় কাটিয়ে গিয়ে পরকালে কি জবাব দেবে তুমি? এতটুকু পরকালের ভয় করে না তোমার?"

কাপ ডিস কেটলি হাতে স্টলের ছোকরা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাত থেকে নিলাম সেগুলো। তারপর অতি কষ্টে সামলে ফেললাম নিজেকে। একটু বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

"বেশ ত, থাকো না তোমরা দুটিতে কেবিনের মধ্যে। তোমার ত একজন সঙ্গী হ'ল। এখন ধরো এগুলো, চা-টা খাও তোমরা। আমি বরং স্টলে বসে কিছু খেয়ে নি।"

সামান্য একটু সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল গৌরী। বোধ হয় ঠাওরাবার চেষ্টা করলে আমার মনের মতলবটা। কিংবা একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল, তার সব কটা বিষাক্ত শর ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করলে আমার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করবার।

"কোথায় যে তুমি নেমে গেছ ব্রহ্মচারী তা তুমি নিজেও জান না। ছি ছি ছি, কার স্বপ্ন বুকে করে আমি কাটিয়েছি এতদিন।"

ওর বুক খালি করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চায়ের কেটলি কাপ ডিস নামিয়ে দিয়ে কেবিন থেকে হাসি-মুখে বেরিয়ে এলাম।

স্টীমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

রাত কত হ'ল!

কাল ঠিক এমন সময় নির্জন মাঠের মধ্যে ধোয়া-ওঠা রাস্তার ওপর দিয়ে একজনের হাত ধরে হেঁটেছিলাম। ঐ চাঁদ তখন পশ্চিম দিকে নেমে যাচ্ছিল।

আর আজ।

ঢং ঢং টিং টিং নানা জাতের আওয়াজ উঠল ইঞ্জিন ঘরে। ষ্টীমারের বাঁশী থেমে থেমে ডাক দিচ্ছে কাকে।

একখানা বড় নৌকা এসে লেগেছে ষ্টীমারের গায়ে। মাল উঠল, ষ্টীমার থেকে কয়েকটি মেয়ে পুরুষ নেমে গেল নৌকায়।

তাদের পিছন পিছন আমিও।

অন্ধকারের বুকে ভেসে যাচ্ছে তরণী। আশা-আনন্দে গড়া মিথ্যা মরীচিকা ভেসে যায় ঐ আলোর তরণীতে।

নৌকার ওপর বসে স্পষ্ট দেখা গেল পিছন দিকে বন্ধ কেবিনগুলোর দরজা।

বন্ধ দরজার বাইরে আমার স্থান।

নিবিড় অন্ধকার।

ঐ অন্ধকারের মাঝে ধরণীর বুকে নেমে যেতে হবে নৌকো থেকে।

ফক্কড়-তন্ত্রের সব চেয়ে কড়া অনুশাসন, ফক্কড় কখনও ঝপ্পড় বাঁধে না।

ঝপ্পড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজে থাকলে সে আর তখন ফক্কড় থাকে না।

নৌকা এসে ঠেকল মাটিতে।

মাটিতে পা দিলে ফক্কড়।

চির-বশীভূতা জননী মাটির ধরণী। ঘৃণা সন্দেহ করে না কখনও ফক্কড়কে। মাটির সন্তান ফক্কড়। মাটির বুকে ঘুরে বেড়ায় চিরকাল। ঘোরা শেষ হ'লে মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ে একদিন।

শেষ